শারদীয়

পরবাস

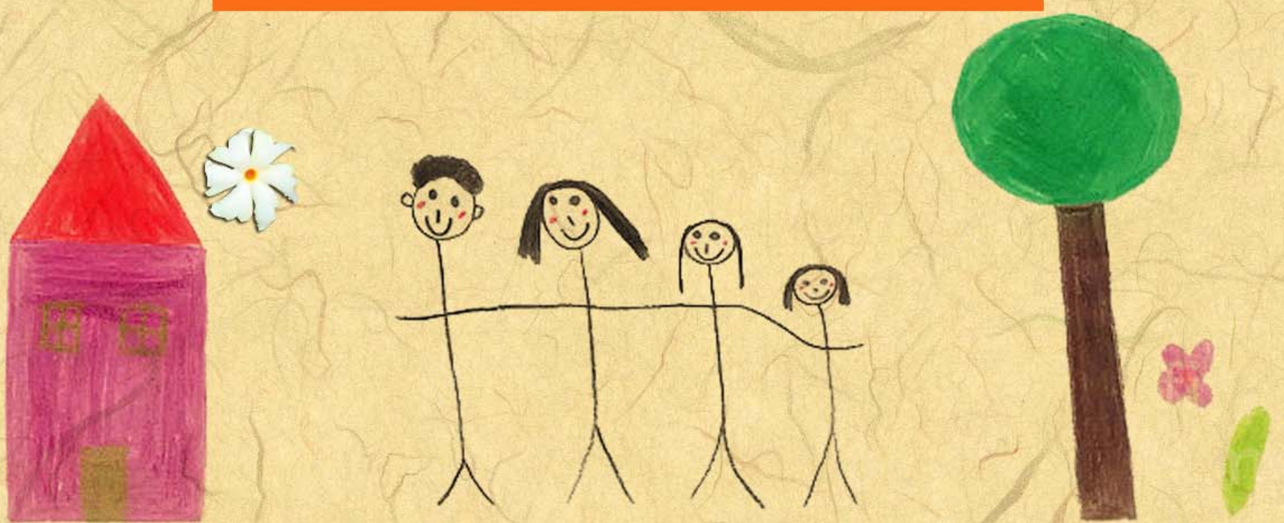

দ্বাদশ বর্ষ, ৪২তম সংখ্যা, ১৯শ ইন্টারনেট সংখ্যা

জয়ঢাক ৪২

সূচিপত্র

	বিষয়		লেখা	লেখক	ছবি/গ্রাফিক্স	পাতা
১	আমাদের কথা				ইন্দ্রশেখর	৪
২	জয়ঢাকের দলবল				ইন্দ্রশেখর	৫
৩	সম্পাদকীয়		জয়ঢাকি বোল		ইন্দ্রশেখর	৬
৪ ৫	কমিক্স		ছানাভূতের গপ্পো	গ্রিম ভাইদের গল্প অবলম্বনে অমৃতা রায় (দাস)	অমৃতা রায় (দাস)	৭
			সূর্যকান্ত রাজা আর চম্পাবতী রানি	অনুপম, অন্তরা	অনুপম, অন্তরা	১৩
			জাদুবনের গল্প	দেবজ্যোতি	দীপংকর	২১
৬	গল্প	(ক)	প্রজাপতি পার্ক	রতনতনু ঘাটী	অমৃতা	২৪
		(খ)	বাঘ ও শেয়ালের গল্প	তরুণ কুমার সরখেল	অনুপম	২৬
		(গ)	ফুলচোর চোর নয়	তাপসকিরণ রায়	সৌভিক	২৯
		(ঘ)	রিন্টি,গুগাই ও রোমান মুদ্রা	অনন্যা দাশ	অনুপম	৩৭
		(ঙ)	শ্রেয়া ও তিন ভূত	অনুরাধা গুপ্ত	অনুপম	৪০
		(চ)	স্বপ্ন	অমিতাভ প্রামাণিক	সৌভিক	৪৫
	ভ্রমণ		পাহাড়ি গ্রামের গপ্পো	ইন্দ্রনাথ	লেখক	৫১
৭	বিচিত্র দুনিয়া		আমাকে পোষ্য বানাবে নাকি?	অরিন্দম দেবনাথ	সংগৃহীত	৫৯
৮ ৯	বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	(ক)	অংকের বিচিত্র জগত	বৈজ্ঞানিক	দেবজ্যোতি	৬৩
		(খ)	ভারতের বৈজ্ঞানিক	টুপুর	সংগৃহীত	৬৮
		(গ)	বিচিত্র জীবজগত	বৈজ্ঞানিক	সংগৃহীত	৭০
		(ঘ)	টেকনো টুকটাক	বৈজ্ঞানিক	সংগৃহীত	৭২
	বনের ডায়েরি	(ক)	ভারতের বনাঞ্চল (মুকুর্থি)	সংহিতা	সংগৃহীত	৭৫
১০			কেনেথ অ্যান্ডারসনের গল্প	অদিতি ভট্টাচার্য	সংগৃহীত	৭৯
১১	ছড়া	(ক)	ভিনগ্রহের ট্রেন	রতনতনু ঘাটী	ইন্দ্রশেখর	৮৩
		(খ)	চিলেকোঠার বাসিন্দারা	আবু হোসেন	হোসেন	৮৪
		(গ)	গড়িয়ে হাঁটা	হীরক সেন	অমৃতা	৮৫
		(ঘ)	বিদ্যাধরী	জামাল ভড়	সোমা	৮৬
		(ঙ)	অদল বদল	লীনা ভট্টাচার্য	অনুপম	৮৭
		(চ)	অদ্ভূতুড়ে	অমিতাভ প্রামাণিক	সৌভিক	৮৮
		(ছ)	লিমেরিক	তরুণ সরখেল	সোমা	৯০
		(জ)	ঠাণ্ডা গরম	সুবীর বোস	মৌসুমী	৯২
		(ঝ)	শিশিরপাত	সুকুমার বাগচি	ইন্দ্রশেখর	৯৪
	দেশ ও মানুষ		ব্রায়ান জেনকিন্স ও তাঁর স্কুল	উমা ভট্টাচার্য	সংগৃহীত	৯৫
১২ ১৩	ধাঁধা,মজা,রহস্য	(ক)	ধাঁধা	ইন্দ্রশেখর	মৌসুমী	১০১
		(খ)	কুইজ	ইন্দ্রশেখর	সংগৃহীত	১০২
		(গ)	জানো কি	ইন্দ্রশেখর	সংগৃহীত	১০২
		(ঘ)	মজার ইন্টারনেট	ইন্দ্রশেখর	সংগৃহীত	১০৩
		(ঙ)	ড্রুড্‌ল	ইন্দ্রশেখর	সংগৃহীত	১০৫
		(চ)	কীসের ফটো	ইন্দ্রশেখর	সংগৃহীত	১০৫

		(ছ)	অবিশ্বাস্য	ইন্দ্রশেখর	সংগৃহীত	১০৫
		(জ)	হযবরল	ইন্দ্রশেখর	ইন্দ্রশেখর	১০৬
		(ঝ)	গত সংখ্যার উত্তর	ইন্দ্রশেখর	ইন্দ্রশেখর	১০৬
১৪	ধারাবাহিক উপন্যাস	(ক)	অন্তিম অভিযান	পিটার বিশ্বাস	মৌসুমী	১০৭
		(খ)	পঞ্চা নামে ভালুকটি	চিত্ত ঘোষাল	সোমা	১১৩
	কাতুকুতু	(ক)	জেনারেল নলেজ পরীক্ষা	রসিকলাল দাস	ইন্দ্রশেখর	১১৭
১৫ ১৬	লিখিব খেলিব আঁকিব সুখে	(ক)	শুভ দুর্গাপুজো	দেবোপমা	দেবোপমা	১১৮
		(খ)	বিড়াল	প্রিয়দর্শী	প্রিয়দর্শী	১১৯
		(গ)	টাইম মেনে	অরিজিতা	প্রিয়দর্শী	১২০
		(ঘ)	অন্তরার পাতা	অন্তরা	অন্তরা	১২১
		(ঙ)	কাজের কাজ		রঙ্গিত মুখোপাধ্যায়	১২২
		(চ)	সুন্দর ভারত		রুচিরা মুখোপাধ্যায়	১২৩
		(ছ)	পুজোয় বেড়াতে যাওয়া		রাজেশ্বরী ভট্টাচার্য	১২৪
	পুরাণ কথা		শ্রী গজানন কথা	সংহিতা	মৌসুমী	১২৫
১৭	রাশিয়ান গল্প		রামধনু বই	স্যামুয়েল মারশাক (অনুবাদঃ দেবজ্যোতি)	মাই মিতুরিচ	১৩০
১৮	পুরাতনী		স্বয়ং কন্যা	বীরু চট্টোপাধ্যায়	সংগৃহীত	১৪২
১৯	স্মরণীয় যাঁরা		দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	ইমন চ্যাটার্জি	সংগৃহীত	১৫০
২০ ২১	পুজোর উপন্যাস		নিরালায় রহস্য	অদিতি ভট্টাচার্য	মৌসুমী	১৫৩
			জজসাহেবের বাড়ি (মূল কাহিনী- ব্রাম স্টোকারের ‘দি জাজেস হাউস’	অমিত দেবনাথ (অনুবাদ)	ইন্দ্রশেখর	১৭০
	খেলার রাজা পর্বতারোহণ		এভারেস্ট	এরিক শিপটন। অনুঃবাসব চট্টোপাধ্যায়	সংগৃহীত	১৮৮
২২	টাইম মেশিন		ঠগীর আত্মকথা	অলবিরুণী	মৌসুমী	১৯৩
২৩	বই পড়া		ছড়াছড়ি	মহাশ্বেতা	সংগৃহীত	২০০
২৪	লোককথা		আম্ব্রা মিনিগা ও এমু পাখির গল্প	মহাশ্বেতা	মৌসুমী	২০১
২৫	ট্রেকিং		হিমালয়ের হিমবাহ পরিচিতি ও ট্রেকিং রুট	রাজকুমার রায়চৌধুরী	সংগৃহীত	২০৯
২৬	বিশ্বের জানালা		ত্রিস্তান ডি কুনহা দ্বীপমালা	উমা ভট্টাচার্য	সংগৃহীত	২১৪
২৭	সেই মেয়েরা		শোরঘাঘাতিনি বেকি	উমা ভট্টাচার্য	সংগৃহীত	২১৯
২৮	পুজো স্পেশাল		অভ্রর সাথে জুলিয়া রবার্টস ও ব্রুস উইলিসের দেখা	শুভ্রা (বাংলা পুণর্লিখন- সংহিতা)	সংগৃহীত	২২৮
২৯	সুরঢাক		এসো গান শুনি	প্রদীপ মুখোপাধ্যায়	লেখক	২৩২

আমাদের কথা

আজ থেকে অনেককাল আগে শুকতারা পত্রিকার শক্তিমান হিরো বাঁটুল দি গ্রেট মাঝে মাঝে হাঙরের রোস্ট দিয়ে ব্রেকফাস্ট করতে করতে একটা খবরের কাগজ পড়ত। তার নাম দৈনিক জয়ঢাক। একবার স্কুলপড়ুয়া তিন বন্ধু মিলে একটা পোস্টকার্ডে শুকতারা দফতরে এই মর্মে চিঠি পাঠিয়েছিলো যে দৈনিক জয়ঢাক পত্রিকার সদস্য হতে চায় তারা। 'পয়সা লাগিলে বাবা দিয়া দেবে।' ডাকবাক্সে চিঠি ফেলে প্রায় ছ'টি মাস অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবার পরও যখন তার কোনও জবাব পাওয়া গেল না, তখন কাগজওয়ালাদের ওপর রাগ করে তিনজন মিলে ঠিক করল, না পাঠালো তো বয়েই গেল। তারা নিজেরাই তৈরি করে নেবে জয়ঢাক কাগজ।

সেই ঘটনার পঁচিশ বছর পরে ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে সেই তিন বন্ধু কলেজ স্ট্রিট থেকে ছেপে বের করল জয়ঢাক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা। তারপর থেকে এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে। ইন্টারনেট সংস্করণ বের হতে শুরু করল ২০০৮-এর মার্চ থেকে।

কিছুকাল আগে জয়ঢাকের এক বন্ধু হঠাৎ এক বিচিত্র হিসেব নিয়ে এলেন দফতরে। তাতে দেখা যাচ্ছে এক ফুট চওড়া ও চল্লিশ ফুট উঁচু একটা গোটা গাছ দিয়ে যতটা কাগজ তৈরি হয় ততটা কাগজ লাগছে জয়ঢাকের একটা সংখ্যা ছেপে বের করতে। তিনি প্রশ্ন করলেন সাহিত্যসেবা করবার জন্য প্রতি তিন মাসে একটা করে স্বাস্থ্যবান , পুরোন গাছকে মারাটা কি জয়ঢাকিদের উচিৎ হচ্ছে? সেই শুনে ইস্তক এই মুহূর্তে শুধুমাত্র আন্তর্জাল সংস্করণেই বের হচ্ছে জয়ঢাক পত্রিকা। ছাপার বই বেরোন বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

দুটো প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে এই পত্রিকা। নির্ভেজাল আনন্দ দেবার পাশাপাশি নিজের দেশ ও সংস্কৃতির সঙ্গে কিশোর পাঠকদের গভীর যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়া, আর অন্যদিকে সারা দুনিয়ার নানা আকর্ষণীয় খবর তাদের কাছে এনে হাজির করা। যে শিক্ষা প্রথাগত স্কুলের সিলেবাসে মিলবে না অথচ বড় হয়ে ওঠবার পথে নিতান্তই প্রয়োজন, আনন্দের পাশাপাশি সেই শিক্ষার স্বাদটিও স্কুলপড়ুয়াদের কাছে পৌঁছে দেবার কাজটা সাধ্যমত করছে জয়ঢাক।

এ ছাড়াও ভবিষ্যতের সম্পাদক গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে নানা বয়সের সহসম্পাদকের একটি দল তৈরি করা হয়েছে। সেখানে বড়ো আর মাঝারিদের সস্নেহ প্রশ্রয়ের ছায়ায় বেড়ে উঠবে আগামিদিনের নবপ্রজন্মের পত্রিকা সম্পাদকের দল, এই আমাদের আশা।

কিছু প্রয়োজনীয় তথ্যঃ

সমপাদকমণ্ডলী: দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য , বাসব চট্টোপাধ্যায় (অ: জা:), পার্থ চট্টোপাধ্যায় (পু:নি:)

সহ-সম্পাদকমণ্ডলীঃ উমা, সংহিতা, মহাশ্বেতা, মহুল

অলংকরণ নির্দেশনা: মৌসুমী রায়

আন্তর্জাল নির্দেশনা: রোহন কুন্দুস।

ডাকযোগাযোগ: জয়ঢাক, প্রযত্নে সুচেতনা প্রকাশন, ১৬এ টেমার লেন। কলিকাতা-৯

মেইল যোগাযোগঃ joydhak@gmail.com

জয়ঢাকের এই সংখ্যার দলবল

তুলিতে, মাউসে, কি বোর্ডে, ক্যামেরায়

দীপংকর

ন্যাশনাল ইনসটিট্যুট অব ডিজাইন -এর ছাত্র

কবি-পাহাড়ু শান্তনু

হাজারো কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও সময় বের করে তোমাদের জন্য কি বোর্ডে, মাউসে, তুলিতে কি ক্যামেরায়, লেখা কম্পোজ করে, ছবি গড়ে জয়ঢাককে সাজিয়ে তুলেছেন এই বন্ধুরা।

সরকারী কর্মী মৌসুমী

অধ্যাপক অমৃতা রায় (দাস)

মুকুট

বেসরকারী চাকুরে অনুপম

শিক্ষানবীশ সম্পাদক

ফটোগ্রাফার উমাদি

দেশ ও মানুষ, সেই মেয়েরা, বিশ্বের জানালা

ওয়েবকবি সংহিতা

ভারতের বৈজ্ঞানিক, ভারতের বনাঞ্চল, পুরাণ কথা

মহুল

পুরাতনী, স্মরণীয় যাঁরা

মহাশ্বেতা

লোককথা, বই পড়া

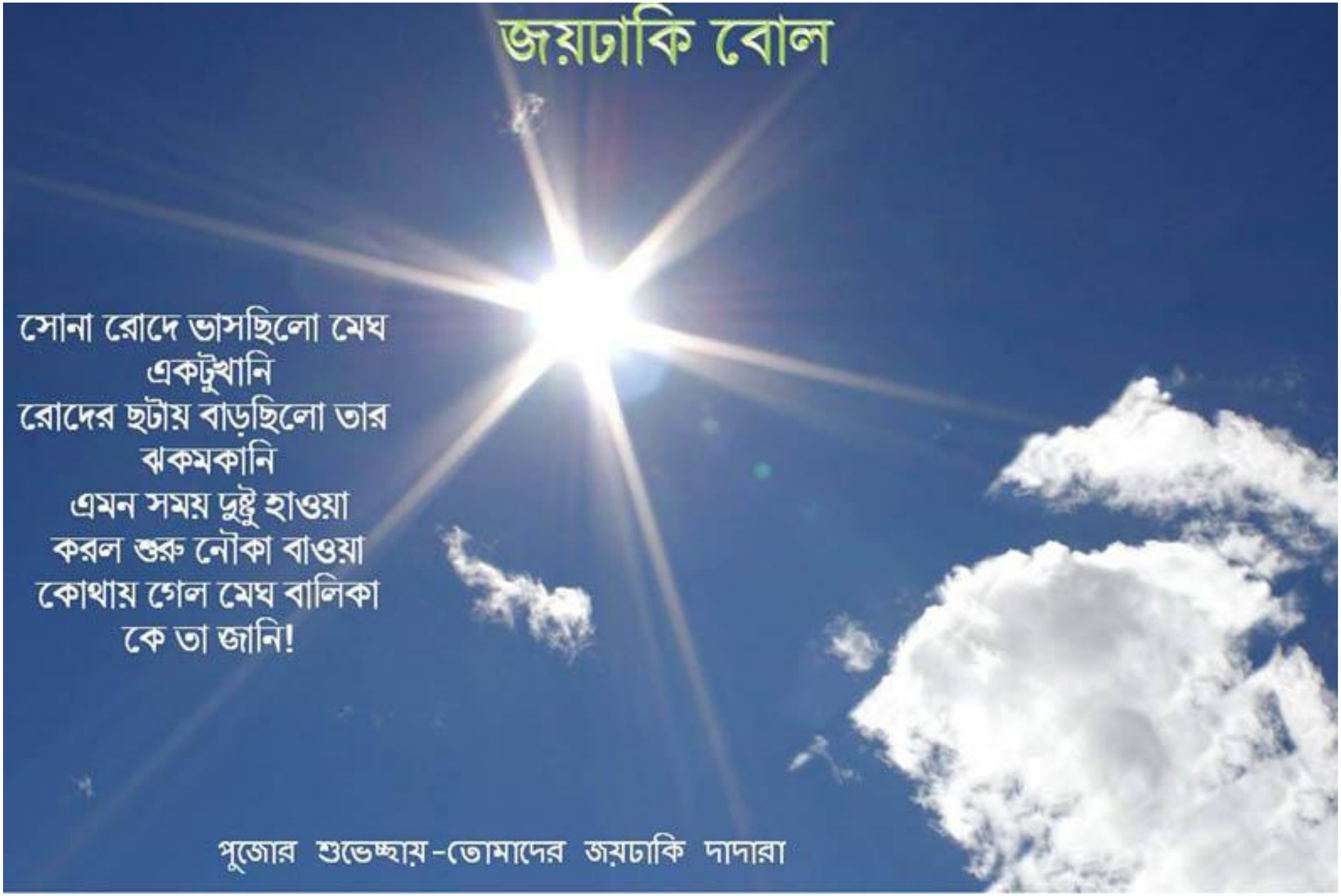
জয়ঢাকি বোল
সোনা রোদে ভাসছিলো মেঘ
একটুখানি
রোদের ছটায় বাড়ছিলো তার
ঝকমকানি
এমন সময় দুষ্টু হাওয়া
করল শুরু নৌকা বাওয়া
কোথায় গেল মেঘ বালিকা
কে তা জানি!
পুজোর শুভেচ্ছায়-তোমাদের জয়ঢাকি দাদারা

ছানাভূতের গপ্পো

গ্রিভাইদের "শু মেকার অ্যান্ড এলভস"-এর ছায়াবলম্বনে

অমৃতা

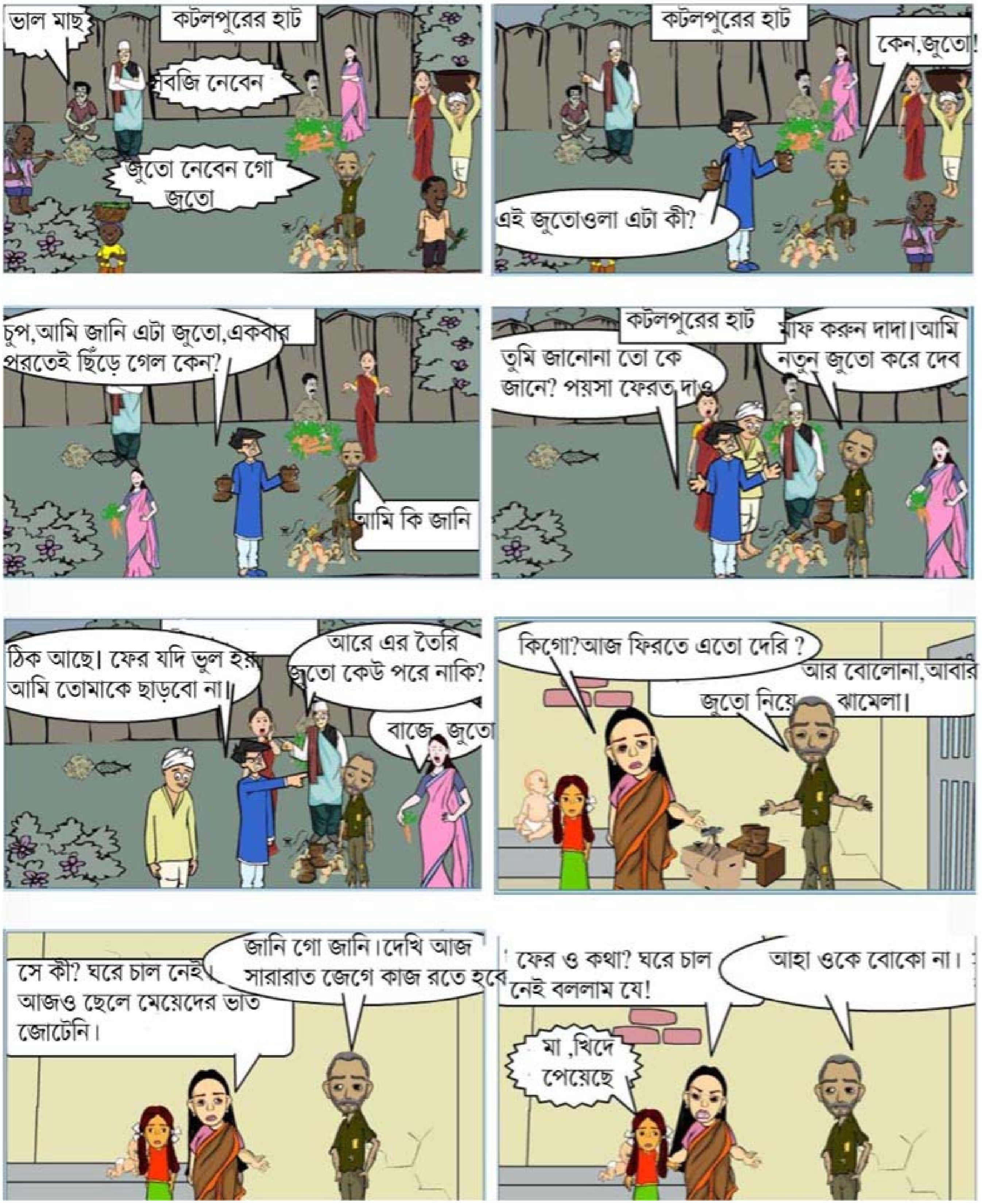

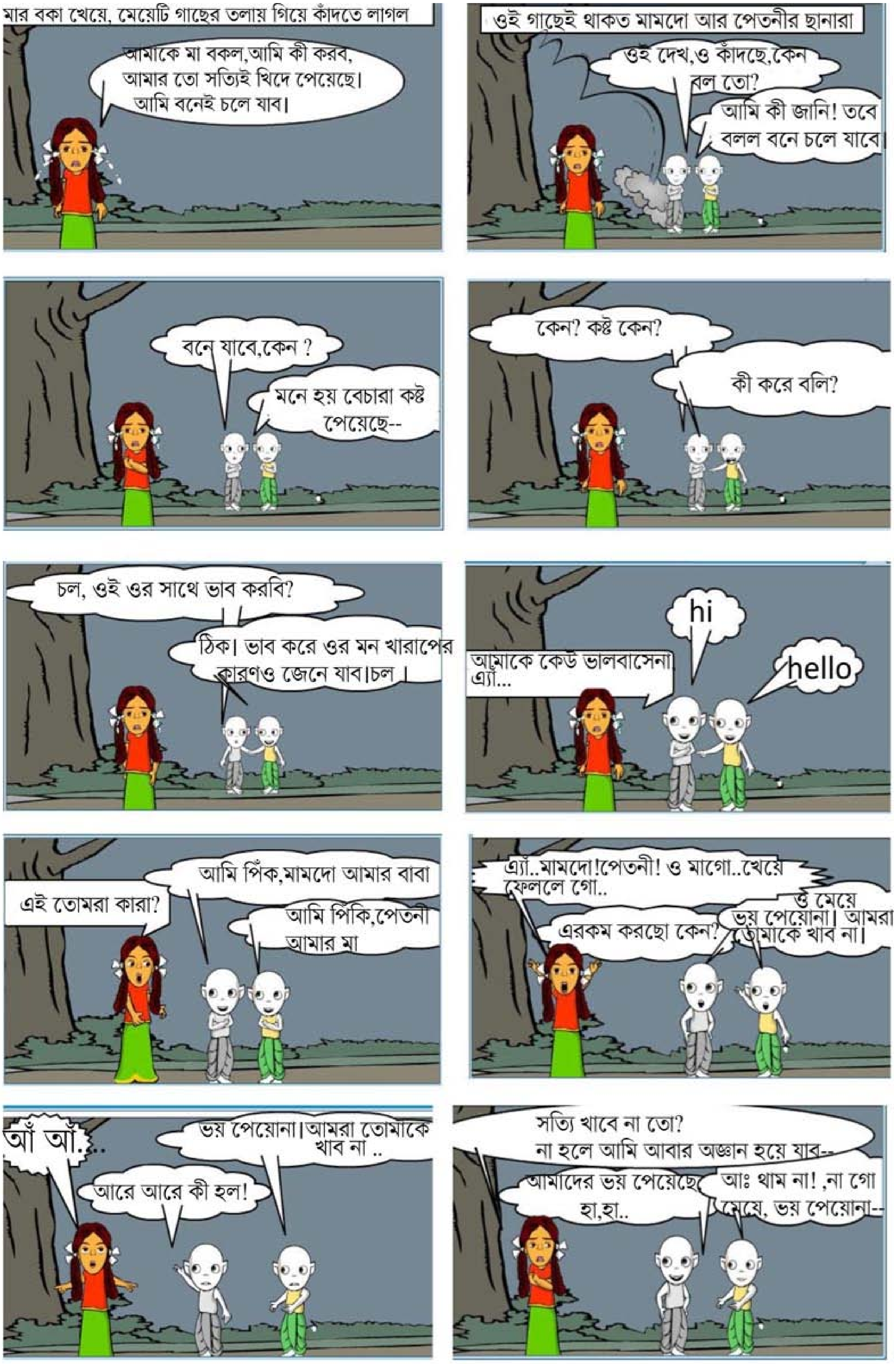
মার বকা খেয়ে, মেয়েটি গাছের তলায় গিয়ে কাঁদতে লাগল
আমাকে মা বকল,আমি কী করব, আমার তো সত্যিই খিদে পেয়েছে। আমি বনেই চলে যাব।
ওই গাছেই থাকত মামদো আর পেতনীর ছানারা
ওই দেখ,ও কাঁদছে,কেন বল তো?
আমি কী জানি! তবে বলল বনে চলে যাবে।
বনে যাবে,কেন ?
মনে হয় বেচারা কষ্ট পেয়েছে--
কেন? কষ্ট কেন?
কী করে বলি?
চল, ওই ওর সাথে ভাব করবি?
ঠিক। ভাব করে ওর মন খারাপের কারণও জেনে যাব।চল ।
আমাকে কেউ ভালবাসেনা এ্যাঁ...
hi
hello
এই তোমরা কারা?
আমি পিঁক,মামদো আমার বাবা
আমি পিকি,পেতনী আমার মা
এ্যাঁ..মামদো!পেতনী! ও মাগো..খেয়ে ফেললে গো..
এরকম করছো কেন?
ও মেয়ে ভয় পেয়োনা। আমরা তোমাকে খাব না।
আঁ আঁ...
ভয় পেয়োনা।আমরা তোমাকে খাব না ..
আরে আরে কী হল!
সত্যি খাবে না তো? না হলে আমি আবার অজ্ঞান হয়ে যাব--
আমাদের ভয় পেয়েছে হা,হা..
আঃ থাম না! ,না গো মেয়ে, ভয় পেয়োনা--

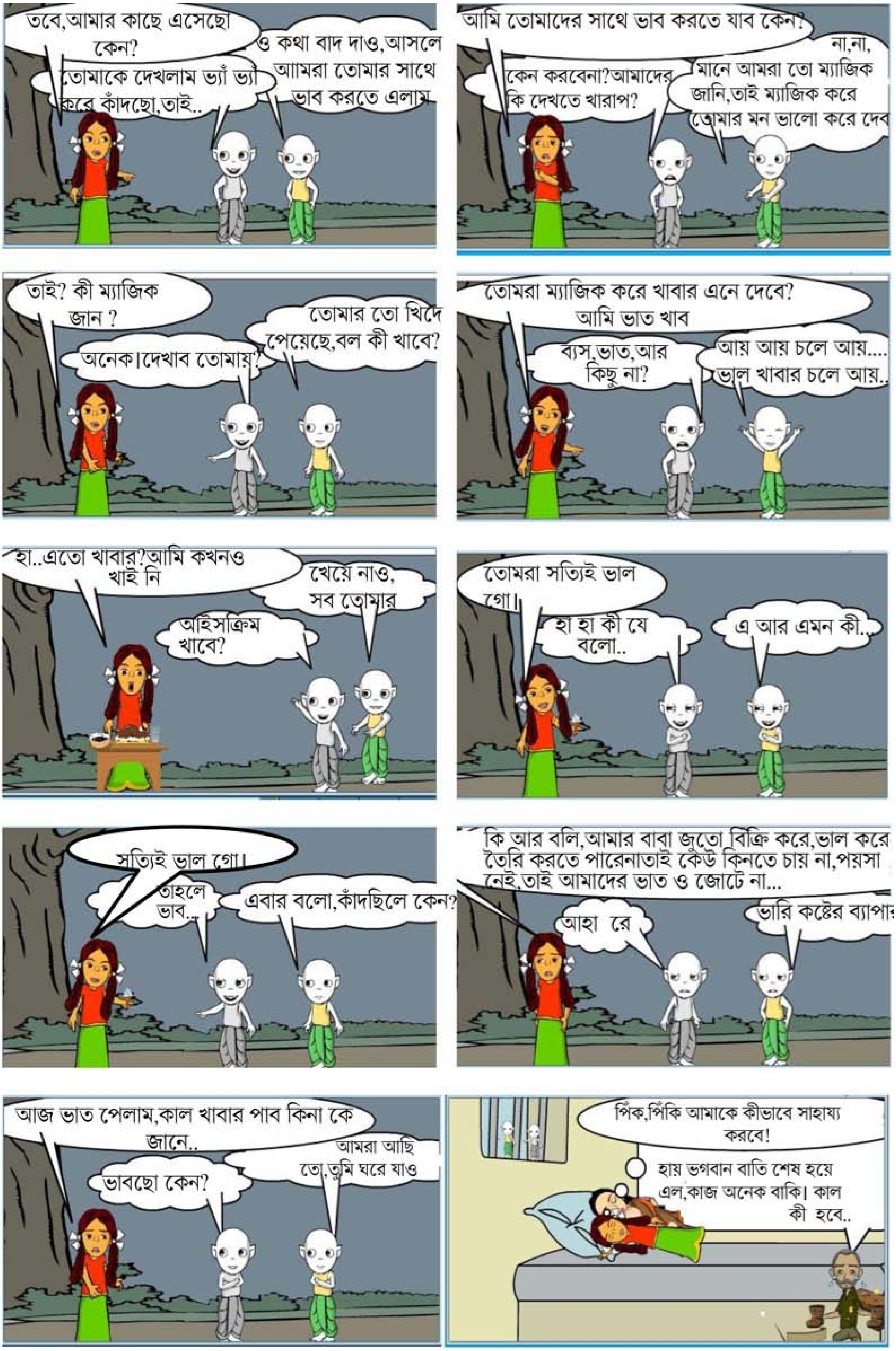

তবে,আমার কাছে এসেছো কেন?
তোমাকে দেখলাম ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদছো,তাই..
ও কথা বাদ দাও,আসলে আমরা তোমার সাথে ভাব করতে এলাম
আমি তোমাদের সাথে ভাব করতে যাব কেন?
কেন করবেনা?আমাদের কি দেখতে খারাপ?
না,না, মানে আমরা তো ম্যাজিক জানি,তাই ম্যাজিক করে তোমার মন ভালো করে দেব
তাই? কী ম্যাজিক জান ?
অনেক।দেখাব তোমায়
তোমার তো খিদে পেয়েছে,বল কী খাবে?
তোমরা ম্যাজিক করে খাবার এনে দেবে? আমি ভাত খাব
ব্যস,ভাত,আর কিছু না?
আয় আয় চলে আয়.... ভাল খাবার চলে আয়..
হা..এতো খাবার?আমি কখনও খাই নি
আইসক্রিম খাবে?
খেয়ে নাও, সব তোমার
তোমরা সত্যিই ভাল গো।
হা হা কী যে বলো..
এ আর এমন কী..
সত্যিই ভাল গো।
তাহলে ভাব...
এবার বলো,কাঁদছিলে কেন?
কি আর বলি,আমার বাবা জুতো বিক্রি করে,ভাল করে তৈরি করতে পারেনাতাই কেউ কিনতে চায় না,পয়সা নেই,তাই আমাদের ভাত ও জোটে না...
আহা রে
ভারি কষ্টের ব্যাপা
আজ ভাত পেলাম,কাল খাবার পাব কিনা কে জানে..
ভাবছো কেন?
আমরা আছি তো,তুমি ঘরে যাও
পিঁক,পিঁকি আমাকে কীভাবে সাহায্য করবে!
হায় ভগবান বাতি শেষ হয়ে এল,কাজ অনেক বাকি। কাল কী হবে..

হা হা এবার সবাই দেখবে আমাদের খেল...
কিরে দেখলি!
হায় হায় হায়,বাতি নিভে গেল,কাজ কী করে হবে...কাল কী হবে..
হা হা এটা কী! হ্যাঁরে ও এতো খারাপ জুতো কী করে বানায়?
পিঁক আবার..কাজের সময় মজা..দেরি করিসনা। জলদি কর..মন্তর পর..জলদি
ধ্যাত আমায় খালি বকিস কেন রে.. ফটাস ফট চটি আয় চটপট..আয় চটপট
আবার রাগ দেখানো হচ্ছে,দেখ কি করেছিস idiot কোথাকার জুতোর মন্তর পড় চটি নয়.
আয় তো রে জুতোএকটা ভাল জুতো
যা যা ভ্যানিশ হয়ে যা,আগের জুতো ভ্যানিশ হয়ে যা
হায়হায় আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম.. আরে একী..এমন সুন্দর জুতো..
ওমা কি দারুণ জুতো
হুম..এ তাহলে পিঁকপিঁকির কাজ
কটলপুরের হাট
ভাল মাছ
সবজি নেবে সবজি
এই দাও জুতো দাও,আজ আমি তোমাকে ছাড়ব না
এই নিন দাদা
কটলপুরের হাট
বাঃ এতো অসাধারণ,তবে ভাই আগের দিন অমন কাজ করেছিলে কেন..শোনো,আমার ২ ছেলেমেয়েরজন্যও তোমাকে এমন বানিয়ে দিতে হবে,টাকা আরমাপ আমি আজই দিয়ে যাব
না..আমি.. মানে
ও বাবা এতো ভেবোনা,রাতে ঘুমিয়ে পরো কাল দেখা যাবে
হায় ভগবান বউ মানতেই চাইছেনা যে এই জুতো আমি তৈরি করিনি,জানিনা এবার কীহবে? আরো জুতো কে করে দেবে?
পিকপিঁকির সা
দেখা করতে হ
তোমাদের ধন্যবাদ।কিণ্তু আরো জুতোর মাপ দিয়ে গেছে
ভাবছ কেন আমরা আছি না!
চিন্তা কোরোনা
বন্ধুর বাবা জেগে ছিল তাই আমি ঘুমের মন্তর পড়ে দিয়েছি
বাঃ বেশ করেছিস,চল এবার চটপট জুতোগুলো বানিয়ে ফেলি

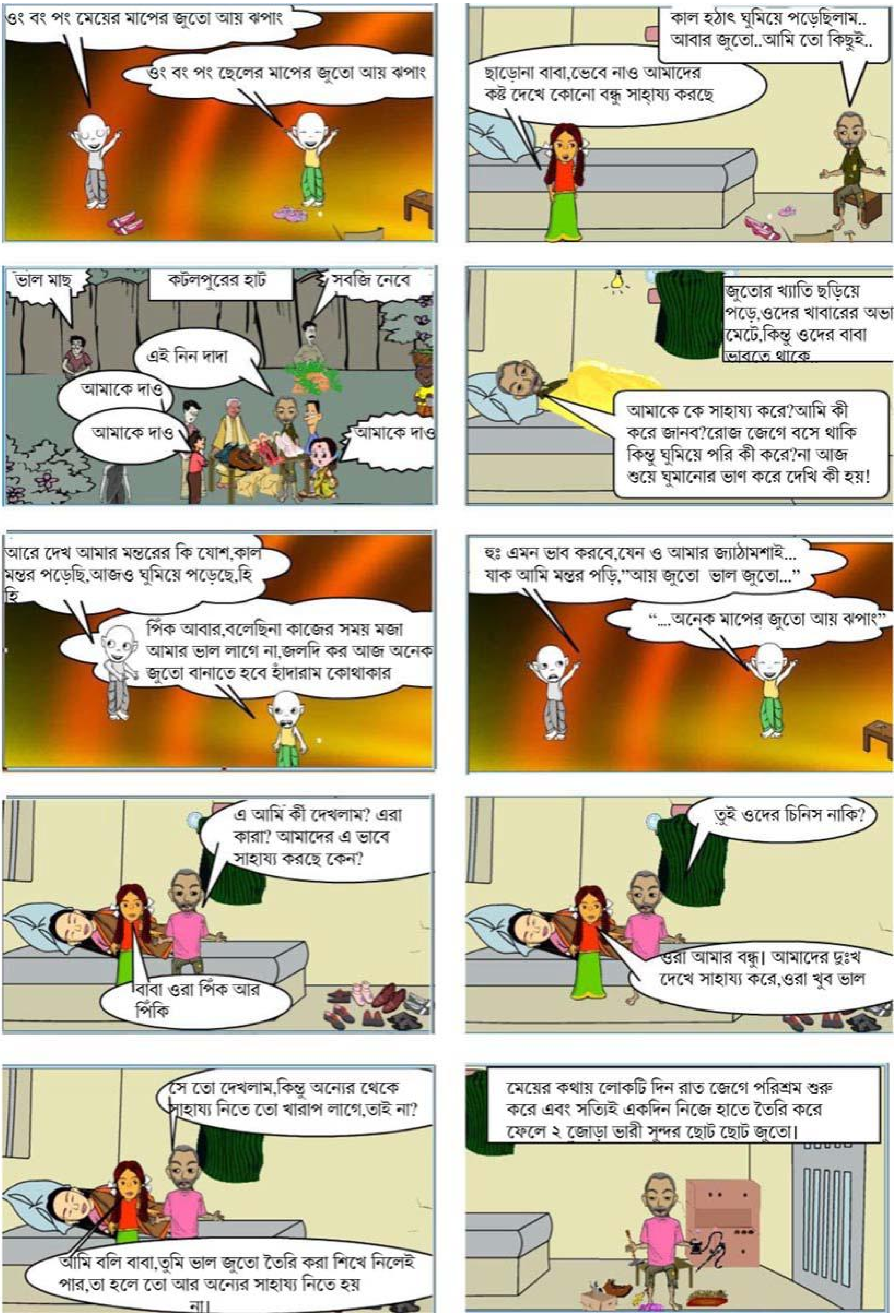
ওং বং পং মেয়ের মাপের জুতো আয় ঝপাং
ওং বং পং ছেলের মাপের জুতো আয় ঝপাং
কাল হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম.. আবার জুতো..আমি তো কিছুই..
ছাড়োনা বাবা,ভেবে নাও আমাদের কষ্ট দেখে কোনো বন্ধু সাহায্য করছে
ভাল মাছ
কটলপুরের হাট
সবজি নেবে
এই নিন দাদা
আমাকে দাও
আমাকে দাও
আমাকে দাও
জুতোর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে,ওদের খাবারের অভা মেটে,কিন্তু ওদের বাবা ভাবতে থাকে
আমাকে কে সাহায্য করে?আমি কী করে জানব?রোজ জেগে বসে থাকি কিন্তু ঘুমিয়ে পরি কী করে?না আজ শুয়ে ঘুমানোর ভাণ করে দেখি কী হয়!
আরে দেখ আমার মন্তরের কি যোশ,কাল মন্তর পড়েছি,আজও ঘুমিয়ে পড়েছে,হি হি
পিঁক আবার,বলেছিনা কাজের সময় মজা আমার ভাল লাগে না,জলদি কর আজ অনেক জুতো বানাতে হবে হাঁদারাম কোথাকার
হুঃ এমন ভাব করবে,যেন ও আমার জ্যাঠামশাই... যাক আমি মন্তর পড়ি,"আয় জুতো ভাল জুতো..."
“...অনেক মাপের জুতো আয় ঝপাং”
এ আমি কী দেখলাম? এরা কারা? আমাদের এ ভাবে সাহায্য করছে কেন?
বাবা ওরা পিঁক আর পিঁকি
তুই ওদের চিনিস নাকি?
ওরা আমার বন্ধু। আমাদের দুঃখ দেখে সাহায্য করে,ওরা খুব ভাল
সে তো দেখলাম,কিন্তু অন্যের থেকে সাহায্য নিতে তো খারাপ লাগে,তাই না?
আমি বলি বাবা,তুমি ভাল জুতো তৈরি করা শিখে নিলেই পার,তা হলে তো আর অন্যের সাহায্য নিতে হয় না।
মেয়ের কথায় লোকটি দিন রাত জেগে পরিশ্রম শুরু করে এবং সত্যিই একদিন নিজে হাতে তৈরি করে ফেলে ২ জোড়া ভারী সুন্দর ছোট ছোট জুতো।

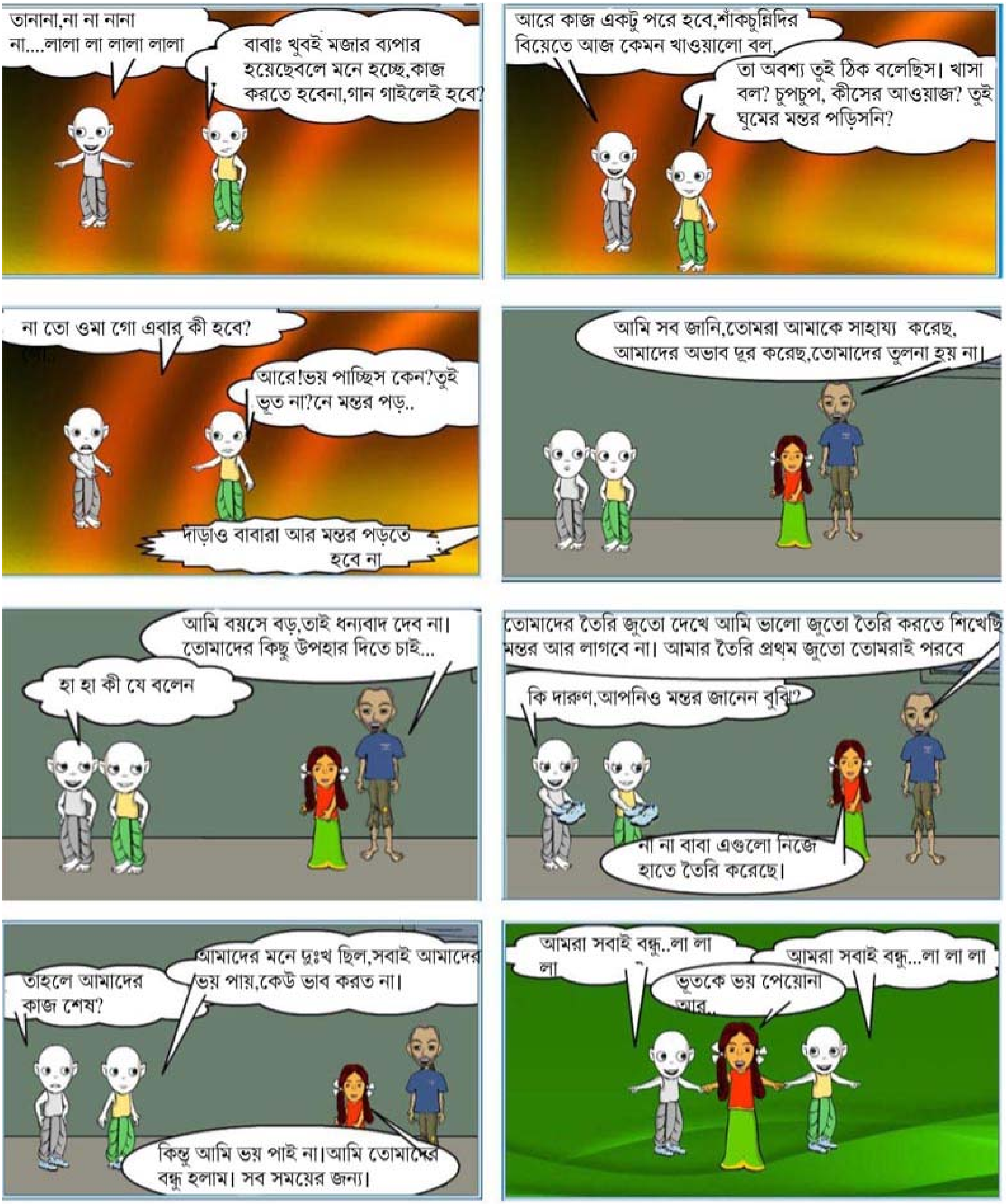

সেই থেকে সেই মেয়েটা আর পিঁকপিঁকি বন্ধু হয়ে গেল

সূর্যকান্ত রাজা আর চম্পাবতী রানি

লেখা ও রেখাঃ অনুপম,অন্তরা

রানি যেইনা ভিক্ষে দিতে গেছেন.....
রাক্ষসীটা রানিকে খপাৎ করে ধরল
আর দেখতে দেখতে বিশাল চেহারা ধরে, রানিকে নিয়ে পালালো।
রাজা তো খবর পেয়েই ছুটতে ছুটতে সেখানে হাজির। কিন্তু ততোক্ষণে রানিকে নিয়ে রাক্ষসী তো পগার পাড়।
একটা ফুল গাছ বলল ... রাক্ষসীটা রানিকে জঙ্গলে নিয়ে গেছে।
রাজা ছুটলেন জঙ্গলের মধ্যে......
সারা সন্ধ্যে খুঁজেও রানিকে না পেয়ে,
রাজা হতাশ হয়ে..... একটা গাছের নিচে বসে পড়লেন।

সেই গাছের ডালে থাকতো এক ব্যাঙ্গমা আর এক ব্যাঙ্গমী
তারা বলতে থাকলো
"গহন বনের রাক্ষুসী, রানীকে পেয়ে খুব খুশী !"
"ঘুম পাড়িয়ে রাখলো ধরে, খাবে পরে আয়েশ করে ।।"
এই কথা শুনে রাজা তো অবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু রানি বেঁচে আছেন শুনে তিনি খুব খুশি হলেন।
রাজা জিজ্ঞেস করলেন,
"তোমরা কারা ? আমাকে দয়া করে বলো কী করে রানিকে বাঁচাই ?"
ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমী বললো,
"বনের শেষে পাহাড় পাবে, এক শ্বাসেতে টপকে যাবে।"
"ওইপারেতে প্রাসাদ আছে, ডাইনীর প্রাণ সোনার মাছে।"
রাজা এই কথার মানে ভাবতে থাকলেন।

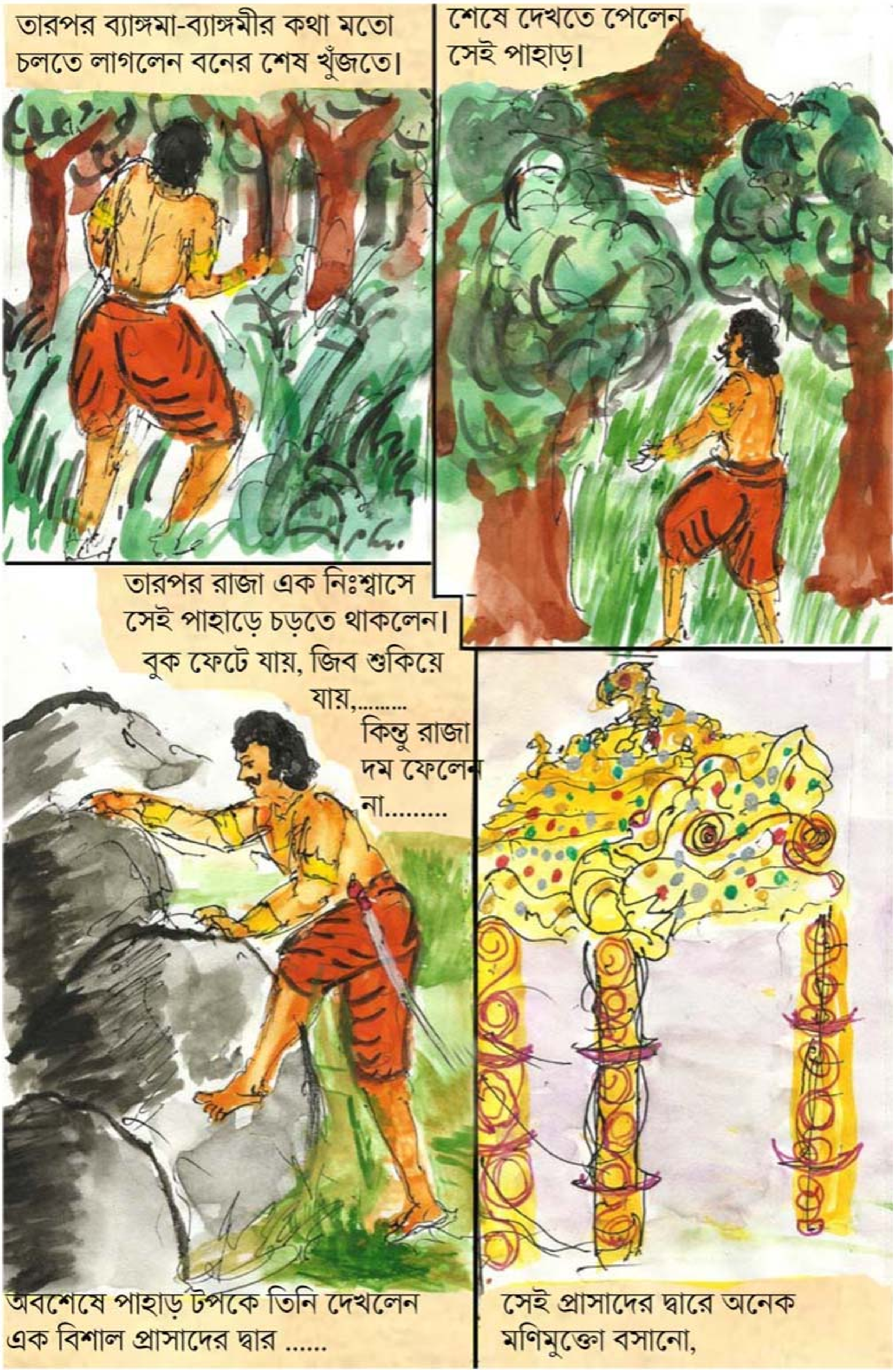
তারপর ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর কথা মতো
চলতে লাগলেন বনের শেষ খুঁজতে।
শেষে দেখতে পেলেন
সেই পাহাড়।
তারপর রাজা এক নিঃশ্বাসে
সেই পাহাড়ে চড়তে থাকলেন।
বুক ফেটে যায়, জিব শুকিয়ে
যায়,.........
কিন্তু রাজা
দম ফেলেন
না.........
অবশেষে পাহাড় টপকে তিনি দেখলেন
এক বিশাল প্রাসাদের দ্বার ......
সেই প্রাসাদের দ্বারে অনেক
মণিমুক্তো বসানো,

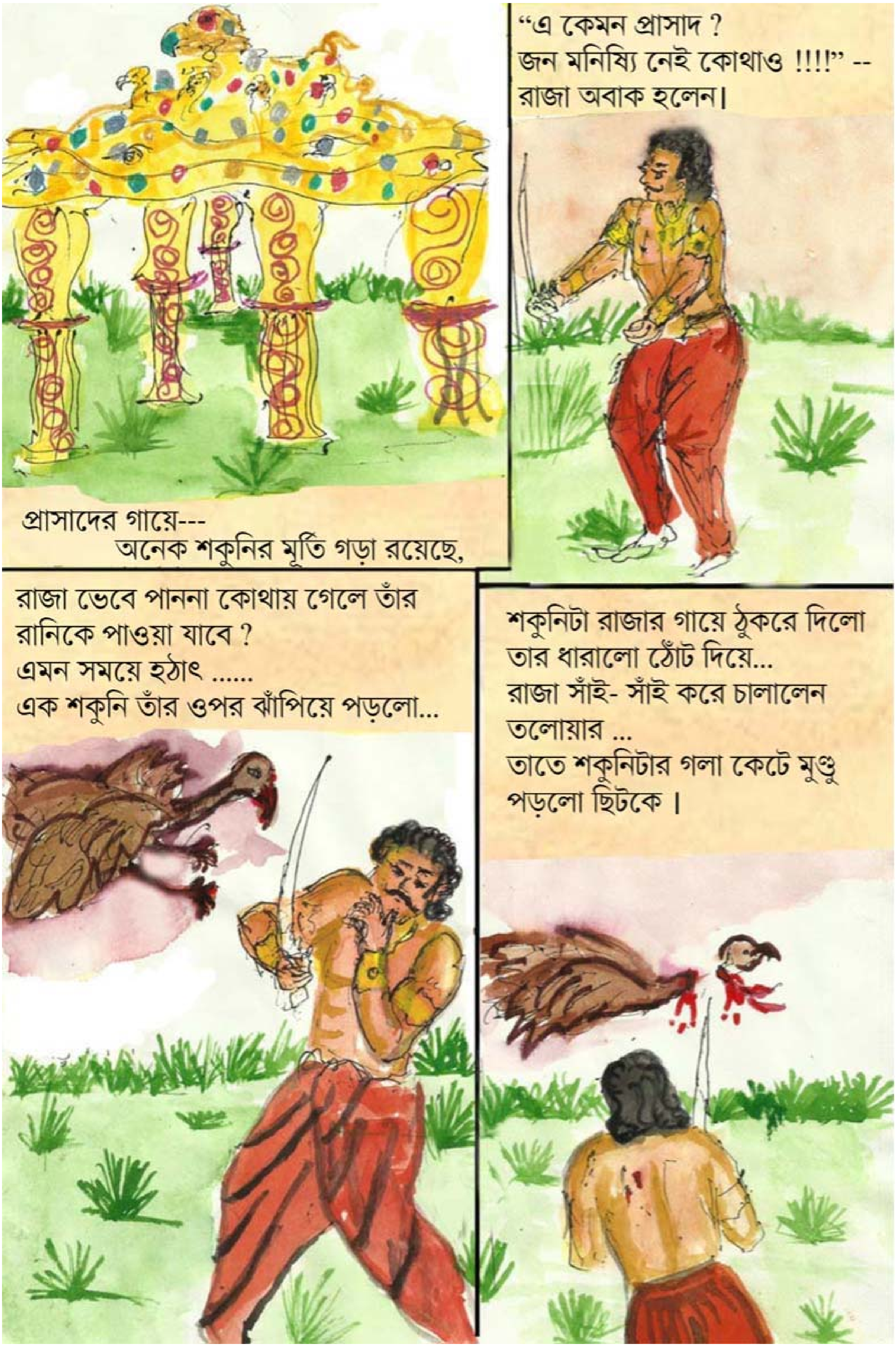
প্রাসাদের গায়ে---
অনেক শকুনির মূর্তি গড়া রয়েছে,
“এ কেমন প্রাসাদ ?
জন মনিষ্যি নেই কোথাও !!!!” --
রাজা অবাক হলেন।
রাজা ভেবে পাননা কোথায় গেলে তাঁর
রানিকে পাওয়া যাবে ?
এমন সময়ে হঠাৎ ......
এক শকুনি তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো...
শকুনিটা রাজার গায়ে ঠুকরে দিলো
তার ধারালো ঠোঁট দিয়ে...
রাজা সাঁই- সাঁই করে চালালেন
তলোয়ার ...
তাতে শকুনিটার গলা কেটে মুণ্ডু
পড়লো ছিটকে ।

সেই শকুনির রক্তধারা রাজাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো ...
এক সরোবরের দিকে...
রাজার তখন মনে পড়লো সেই ব্যাঙ্গমীর কথা। ব্যাঙ্গমী বলেছিলো ডাইনির প্রাণ আছে সোনার মাছে......।
যেই না ভাবা...........,
অমনি রাজা ঝাঁপ দিলেন সেই সরোবরে,
কিছুটা জলের নিচে একটা জায়গা থেকে অনেক আলো বেরিয়ে আসছে। সেদিকে গিয়ে দেখলেন, সেখানে রাশি রাশি ধনরত্ন ছড়িয়ে আছে !!!
ঘড়ায় ঘড়ায় মোহর, সোনার হার, সোনার বাক্সে গয়না বোঝাই করা আছে।
কিন্তু রাজা সেদিকে গেলেন না। তিনি বুঝলেন এ এক মায়ার জাল ... তাঁকে প্রলোভন দেখিয়ে অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার ফাঁদ।
তাই তিনি সাঁতরে চললেন আরও গভীরে...

কিছুদুর যেতেই তাঁর সামনে এল এক কুমীর !!
রাজার সঙ্গে তার ভয়ানক লড়াই হোল।
শেষে রাজা তার মুখের ভেতর তলোয়ার ঢুকিয়ে দিলেন ।
তারপর রাজা দেখতে পেলেন...... এক সোনার পাত্রে ঝলমল করছে এক সোনার মাছ !!!
রাজা সেই মাছটি সঙ্গে নিয়ে ওপরে উঠে এলেন,
আর দেখলেন......
তীরেই দাঁড়িয়ে সেই রাক্ষসী !!!!

রাজা তখন একটুও সময় নষ্ট না করে
তলোয়ার দিয়ে ঘ্যাচাং করে কেটে
ফেললেন সেই মাছের মাথা......
সঙ্গে সঙ্গে......
সেই রাক্ষুসীর মুণ্ডুও ধড় থেকে ছিঁড়ে
খসে পড়লো...
রাজা প্রাসাদের ভেতর গিয়ে দেখলেন
রানি এক জায়গায় বসে বসে কাঁদছেন,
আর ব্যাঙ্গমাব্যাঙ্গমী তাঁকে বলছে -
“রাজার হাতে
ডাইনী মলো,
রানির দুখের
দিন ফুরোল।।”
রাজা তখন রানিকে নিয়ে দেশে ফিরে
গেলেন, আর সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন
ব্যাঙ্গমাব্যাঙ্গমীকে ।।

জাদুবনের গল্প

লেখা দেবজ্যোতি। ছবি দীপংকর।

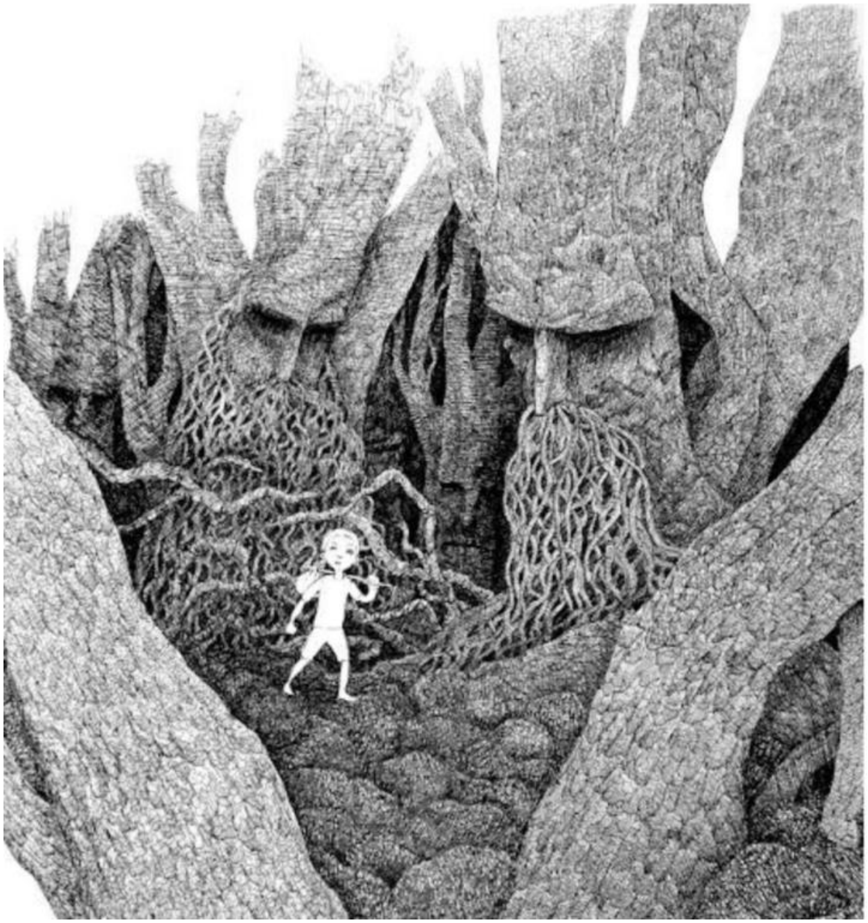

আমি যেদিন বড়ো হলাম, ছেড়ে নিজের বাড়ি
অনেক দূরের অন্য কোন দেশে
একলা দিলাম পাড়ি
লাঠির আগায় পুঁটলি কাঁধে নিয়ে
এ পথ ও পথ দিয়ে
একলা হাঁটি, কেউ সাথে নেই,বাবার সঙ্গে আড়ি।
নাম না জানা গাছের ফাঁকে
আঁধার অলিগলি
লাঠির আগায় পুঁটলিখানা নিয়ে
একলা একলা চলি।
চলতে চলতে সারা দিনের শেষে
পিপলিনগর পেরিয়ে গিয়ে
জাদুর বনের নাগাল পেলাম এসে
দরজা খুলে একটুখানি হেসে
ফিসফিসিয়ে পাতায় হাওয়ায়
দুই প্রহরী বলল আমায়
সুস্বাগতম জাদুর বনের দেশে।

বনের ভেতর অন্ধকারে যেই না খানিক যাওয়া
অমনি হল ভীষণ শব্দ, উঠলো ঝোড়ো হাওয়া
হাওয়ার বেগে নাড়িয়ে দিয়ে হাজার গাছের পাতা
উড়ে এলো গাছ দানবী, তিনখানা তার মুখোশহেন মাথা

দুলছে পায়ে চারটি খাঁচা নখ বাগিয়ে ধরা
একটা খাঁচায় আমার মতই
আরেকখানা ছোট্ট ছেলে ভরা
বলল হেঁকে, "এবার তোকে কে দেখি আজ বাঁচায়
লক্ষ্মী হয়ে গুটগুটিয়ে
আয় ঢুকে আয় দরজা খোলা খাঁচায়"

আমি তখন পাহাড়চূড়ায় চড়ে
মুখের সামনে তার
বাগিয়ে ধরে জন্মদিনে পাওয়া
ঝিলিক দেয়া মাণিক তলোয়ার
হাঁকার দিলাম, "লড়বি আমার সাথে?
হীরক আমি, আমার ভয়ে
রাক্ষসেদের ঘুম আসে না রাতে।
তাই শুনে সে তিনটে মাথা গুটিয়ে নিয়ে পেটে
অন্য ছেলেটাকে
নামিয়ে রেখে পালিয়ে গেল আ- স্তে আস্তে হেঁটে।

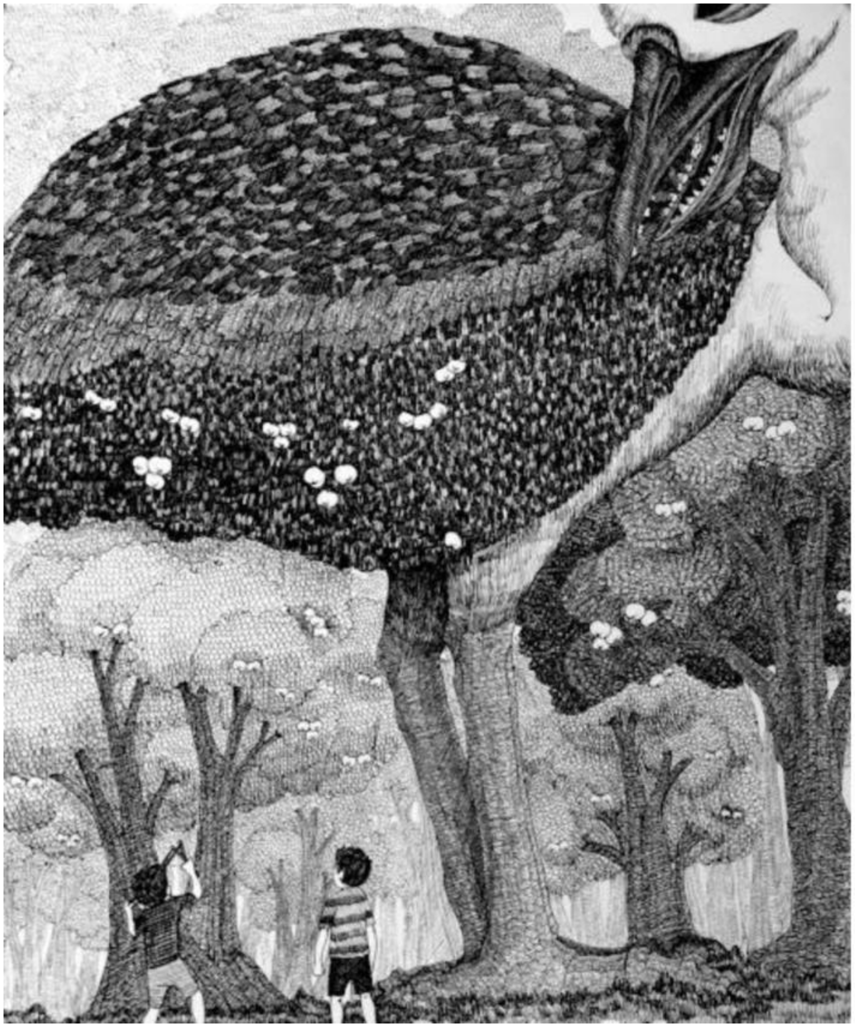

বিজন বনে বন্ধু পেলাম খাসা
দুজন মিলে ঘুরতে ঘুরতে খুঁজে পেলাম
গরুড় পাখির বাসা
গুলতিখানা বাগিয়ে ধরে হুকুম দিলাম হেঁকে
চড়িয়ে পিঠে বন পেরিয়ে মায়ের কাছে
আসতে হবে রেখে
গুলতি দেখে পেয়ে ভীষণ ভয়
গরুড় বলল, "এক্ষুণি। নিশ্চয়!"

আকাশপথে হাজার যোজন রাস্তা দিয়ে পাড়ি
সকাল হবার আগেই ফিরে চলে এলাম বাড়ি
দরজা খুলে তক্ষুণি এক ছুটে
দুজন মিলে ঘুমিয়ে গেলাম মায়ের খাটে উঠে।

প্রজাপতি পার্ক

রতনতনু ঘাটী

আজ পাখির মত উড়তে ইচ্ছে করছে তিথির। ওর আট বছর বয়েস। আর ক'দিন পরে নয়ে পড়বে। ওর খুশির একটাই কারণ আজ বিকেলের মধ্যে উদয়পুর থেকে আসবেন ছোটকাকু, কাকীমা আর কাকুর ছেলে টুপুর, আর বেঙ্গালুরু থেকে মেয়ে ছুটিকে নিয়ে আসবেন রাঙাপিসি। এদের কাউকেই চোখে দেখে নি তিথি।

ওর জন্মেরও আগে কাকু, পিসি আর বাবার মধ্যে কি নিয়ে যেন মনোমালিন্য হয়ে ছিল। সেই থেকে ওঁদের মুখ দেখাদেখি বন্ধ। রাগ করে কাকু চলে যান উদয়পুর। চাকরিটা একটা অছিলা মাত্র। সেখানেই বিয়ে আর বাড়ি করে থেকে গিয়েছেন। তারপর টুপুর হয়েছে।

আর রাঙাপিসি পড়ার অজুহাতে চলে গিয়েছিলেন বেঙ্গালুরু। সেখানেই পাশ করে চাকরি আর বিয়ে করেছেন। ওঁর মেয়ে ছুটি। ওঁদের কারুর সঙ্গেই কখনও দেখা হয় নি তিথির।

বাবা অফিস থেকে ফিরে ঠামিকে বলেছিলেন, 'মা তুমি বলেছিলে না দোলের দিন তোমার জন্ম?'

ঠামি ঘাড় নেড়ে বলেছিলেন, 'সেইরকমই তো মা বলত।'

ব্যাস, বাবা সোজা ছোটকাকু আর রাঙাপিসিকে মেল করেছিলেন, 'মার বয়স তো আশি হবে এবার দোলের দিন। মা'র তো কখনও জন্মদিন পালন করা হয়নি। এবার আমি মা'র জন্মদিন পালন করব। তোরা যদি আসিস খুব আনন্দ হবে।'

মেলের উত্তর এসেছিল চটপট দুজনের কাছ থেকেই। আজই ছোটকাকু আর রাঙাপিসিরা আসছেন। মা সারাদিন ঘর গুছোতে ব্যস্ত। কাল ঠামির জন্মদিন। উঃ, কি যে আনন্দ হবে। টুপুর আর ছুটিকে প্রথম দেখবে তিথি। প্রথম দেখবে কাকু-কাকীমা, পিসি-পিসানকেও। তিথি ঠিক করেই রেখেছে টুপুরকে দেবে ওর পঞ্চম জন্মদিনে পাওয়া টেডি বিয়ারটা আর ছুটিকে দেবে ওর রঙিন বউ পুতুলটা। সিঁড়ির নিচ থেকে পুতুলগুলোকে বার করে তিথি নিয়ে এসেছে চিলেকোঠার ঘরে। কাকু নারকোলের ঘুগনি খেতে ভালোবাসেন বলে মা'র তাও বানানো হয়ে গেছে। রাঙাপিসি ভালোবাসতেন তিলের নাড়ু। কাল সন্ধেবেলা তাও বানিয়ে ফেলেছেন মা। 'ঠাকুরমার ঝুলি'র কোন গল্পটা আমাদের তিনজনকে শোনাবেন ঠামি তাও তাঁর ঠিক হয়ে আছে।

সারা ঘরময় নেচে বেড়াতে বেড়াতে তিথি দেখল গেটের বাইরে দু'টো গাড়ি এসে থামল। ওই তো ওঁরা নামছেন। জানলায় ঠামির ফোকলা দাঁতের হাসিও চোখ এড়াল না তিথির।

তিথি পিঠে হাত দিতেই মনে হল, প্রজাপতির দু'টো রঙিন ডানা কে যেন তার পিঠে বেঁধে দিয়েছে। ও মা, দু'টো নয়, চারটে, ছ'টা, না না অনেক প্রজাপতির ডানা আজ তার পিঠে কে বাঁধল? উড়ছে, তিথি উড়ছে। হঠাৎ তাকিয়ে দেখল, তাদের ঘরময় লাল-নীল, হলুদ-সবুজ রঙের হাজার হাজার প্রজাপতি উড়ছে। উঃ তিথি ভাবতেই পারছে না, কেমন করে তাদের বাড়িটা আজ এমন একটা প্রজাপতি পার্ক হয়ে গেল।

ছবিঃ অমৃতা

বাঘ ও শেয়ালের গল্প

তরুণ কুমার সরখেল

বাঘ যাচ্ছিল জলের খোঁজে। এমন সময় একটা শেয়াল তার সামনে এসে পড়ল। বাঘকে দেখে শেয়াল লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যাবার তালে ছিল। কিন্তু বাঘের চোখ এড়িয়ে যেতে পারল না। বাঘ জিজ্ঞেস করল, কি হে শেয়াল পণ্ডিত, হাতে ওটা কি? শেয়াল কাঁচুমাচু হয়ে উত্তর দিল, হাতে এই সামান্য কয়েকটা মাছ আছে। নিয়ে যাচ্ছি বউ-এর জন্যে। বউ-এর জ্বর হয়েছে কিনা তাই এ কদিন শিকারে যেতে পারে নি।

বাঘ সব শুনে বলল, ‘আচ্ছ বেশ বেশ। তা কি মাছ আছে ঝুড়ির মধ্যে?

শেয়াল বলল, আজ্ঞে সরল পুঁটি।

বাঘ বলল, আহা সরল পুঁটি। কতদিন খাই নি। দে তো দুটো, চেখে দেখি।

শেয়াল আর কী করে! ঝুড়ি নামিয়ে দুটো বড় দেখে পুঁটি মাছ বাঘকে দিল। বাঘ তা চেটেপুটে খেয়ে বলল, আহা, কি স্বাদ। আরো গোটা দুই দে দেখি, খেয়ে শান্তি পাই।

শেয়াল বলল, আর তো বেশি নেই। বাকী কটা বাড়ি নিয়ে যাই। যেমনি সে কথা বলা অমনি বাঘ এক থাবা মেরে বাকি কটা মাছ সব কেড়ে খেয়ে ফেলল। আর শেয়াল ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। বাঘ ঢেঁকুর তুলে বলল, এই বনের রাজা আমি। মাঝে মধ্যে এরকম খাজনা দিলে তবেই না ভালো লাগে। আচ্ছা আমি চলি। এখন পেট পুরে জল খেয়ে একটু জিরিয়ে নি গে।

শেয়াল আর কী করে! খালি ঝুড়ি হাতে ঘরে ফিরে গেল। বউকে সব ঘটনা বলল। তার বউ ছিল খুব চালাক। সে শেয়ালকে বলল, বাঘকে জব্দ করতে হবে। তুমি কালই আবার বাঘের কাছে যাও। গিয়ে বলো, বাঘমশাই আপনি বনের রাজা। তাই দয়া করে আমাদের গরীবের ঘরে আজ পায়ের ধুলো দেবেন। আমরা আপনার সেবা করে ধন্য হব।

বউ-এর কথা মত শেয়াল চলল বাঘকে নেমতন্ন করতে। আর তার বউ চলল চাষীর বাড়ির দিকে। চাষীরা মাঠে আখ থেকে পানা করে তা থেকে গুড় তৈরি করছিল। শেয়ালের বউ এক হাঁড়ি গরম গুড় সেখান থেকে সরিয়ে নিল, চাষীরা কিছু বুঝতেই পারল না।

এদিকে শেয়াল বাঘকে ঘরে ডেকে এনে বাঘের পা ধুইয়ে দিল। তারপর হাত পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই তার বউ এক হাঁড়ি গুড় এনে তার সামনে রাখল। বাঘ নতুন গুড়ের গন্ধ পেয়েই নড়েচড়ে বসল। সে কোন কিছু চিন্তা না করেই মুখ ডুবিয়ে দিল হাঁড়ির মধ্যে। আর যায় কোথায়। একে সেই গুড় ছিল চিটা তার ওপর গরম। বাঘের মুখ তো পুড়লই, পুরো হাঁড়িটাই আটকে গেল মুখের মধ্যে, আর বের হতে চায় না। বাঘের সে কি নাচ। আর সেই নাচ দেখে শেয়াল আর তার বউ গান জুড়ে দিল, হুক্কা হুয়া-হুয়া হুক্কা হুয়া-হুয়া........।

ছবিঃ অনুপম

ফুলচোর,চোর নয়

তাপসকিরণ রায়

নাতি জেনেশুনে দাদুর পেছনে লাগবে। দাদু যদি বলেন ডান দিক,নাতি বলবে,না,বাঁদিক। দাদু বললেন,উপরে,অমনি নাতি বলে উঠলো নিচে। বস্তুত দাদু আর নাতিনাতনিদের মধ্যে লাগালাগির স্বভাব চিরকালের। দাদু মানে বয়স্ক—বুড়োর পর্যায়ে পড়ে—আর কথায় বলে—বুড়ো আর গুঁড়ো সমান। এখানেও হয়েছে তাই—বুড়ো আর গুঁড়োর গাঁঠবন্ধন ঘটেছে।

নাতি প্রতি বছর স্কুল ছুটির সময় বেড়াতে আসবে দাদুর বাড়ি। বছরে দুবার,এক পরীক্ষার পর গ্রীষ্মের অবকাশ, দুই পুজোর অবকাশ। মানে লম্বা দুটি ছুটিতে দাদুর ওখানে ছাড়া অন্য কথাও যাবে না পমপম। দাদু ওঁরা থাকেন মফস্বল এলাকায়,জায়গার নাম পায়রাডাঙা। দমদম থেকে পায়রাডাঙা ট্রেনে ঘন্টাদেড়েকের পথ। ট্রেনে চাপো আর দেড় ঘন্টা পরে পৌঁছে যাও পায়রাডাঙা,দাদুর বাড়ি। ছুটির দিনগুলিতে পড়াশোনার ঝামেলা থাকে না,দাদুর হাত ধরে ঘুরে বেড়াও,গল্প কর, গল্প শোন —মজাই মজা!

দাদু পমপম নাম নিয়ে বড় ঠাট্টা করেন নাতির সঙ্গে, রগড় করে যখন তখন ডেকে ওঠেন,পমপম, পম্পমাপম—পমপমের রাগ হয়,সুন্দর নামকে দাদু কি করে ফেলে দেখ! ভেবে ভেবে পমপম দাদুর একটা নাম রাখে,বলে ওঠে তোমার নাম ডুগডুগি,তারপর নামটাকে বিকৃত করে বলে, ডুগডুগ--ডুগি—নাতি দাদুর খেলা এমনি ভাবে চলতে থাকে।

দাদু আশুতোষ এক বছর হোল চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। তিনি জানেন, চাকরির জন্য যে সময় ব্যয় হত —সেই সাত আট ঘণ্টা-যেটা ঘরে বসে কীভাবে কাটাতে হবে তার একটা ছক রেখে চললে দীর্ঘ আট ঘণ্টা সময় তাঁর কাটাতে অসুবিধা হবে না।

তাই তিনি ঠিক করলেন খুব ভোরে উঠে মর্নিং ওয়াক করবেন কমসে কম এক ঘন্টা।ওই সময় তিনি স্ত্রীর ফুলের জোগাড় করে দেবেন।এক ঘটার মধ্যে তিনি কম করে চার কিলোমিটার পথ হেঁটে চলতে পারেন! হাঁটার পথে পড়ে সেনেদের বাগান, বোসেদের বাগান আর মল্লিকদের বাগান। বাগানগুলি সারা বছর কোনো না কোনো ফুলে ভরা থাকে। জবা,করবী,স্থলপদ্ম,জুঁই,গন্ধরাজ,স্বর্ণচাঁপা, এ ছাড়া মরশুমের ফুল গাঁদা ,দোপাটি,গোলাপ, কসমস আরও কত কি নাম তার, সব ফুল তিনি চেনেন না। হাঁটাপথে প্রথমে পড়ে সেনেদের বাগান, বাগানের দেওয়াল খুব উঁচু, ভেতরে যাওয়া সম্ভব নয়,তবে জবা,স্থলপদ্ম,করবী গাছ দেওয়াল ছাপিয়ে বাইরের দিকে উপচে পড়েছে,বাইরের উঁকি ঝুঁকি মারা ডালপালা গুলিতে ফুটে থাকে অনেক ফুল, আশুতোষবাবু হাতের নাগালের ফুলগুলি তুলেনেন,তারপর দুচার লাফ দিয়ে ডালপালা নুইয়ে যে কটা ফুল পান থলিতে ভরেন। এবার হেঁটে এগিয়ে যান,প্রায় আধা কিলোমিটার দূর বোসেদের বাগান পর্যন্ত, এখানেও দেওয়াল ঘেরা বাগান, নানারকমের ফুলের মেলা বসেছে বাগানে,সে সঙ্গে বেশ কিছু ফলফুলুরির গাছ -আম,কলা,বাতাবি লেবু,নারকেল,সুপারি এসব। এ বাগান থেকে কোনো ফুল তোলা হয় না, ফুলগাছ সব একেবারে বাগানের মাঝখানে,দেওয়ালের পাশগুলো সব ফলগাছে ভরা। ফল চুরি করা আশুতোষবাবুর কাজ নয়।

ফেরার পথে হেঁটে অন্য রাস্তা ধরে আসেন তিনি,পথে পড়ে মল্লিকদের ফুল বাগান। মল্লিকদের বাগানে হরেকরকমের ফুলগাছ ভরা। ছোট মরশুমি ফুল ছাড়া অনেক রকম বড় জাতের ফুল গাছ,যেমন স্বর্ণ চাঁপা, কদম, গন্ধরাজ ফুলের গাছ। তাছাড়া, তিনচার রঙের করবী ফুল--লাল,সাদা,গোলাপি রঙের জবা ফুল। এ বাগানের দেওয়াল বড় নিচু। বেশি হলে চার ফুট হবে। বাগানের শোভা পথচারীকে দেখাবার জন্যই বোধ হয় এ ব্যবস্থা হবে! আশুতোষবাবু এ জাইয়গায় এসে রোজ থেমে যান। বাগানের শোভা দেখেন, দেখেন চাঁপা গাছে কত ফুলএসেছে, কিম্বা ছাতার মত দাঁড়িয়ে থাকা কদম্ব গাছেদের ফুলগুলি কেমন সুন্দর লাগছে! বাতাসে ছড়িয়ে থাকা গন্ধরাজের সুবাস তিনি নাক দিয়ে জোরে টেনে নেন। গন্ধরাজ, চাঁপা, কদম্বের আলাদা কোনো গন্ধ আসছে কিনা নাক টেনে পরখ করে দেখেন! তিনি স্পষ্ট ফুলের ঘ্রাণ পান,কখনো চাঁপার,কখনো গন্ধরাজের,আবার কখনো হাওয়ায় বয়ে আনে কদম্বের মিষ্টি গন্ধ! পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে বাগানে হাত বাড়িয়ে বেশ কিছু ফুল তুলে নেন তিনি। এমনি সময় মল্লিকবুড়োর লাঠির ঠক ঠক শব্দ শুনতে পান। বুড়ো বাগান পাহারা দেন। দু চারটি ফুল তুললে কিছু বলেন না। আশুতোষবাবুকে একদিন তিনি বলেও ছিলেন, “দেখুন আপনি ফুল তোলেন আমি জানি,পুজোর দু’চারটে ফুল বলে আমি কিছু বলি না,কিন্তু কখনো বাগানের ভেতরে ঢুকে ফুল তোলার সাহস দেখাবেন না বলে দিচ্ছি!”

আশুতোষ বাবু হেসে বলেছিলেন, "সে কি,বাগানের ভিতর ঢুকব কেন!আমার যে কটা ফুল পুজোর জন্যে লাগে সে কটা তুলে বাড়ি ফিরি।"

মল্লিকবুড়োর আশির ওপর বয়েস হয়েছে। বেশ খিট খিটে। রাতদিন বাগান পাহারায় ব্যস্ত তিনি। আশুতোষের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সব বুঝি,বুঝলেন! ঝোপ বুঝে কোপ মারার লোকের অভাব নেই,বাগান আমার,পাহারা দেবো আমি,আর পাহারা মানে কি? আমার চোখের সামনে দিয়ে ফুল তুলে নিয়ে যাবে,আর আমি লাঠি ধরে চুপ করে বসে থাকব?"

"না,না,আমি তো।" আশুতোষবাবুকে থামিয়ে দেন মল্লিকবুড়ো,বলেন, "এমনটা তো সবাই বলে। এক দিন বাগানের দরজা রাতভর খুলে রেখে দিই,দেখবেন নিজের অজান্তে আপনি সুরসুর করে বাগানে ঢুকে গেছেন! আমার আশির ওপরে বয়স হলো। চুলদাড়ি এমনি এমনি সাদা হয়নি , বুঝেছেন?"

আর কথা বাড়ান নি আশুতোষ। কথায় কথা বাড়ে তিনি জানেন, অতি কথা বলা খিটখিটে বুড়োর সঙ্গে কথা বলার কোনো মানে হয় না। মনে মনে ঠিক করলেন,না,আর এ বাগান থেকে তিনি ফুল নেবেন না ।

কিন্তু অশুতোষবাবুর তো ফুল তোলা কাজ,পুজোর ফুল সংগ্রহ করতে হয় তাকে,তাঁর স্ত্রী অবলাকে খুশি করতে হয়,অবলা রকমারি ফুল ভরা সাজি নিয়ে পূজা করতে বসেন,পাশে আশুতোষবাবুও বসেন। নিজের আনা ফুলগুলির দিকে তাকিয়ে খুব ভালো লাগে তাঁর। ঠাকুরের আসন ফুলে ফুলে সেজে যায়,নানা রঙের রকমারি ফুলের মাঝে দেবদেবীরা সেজে বসে থাকেন! আর স্ত্রী অবলা সময় নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে পুজোর আয়োজন করতে থাকেন।

দেখে আশুতোষবাবুর খুব ভালো লাগে। প্রতিদিনের এই পুজোতে কমসে কম একটি ঘন্টা কেটে যায় স্বামী স্ত্রীর।

২

এইবারে পমপম বাবা মার সঙ্গে গ্রীষ্মের ছুটিতে পায়রাডাঙা এলো যখন, তখন সে দাদু দিদাকে তাক লাগাবার জন্যে ম্যাজিক শিখে এসেছে। আশুতোষবাবু মর্নিংওয়াক থেকে ঘরে এসে দেখলেন, তাঁর পমপমাপম এসে হাজির। নাতিকে দেখামাত্র ডেকে উঠলেন, "পমপমাপম ,কেমন আছিস?"

নাতি কম যাবে কেন? বলে ওঠে, "ডুগডুগি দাদু, ভালো আছি। তোমার ডুগডুগি বাজছে কেমন বলো?"

এরপর কুশল মঙ্গল বিনিময় হলো, জামাই মেয়ের সঙ্গে দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর আশুতোষ সবার সঙ্গে গল্প গুজবে বসলেন। পমপম বলল, "জানো দাদু,এবার পি সি সরকারের যাদু দেখলাম। বাপরে একটা মেয়েকে টুকরো করে ফের জুড়ে দিলো! হাতিকে ভ্যানিশ করে দিলো, ভূতেরা নাচলো, আরও কত কি!"

"তোকে যে ভ্যানিশ করে দেয়নি এটাই তো বাঁচোয়া!"

পমপম বলল, "আমিও একটা দুটো ম্যাজিক শিখেছি,জানো তো!"

দিদুন পমপমের মাথায় হাত দিয়ে বলল, "বাবাঃ,আমার নাতি অনেক বড় হয়ে গেছে! একদিন দেখব তোর জাদু।"

এবার পমপমকে থামিয়ে দিয়ে বড়দের কথাবার্তা শুরু হলো। কথায় কথায় অবলা মেয়েকে বললেন, "দেখ তোর বাবা আজকাল কত ফুল নিয়ে আসে। ঠাকুরকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে পুজো দিতে কত ভালো লাগে বল!"

মেয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করল, "এত ফুল তুমি পাও কোথা থেকে বাবা!" আশুতোষবাবু সংক্ষেপে তার জবাব দিলেন। সেনদের বাগান,বোসদের বাগান,শেষে মল্লিকদের বাগানের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিলেন। পমপম দাদুর কথা ভালো করে শুনলো,তারপর বলে উঠলো, "ও ডুগডুগি,তার মানে তুমি সকালে ফুল চুরি করতে যাও?"

পমপমের বাবা পমপমকে ধমক দিলেন, "পমপম বড়দের কি যা তা বলছ!" বাবার ধমক গায়ে মাখে না পমপম,দিদুনকে সাক্ষি রেখে বলে ওঠে, "আচ্ছা দিদুন তুমি বলো তো আমি কি মিথ্যা কথা বলছি? এই যে দাদু কাউকে না বলে বাগানে ঢুকে ফুল নিয়ে আসে, তাকে কি চুরি বলে না?"

পমপমের কথার ধরণে সবাই হেসে উঠলো। আশুতোষ বাবু বলে উঠলেন, "পুজোর দুটো ফুল নেওয়া কি কখনো চুরি হয়? তাও তো আমি বাগানের বাইরে থেকে নাগালের মধ্যে যে কটা ফুল পাই তাই নিয়ে আসি।"

পমপম কিন্তু নাছোড়। বলে, "বা রে! যে কোনো জিনিস তুমি যদি না বলে নাও,তবে চুরি করা হলো! বলো, ঠিক কিনা দিদুন?"

আশুতোষবাবু বললেন, "ফুল আবার চুরি হয় নাকি! না বলে তুললে কি চোর হয়? ভেবে দেখ পমপমাপম--ফুল চোর চোর নয়!"

পমপম কম যায় না,আশুতোকে তাঁর মত সুর টেনেই বলে ওঠে,যতই বলো,দাদু ডুগডুগি,ফুল চোর চোর হয়!"

এমনি ভাবে দাদু নাতির ঝগড়া চলতেই থাকে। সেদিনও রোজের মত দাদুর আনা ফুলে, দিদুন ভোরবেলা পুজোতে বসেছেন। পাশে বসে আশুতোষবাবু । এটা ওটা স্ত্রীর হাতের কাছে এগিয়ে দেওয়া তাঁর কাজ। পুজোর সব তৈরি করে দিয়ে আশুতোষবাবু ঠাকুর প্রণাম করে ঘরের দরজার বাইরে পা দিয়েছেন, ঠিক তখনই অবলা ভয় পেয়ে একেবারে হই চই করে দৌড়ে এসে বলেন, "ওরে বাবা গো, এ কী হলো গো! তোমার আনা ফুল নড়ছে যে! আমি স্পষ্ট দেখলাম,একটা জবা ফুল আর একটা স্থলপদ্ম ফুল ধীরে ধীরে ঠাকুরের আসনে উঠে গেলো! টানতে টানতে আশুতোষকে নিয়ে গেলেন অবলা,দূর থেকে ঠাকুরের আসন দেখিয়ে বললেন, "ওই দেখো তোমার জবা ফুল,আর ওই দেখো তোমার স্থলপদ্ম।"

হইচই শুনে ততক্ষণে মেয়েজামাই "কী হলো, কী হলো" বলে বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছে।

আশুতোষ থামালেন অবলাকে। ঘটনাটা কী হতে পারে ভেবে নিলেন তিনি, আর তক্ষুণি, পমপমের অনুপস্থিতি অনুভব করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "রাণু মা, পমপম উঠে গেছে কি?"

মেয়ে রাণু বলল, "ও আজ অনেক আগে উঠে গেছে বাবা!"

"ও কোথায়?"

"হবে কোথাও,আশেপাশে!" রাণু বলল।

আশুতোষ বাবু তাড়াতাড়ি ঠাকুরঘরের জানালার কাছে গেলেন। সেখান থেকে স্পষ্ট দেখতে পেলেন পমপমকে। পমপম ওখান থেকে দাদুকে দেখে পালালো। আশুতোষবাবু ব্যাপারটা ধরে ফেলেছেন ততক্ষণে। বুঝেছেন,এ পমপমের কাজ। ফুলদুটো দেখার জন্য ঠাকুরের আসনের কাছে যেতেই অবলা চিৎকার করে উঠলেন, "ওগো,যেও না,যেও না ওদিকে!"

কে কার কথা শোনে! কাছে গিয়ে ভুতুরে ফুলদুটো হাতে তুললেন তিনি। মনের সন্দেহ সত্যি হয়ে গেলো। দেখলেন, দুটো ফুলই বাঁধা রয়েছে মেয়েদের লম্বা লম্বা চুল দিয়ে,একটার পর একটা চুলে গিঁট দিয়ে সুতোর মত লম্বা করা হয়েছে। তারপর পমপম ঠাকুর ঘরের জানলা দিয়ে আগে থেকে বেঁধে রাখা ফুল দুটো ঘরের

বাইরে থেকে ধীরে ধীরে টেনে নিয়েছে। সেই দেখত্যে দেখতে রহস্যসন্ধানী দাদু হঠাৎ দেখলেন, নাতি পমপম ঠাকুরঘরে সবার সঙ্গে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে।

পমপমের জাদুরহস্য দাদুর কাছে ধরা পড়ে গেলো। দিদিমা সব কথা শুনে ভয় থেকে পাড় পেলেন, বুদ্ধিমান নাতির পিঠ চাপড়ে বললেন, “কি ভয় না আমায় পাইয়ে ছিলি রে!”

পরদিন আশুতোষবাবুর ঘুম ভেঙে গেলো,তখনও সকাল হয়নি। চারদিকে অন্ধকার। ঘুম আর আসছিল না।বয়সের ধর্ম আর কি! বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন।ভোরের আলো ফুটতে তখন প্রায় আধ ঘন্টার মত বাকি। তিনি হেঁটে বেরিয়ে পড়লেন। রোজ যে পথে যান তার উল্টোপথ ধরলেন তিনি। শুরুতে মল্লিকদের বাগান পড়বে। মনে পড়ে গেলো খিটখিটে মল্লিকবুড়োর কথা! সে দিনের কথাগুলি মনে হতে খারাপ লাগতে লাগলো খুব। নাঃ। ওদের ফুলে তিনি হাত লাগাবেন না। মল্লিকবুড়োর বড় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। ভাবতে ভাবতেই এসে গেলো মল্লিকদের বাগান। পুব আকাশের দিক থেকে অন্ধকারের মাঝে মাঝে কেমন ছেঁড়া ছেঁড়া ম্লান আলো এসে পড়েছে !বাগানের গাছগুলির আশপাশে জমা অন্ধকার এখনো যেন দলা বেঁধে আছে! আহ,কি সুন্দর গন্ধ! স্বর্ণচাঁপার গন্ধে বাতাস ম ম করছে। সেইসঙ্গে অন্য গন্ধ। রজনীগন্ধার গন্ধ। দুটো গন্ধ দু রকম মিষ্টি। আশুতোষবাবুর কাছে তা বড় মোহময় মনে হলো। জোরে জোরে শ্বাস নিতে থাকলেন তিনি। আস্তে আস্তে বাগানের গেটের কাছে এসে দাঁড়ালেন আশুতোষ। লক্ষ্য করলেন বাগানের দরজা হাট করে খোলা! ব্যাপার কী? আজ মল্লিকবুড়ো এত অসতর্ক হলেন কী করে? খোলা গেট ধরে ফুল বাগানের দিকে তাকালেন তিনি। বাঃ,বেশ সুন্দর অনেক ফুল ফুটেছে তো স্বর্ণচাঁপা গাছে! পাশে,একটু দূরে গন্ধরাজ গাছগুলিতেও ঝাঁকে ঝাঁকে ফুল ফুটেছে। এত ফুল!--তাই বাতাস এখানকার এত সুগন্ধময় হয়ে উঠেছে! দাঁড়িয়ে দেখতে থাকলেন আশুতোষ। তাঁর চোখে পড়ল গাছের নিচের ডালেও ফুটেছে অনেক স্বর্ণচাঁপা। চাঁপা ফুলগুলি মাথা নাড়িয়ে তাঁকেই ডেকে চলেছে যেন! আজ বৃহস্পতিবার,লক্ষ্মীপুজো। মন্দ হয় না যদি অনেক ফুলের সঙ্গে দু চারটা সোনা বরণ চাঁপা ফুলও নিয়ে যাওয়া যায়! চাঁপা ফুল তোলার অদম্য এক নেশা তাঁকে তাড়না করে ফিরতে লাগলো।

আশুতোষ প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে থেকেও বাগানে কাউকে দেখতে পেলেন না। সাহসে বুক বেঁধে এইবার বাগানের ভিতরে যতটা চোখ যায় দেখে নিলেন তিনি। না,মল্লিক বুড়ো তো আশেপাশে নেই! তবে কি বুড়ো এখনো ঘুমিয়ে আছে? এইবারে ধীরপায়ে এগোলেন তিনি। দেখলেন চাঁপার দু তিনটে ফুল বেশ নিচের দিকে ঝুলছে। চারপাশ দেখে নিয়ে গাছের কাছে চলে গেলেন। এবার তাঁর হাত ধীরে ধীরে এগোতে লাগলো চাঁপা

ফুলগুলির কাছে। যখন ফুল ছুঁই ছুঁই হাত, হঠাৎ আলোছায়া অন্ধকার থেকে একটা অজানা হাত খপ করে আশুতোষের হাত চেপে ধরে ‘চোর, চোর’ বলে চিৎকার করে উঠলো। আরে এযে মল্লিক বুড়ো!চোর,চোর,চীৎকার করে চলেছেন। আশুতোষের মনে হলো,এ কী হলো,তিনি রাতে কোনো স্বপ্ন দেখছেন না তো!

চিৎকার চেঁচামেচিতে বাগান সংলগ্ন বাড়ি থেকে, কী হলো, কী হল বলে মল্লিকবুড়োর ছেলেরা বেরিয়ে এলো। মল্লিকবুড়ো তখনও চিৎকার করেই চলেছেন। ছেলেরা ছুটে এসে দেখে তাদের বাবা,আশুতোষবাবুকে ধরে আছেন।আশুতোষবাবু নিজেকে ছাড়াবার জন্যে চেষ্টা করে যাচ্ছেন তখন। মল্লিকবুড়োর বড় ছেলে, বাবাকে সরিয়ে নিয়ে হাত জোর করে বললেন, “ক্ষমা করবেন আশুতোষবাবু। বাবা আপনাকে চেনেন না।”

ছেলের কথার মাঝে মল্লিকবুড়ো বলে উঠলেন, “চিনি না আবার! চুরি করবে,আবার চোরের প্রতি সহানুভূতি!” বলে,গজ গজ করতে করতে সামনে থেকে চলে গেলেন।

মল্লিকের বড় ছেলে বললেন, “বাবার বয়েস হয়েছে,এত খিট খিটে মেজাজ হয়েছে,রাত ভর জেগে বাগান পাহারা দেন। আর নিজের মনে গজ গজ করতে থাকেন।”

আশুতোষ জিজ্ঞেস করলেন “আপনি আমাকে চেনেন?”

হ্যাঁ স্যার। আপনি নৈহাটি কলেজের প্রফেসর ছিলেন, আমার ছোট ভাই ওই কলেজে পড়ত। ছোট ভাই পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো। সে আশুতোষবাবুকে প্রণাম করল। আশুতোষ খুব লজ্জিত হয়ে বললেন, “দোষ তো আমারই ছিলো,বাগানের ভেতর ঢোকা আমার উচিত হয় নি।”

ঘরে এসে আশুতোষ দেখলেন, পমপম এত সকালে জেগে বসে আছে। বললেন, “কী ব্যাপার? তুই এত সকালে উঠে পড়েছিস যে?”

পমপম বলে উঠলো, “ফুলচোরকে দেখতে এলাম। তারপর একটু হেসে বলল, “দাদু,জানো তো,ফুলচোর,চোর হয়!”

দাদু বললেন, “না,পমপমাপম,ফুলচোর,চোর নয়!”

ছবিঃ সৌভিক

রিন্টি গুগাই ও রোমান মুদ্রা

অনন্যা দাশ

রিন্টি আর গুগাই ছুটিতে মামার বাড়ি বেড়াতে এসেছে। মামাতো দাদা টিটোর সাথে ছুটিটা জমছে ভাল। তবে সেদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই মামা ঘোষণা করলেন, “রিন্টি-গুগাই-টিটো অনেক টিভি দেখা, ভিডিও গেম খেলা হয়েছে আজকে যাও এখানকার স্থানীয় মিউজিয়ামটা দেখে এসো! তাহলে কিছু জ্ঞান হবে!”

মামা কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক তাই মিউজিয়াম টিউজিয়াম ওনার খুব প্রিয়। যদিও বলেন এখন কাজের চাপে তত আর যাওয়ার সুযোগ পান না!

মামার কথা শুনে টিটোদার তো মুখ হাঁড়ি, বলল, “আবার ওই পচা মিউজিয়ামটায় যেতে হবে? আমি ওটা দেখে দেখে বোর হয়ে গেছি!”

রিন্টি-গুগাই ভয়ে ভয়ে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল, “ওখানে কি দেখার মত কিছুই নেই? কারণ মামা যখন বলেছেন তখন যেতে তো হবেই! দেখার মত ভাল কিছু না থাকলে দিনটা মাটি হবে!”

“না, তা ঠিক নয়। একটা মমি আছে, রাজপুত রাজাদের জিনিস আছে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যর সময়কার মুদ্রা টুদ্রা আছে কিন্তু আমি এতবার গেছি যে আমার সব মুখস্ত হয়ে গেছে! যেই আসে আমাদের এখানে বেড়াতে আমি তাকে নিয়ে ওইখানে যাই!”

“ঠিক আছে তোমাকে না হয় আর যেতে হবে না। আমরা কৃষ্ণদার সাথে চলে যাচ্ছি। না গেলে মামা রাগ করবেন। তাছাড়া আমি মমিটা দেখতে চাই!” গুগাই বলল, ওর তো মমি শুনেই চোখ জ্বলজ্বল!

শেষ পর্যন্ত তাই হল। ড্রাইভার কৃষ্ণদাকে সঙ্গে করে রিন্টি-গুগাই মিউজিয়াম দেখতে গেল মামা অবশ্য তার আগে কি কি দেখা উছিত তাই নিয়ে ওদের ছোট খাটো একটা লেকচার দিয়ে দিলেন।

মিউজিয়ামটা ছোট হলে কি হবে বেশ ভালো ভ়ালো দেখার জিনিস আছে। গুগাই তো মমি দেখতে পেয়ে আর কিছুতেই অন্য ঘরে যাবে না! রিন্টির মমি তত পছন্দ নয়। তাই সে গুগাইকে, “তোর কি মনে হয় হাঁ করে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকলে ওটা জ্যান্ত হয়ে যাবে?” বলে পাশের ঘরে চলে গেল।

পাশের ঘরে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যর সময়কার অনেক কিছু রয়েছে। মুদ্রা গুলো দেখতে গিয়ে হঠাৎ চমকে উঠল রিন্টি। চট করে পাশের ঘরে গিয়ে গুগাইকে ডেকে নিয়ে এল।

“এই এটা দেখ!” বলে আলেকজ্যান্ডারের জেনেরাল সেলুকাসের সৈন্যদের আনা একটা মুদ্রার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল। মুদ্রাটার পাশের ফলকে বিবরণীতে ওটার সম্পর্কে লেখা রয়েছে, ওটা নাকি রোমান মুদ্রা।

গুগাই তাকিয়ে দেখল। কালচে পড়ে যাওয়া ধাতু (খুব সম্ভবত রুপোর) মুদ্রা। তাতে একজন রোমান সৈনিকের মুখ খোদাই করা। গুগাইয়ের মোটেই আহামরি কিছু মনে হল না। সে বলল, “ধ্যাৎ একেবারে বাজে!”

রিন্টি চোখ পাকিয়ে বলল, “কয়েনটার গায়ে লেখা সালটা দেখেছিস?”

গুগাই আবার তাকিয়ে দেখল মুদ্রাটার গায়ে খুদি খুদি অক্ষরে কি যেন লেখা রয়েছে। মুখটাকে কাঁচের কাছে নিয়ে গিয়ে লেখাটা পড়ে দেখল সে। অন্য আরো কিছু লেখার সাথে রোমান অক্ষরে সালটা লেখা রয়েছে, CCCVII B.C., অর্থাৎ ৩০৭ বিসি।

গুগাই এবার রেগে গিয়ে বলল, “তুই ইতিহাস ভুলে গেছিস! সময়টা তো ঠিকই আছে! ৩০৫ বিসি নাগাদ সেলুকাসের সাথে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যর যুদ্ধ হয়েছিল! তখনকার রোমান মুদ্রা, আলেকজ্যান্ডারের সৈন্যদের সাথে কোন ভাবেএসেছিল এগুলো, মামা সকালেই তো বললেন!”

রিন্টি হতবুদ্ধি হয়ে গুগাইয়ের দিকে চেয়ে বলল, “তুই কি হাঁদারাম রে!”

পরক্ষণেই কৃষ্ণদাকে বলল, “এক্ষুনি চলো, মামার কলেজে যেতে হবে, এখানে ভয়ঙ্কর গোলমাল!”

তোমরা বলতে পারবে কী গোলমাল?

<u>উত্তর</u>

মামা রিন্টির সব কথা শুনে বললেন, “কি সাংঘাতিক! তার মানে কেউ মিথ্যা কথা বলে ওই নকল মুদ্রাটা মিউজিয়ামকে বিক্রি করেছে! কারণ বি সি মানে তো খ্রিষ্ট পূর্ব, সেটা তো আমরা এখন বলি, যিশু খ্রিষ্টের জন্মের আগে তো আর কেউ জানত না যে তিনি এত বছর বাদে জন্ম নেবেন তাই সেটা লেখা সম্ভব নয়! আমি তো অনেকদিন ওখানে যাইনি তাই আমার চোখে পড়েনি। ঠিক আছে তোমরা বাড়ি যাও, আমি পুলিশকে ফোন করি। এটা নির্ঘাৎ কিউরেটার মণিকান্ত ওঝার কাজ। ওই এই সব নকল জিনিস কিনে বসে আছে! লোকটাকে আমার প্রথম দেখা থেকেই অপছন্দ! ভাবখানা এমন করছিল যেন কত জ্ঞান অথচ কিছুই জানে না! রিন্টি ভাগ্যিস দেখল! না হলে মিউজিয়ামের সুনাম সব নষ্ট হয়ে যেত!”

ছবিঃ অনুপম

শ্রেয়া ও তিন ভূত

অনুরাধা গুপ্ত

মফস্বল শহরের পাশে গ্রামের এক প্রান্তে একটা বড় খেলার মাঠ। মাঠের ঈশাণ কোণে একটা বাজপড়া পোড়া শেওড়া গাছ, তার পাশে একটা জলা। জলার ধারে তিনটে তালগাছ। এই মাঠে বিকালে ছেলেরা খেলতে আসে ঠিকই কিন্তু সন্ধে হতে না হতেই ভূতের ভয়ে যে যার বাড়ি ফিরে যায়। তাতে বাড়ির সব বড়রা খুব খুশি। অবশ্য এই মাঠটার অনেকদিন ধরে ভূতের জন্য

বদনাম আছে, এখন যারা খেলতে আসে তাদের দাদু বা বাবা-মাদের ছোটবেলায়ও এই মাঠের নাম ভূতুড়ে মাঠই ছিল।

একদিন গরমের সময় জলার মধ্যে থেকে জুবজুবে ভেজা এক ভূত উঠে এসে পোড়া শেওড়া গাছে উঠল। অন্য ডাল থেকে একজন বয়স্ক ভূত বলে উঠলেন, 'একা এসেছ, এসো। তবে ইয়ার দোস্ত জুটিয়ো না, তবে কিন্তু স্থান হবে না। আমি সকাল সন্ধে একটু রামনাম করি।' একটু পরে জলার পাশে কান্নার রোল উঠল। দত্তপাড়ার সবচেয়ে দস্যি ছেলেটি জলে নেমেছিল সাঁতার কাটতে, কিন্তু পায়ে জলের নিচের লতা জড়িয়ে ডুবে মারা যায়। নিজের বাড়ির সবাইকে কাঁদতে দেখে ভেজা ভূত কাঁদতে লাগল। তাতে বয়স্ক ভূত দিলেন এক দাবড়ানি, 'দেখো একবার। লজ্জা করে না? ভূত হয়েছিস আবার চোখে জল কেন?'

এমন সময় ছোট মতন একজন ছেলে এসে জানতে চায়, 'তোমরা ভূত?'

'হ্যাঁ।'

'ওরে বাবারে।'

ওর কাণ্ড দেখে আগের দুজন হেসে ফেলে, 'এই ভিতু নিজে ভূত হয়ে ভূতের নামে ভয় পাও, কেমন ভূত তুমি?'

'বারে, মানুষেরা যে মানুষের নামে ভয় পায়, তার বেলায়? আর ভয় পাবার জন্যেই তো সব গণ্ডগোল হয়ে গেল। তাল গাছে চড়েছিলাম তালশাঁসের জন্যে কচি তাল কাটতে। কোথা থেকে একটা পোকা এসে আমার পিঠে উঠতে লাগল, হঠাৎ আমিও ভয় পেয়ে পা পিছলে একেবারে পপাত চ, মমার চ।'

'চুপ ভিতু কোথাকার, ব্যাটা আবার সুকুমার রায় কোট করছে।'

'এই যাঃ, বুঝে গেলে। যাই হোক পতন ও তোমাদের এই শেওড়া গাছে আসা, দয়া করে আমাকে থাকতে দাও। আমি কিন্তু তোমাদের সঙ্গে থাকব, একা থাকতে মার বড্ড ভয় করে।' হঠাৎ এতক্ষণে ভেজা ভূতের খেয়াল হল, 'তাইতো আগের কথাগুলো কে বলল, আমি তো সুকুমার রায় পড়ি নি।'

দেখে এরমধ্যে একজন ল্যাগব্যাগে ভূত এসে হাজির, তাও সশরীরে।

আগের তিন ভূত একসঙ্গে বলে ওঠে, 'ওরে হতভাগা অদৃশ্য হ, অদৃশ্য হ। মানুষগুলোর দৃষ্টিগোচর হলে আর দেখতে হবে না। ওঝা আনিয়ে ঝাড়ফুঁক করাবে, শুনেছি ওঝারা খুব ঝাঁটাপেটা করে।'

ভুলো ভূতের গল্প হল ওর পড়ার দিকে খুব ঝোঁক, কিন্তু সব ভুলে যায়। একদিন লেখাপড়া করে শুতে যাবার সময় প্রদীপ নেভাতে ভুলে যায়, রাতে ঘুমের মধ্যে পায়ে লেগে পিলসুজ উলটে প্রদীপ থেকে বিছানাপত্রে আগুন লাগে, সাতদিন যমে মানুষে টানাটানির পর এখানে আসা।

প্রথমে 'না' বললেও বয়স্ক ভূত পরে ওদের তিনজনকে থাকতে দিলেন তবে কথা নিয়ে নিয়েছেন যে ওঁর রামনামের সময় কেউ কোন কথা বলবে না।

নতুন তিন ভূতই মানুষ অবস্থায় খুব দুষ্টু ছিল। ওরা ঠিক করল ভূত জীবন খুব ভালো হয়ে কাটাবে, সবার সাহায্য করবে কিন্তু তার ফল হিতে বিপরীত হল। যেমন খেলার সময় কখনো কখনো বল জলে পড়ে যায়, আগে হয়তো ভেজাভূতই ফেলে দিত, কিন্তু এখন জলে বল পড়লেই ওরা মাঠে তুলে দেয় তাতে ছেলেরা 'ভূত ভূত' বলে ভয় পেয়ে যায়। সকালে উঠে ওরা তিন ভূত কাছাকাছি সব বাড়ির সামনেটা ঝাড়পোঁছ করে চকচকে তকতকে করে রাখে। মাঝে মাঝে ভুলোভূত বাড়ির সামনে পড়ে থাকা খবরের কাগজ পড়তে বসে যায় তাও নিজ রূপে। প্রতিবেশীদের 'ভূত ভূত' চেঁচামেচিতে ভুলোভূতের জ্ঞান ফেরে। দু একজন অবশ্য বুঝেও না বোঝার ভান করেন, তাঁরা ভাবেন কাজগুলো তো হয়ে যাচ্ছে।

এক বাড়িতে ঠাকুমা শুধু নাতনীকে নিয়ে থাকতেন। মেয়েটির নাম শ্রেয়া। যেমন ভালো মেয়ে তেমন সাহস। শ্রেয়া বুঝতে পারে কে যেন ওর বাড়ির কাজগুলো করে দেয়, তাই ও অনেকটা সময় লেখাপড়া করতে পারে। একদিন হয়েছে কি, দুপুরবেলায় শ্রেয়া একা একা চালতা মাখতে বসেছে। চালতা মাখার অনেক হ্যাপা। চালতার ওপর থেকে পেঁয়াজের মত স্তরগুলো খুলে, ওগুলো ছোট ছোট করে কেটে, শিলের ওপর রেখে নোড়া দিয়ে ছেঁচে তাতে কাঁচা লঙ্কা বেটে দিয়ে নুন, চিনি, সরষের তেল দিয়ে মেখে রাখতে হয়। শ্রেয়া যেই চালতা মেখে রেখেছে ও দেখে, ওর চোখের সামনে থেকে চালতা মাখা ক্রমশ কমছে আর মনে হয় পাশে একাধিক মানুষ খাচ্ছে আর চটাস চটাস জিবের আওয়াজ করছে। শ্রেয়ার খুব রাগ হল চালতা শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখে। হঠাৎ খুব জোরে বলে ওঠে, 'তোমরা যেই হও, আমার জন্যে একটু রেখো, সবটা খেয়ে নিচ্ছো কেন? বেশ অসভ্য তো তোমরা।'

শ্রেয়ার বকুনিতে ভিতুভূত আর ভুলোভূত ভয় পেয়ে প্রকাশ্যে এসে পড়ায় বাধ্য হয়ে ভেজাভূতকেও নিজের মূর্তিতে সামনে আসতে হল। তিন তিনটে ভূতকে চোখের সামনে দেখে ভয় পেলেও শ্রেয়া বুঝতে দিল না যে ও ভয় পেয়েছে।

ভূতেরা বলল, 'তুমি তো ইচ্ছে করলেই চালতা মেখে খেতে পারো। আমরা যে তোমার ঘরের এতো কাজ করে দি, তখন?'

শ্রেয়া বলে, 'মেখে নিতে পারি ঠিকই কিন্তু চালতা কোথায় পাবো?'

'ও এই কথা। আমরা আছি কি করতে?' বলেই তিনজনে তিনটে চালতা নিয়ে উপস্থিত।

সেই থেকে ওদের তিনজনের সঙ্গে শ্রেয়ার ভাব হয়ে গেল। শুধু বাড়ির কাজ নয় মাঝে মাঝেই কলাটা-মূলোটা, নারকেল-তাল, আম-কাঁঠাল, শসা-তরমুজ সময়ে চালতা-কতবেলও আসে। ঠাকুমা ভালোবাসেন বলে গন্ধরাজ লেবু আনতে ভোলে না তিন ভূতে। ঠাকুমা মাঝেমাঝেই দেখেন ঘরের মধ্যে কারা যেন ছায়া ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ বা নাতনির বইপত্তর নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে।

আসলে ভুলোভূত বই দেখলেই পড়তে বসে যায়, আবার নোট বানিয়ে দেয়, প্রশ্ন উত্তর লিখে দেয়।

ঠাকুমা বলেন, 'অ বুড়ি, ঘরে কারা ঘুরছে র‍্যা?'

'আমার বন্ধুরা ঠামা।'

'অ, চোকে তো ভালো ঠাওর হয় না তাই ভাবলাম বুঝি ভূত।'

শুনে তিন ভূত জিভ কেটে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়।

জ্যান্ত মানুষ ও ভূতেদের ভাবসাব কিন্তু বয়স্ক ভূতের চোখে ভালো ঠেকে না। 'যত সব অনাসৃষ্টি ব্যাপার স্যাপার সহ্য হয় না,' বলে শেওড়া গাছ ছেড়ে অন্য গাছ খুঁজতে চলে গেলেন তিনি।

ঠাকুমা সহ শ্রেয়া ও তিন ভূত শান্তিতে থাকতে লাগল। তিন ভূতেদের দয়ায় শ্রেয়াদের বাড়িতে সরস্বতী পুজোতে কখনো ফুল বা প্রসাদ কম পড়ে না বিশেষ করে নারকেলি কুল। অবশ্য একটা ঝামেলা হয়। শ্রেয়াদের বাড়িতে ভালো কিছু রান্না হলে অনেক সময়ই ওকে দুবার রান্না করতে হয় কারণ দুষ্টু ভূতরা ভালো হয়ে গেলেও এতো পেটুক যে বোঝে না কতটা খেতে হবে, ফলে সব খাবার শেষ হয়ে যায়।

ছবিঃ অনুপম

স্বপ্ন

অমিতাভ প্রামাণিক

কল্যাণী ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় আমরা যারা হোস্টেলে থাকতাম, শহরের বাইরে থেকে হোস্টেলে আসতে গেলে প্রায়-ই কল্যাণী স্টেশন থেকে ২৯ নম্বর বাস ধরতাম। আমাদের স্টপেজ এলে কন্ডাক্টর হাঁকতো, 'চাঁদামারি, ইউনিভার্সিটি'! হোস্টেলের পিছনে ছিল চাঁদামারি গ্রাম, ওই গ্রামের লোকেদের-ও ওটাই স্টপেজ, কিন্তু যারা ওটা জানতো না, ভাবতেই পারতো যে চাঁদামারি ইউনিভার্সিটি বলে একটা ইন্সটিটিউট আছে!

চাঁদামারি গ্রাম এমন কিছু আহামরি গ্রাম নয়, একেবারেই সাদামাটা, একেবারেই বিভূতিভূষণ-এর পথের পাঁচালীর বর্ণনার সঙ্গে মেলে না। ওখানকার বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা আমাদের হোস্টেলে কচি শশা, পেয়ারা এইসব বিক্রি করতে আসতো গরমের সময়। সাধারণত ওই সময়টা থাকত আমাদের স্টাডি লিভ, পরীক্ষার আগের দিনগুলো। আমাদের পিজি-টু হোস্টেলের লম্বা করিডর দিয়ে এলোমেলো হাওয়া ঘরে ঢুকে কাগজপত্র তছনছ করে দিয়ে বেরিয়ে যেত জানলা দিয়ে

চাঁদামারির দিকে। আমার রুমের বাইরে রাখা ছিল একটা হসপিট্যাল-মার্কা খাট, সেখানে গুলতানি চলত আমাদের। দুপুরে খাওয়ার পর ওখানে বসলেই ঘুমে চোখ জুড়িয়ে আসতো, বিশেষতঃ বই নিয়ে বসলেই। সেই সময় আবির্ভূত হতো মূর্তিমান কেষ্টাদের মত চাঁদামারির পেয়ারাওয়ালা বা শশাওয়ালা ছোকরারা।

আমার বন্ধু স্বপন পরীক্ষার আগে হোস্টেলে আমার কাছে চলে আসতো। দুপুরবেলা একসঙ্গে পড়াশুনার একটা প্ল্যান করা থাকতো। কিন্তু পেয়ারাওয়ালা এলে আমাদের পড়াশুনা লাটে উঠতো। আমাদের কেউ জিজ্ঞেস করতাম, 'কি রে, কত করে?'

'এক একটা চারানা।'

'চারানা? বলিস কী রে? তুই তো দিন দুপুরে মানুষ খুন করতে পারিস দেখছি দেখছি! কত নিবি ঠিক করে বল!'

'ঠিক আছে, কুড়ি নয়া করে দ্যান।'

‘যদি তোর ঝুড়ি ধরে নি-ই’, ইকনমি অফ স্কেল-এ হাই প্রফিট-এর কথা ভেবে আমার প্রস্তাব।

‘সবগুলো লিবেন?’ এতক্ষণে বেশ উৎসাহী দেখায় ছোকরাকে। গরমে রোদের মধ্যে অলি গলি ঘুরতে কারই বা ভালো লাগে? ঝুড়ির বাকি পেয়ারাগুলোর এক মুহুর্তে আদমসুমারি করে ঘোষণা করে, ‘পাঁসট্যাকা দ্যান।’

‘সাড়ে চার টাকার বেশি এক পয়সা পাবি না।’

মিনমিন করে মেনে নেয় বেচারা। পয়সা নিয়ে ঝুড়ি তুলে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয় সে।

‘এই শোন, এদিকে দ্যাখ’, আমার ঘরের জানালার ভেতরের দিকটা দেখিয়ে দিয়ে ওকে বলি, ‘ফের যখন আসবি, এই ঘরের জানালা দিয়ে পেয়ারা রেখে যাবি। জানালার কাছে এইখানে একটা বাটিতে খুচরো পয়সা রাখা থাকবে, তোর দাম নিয়ে নিবি, বুঝলি?’

‘হ্যাঁ।’

‘কী বুঝলি?’

‘পরের বার আসলে আপনার ঘরে পিয়ারা দিয়ে যাবো।’

‘আর দাম?’

‘দাম ঠিক লিয়ে লিবো। আপনে কি আর আমারে ঠকাবেন?’

‘হুঁ, চালু মাল দেকচি। পড়াশুনা করিস?’

‘হ্যাঁ।’

‘কোতায়? কোন স্কুল, কোন ক্লাস?’

চাঁদামারি না মাঝেরচর কোথাকার এক অখাদ্য স্কুলের নাম বলল সে। সেখানে ক্লাস টনে পড়ে ও।

‘টেনে পড়িস? আজ স্কুল নেই?’

‘ছিলো। কাকা বললে পিয়ারাগুলো বেচে আয়, তাই আর ইস্কুলে যাওয়া হল না।’

একটা পরিচিত গল্পের গন্ধ এল নাকে। জানা গেল, ওর বাবা নেই, কাকা গার্জেন। স্কুলের খাতায় নাম আছে, কিন্তু সেখানে যাওয়া আসা অনিয়মিত। পয়সা রোজগার হওয়ার মত কোন কাজ থাকলে ওকে সেখানেই যেতে হয়। ওর কাকা লোকটা খারাপ নয়, কিন্তু ওরা চার ভাইবোন, ও সবার বড়, তাছাড়া কাকারও ছেলেমেয়ে আছে, এমনি এমনি তো আর এতজনের খাওয়া জুটবে না!

‘তোর যে আগামি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা, পাস করতে পারবি?’

‘কি জানি’, খুব আশান্বিত দেখালো না তাকে।

‘তুই যে রোজ ক্লাসে যাস না, পড়া বুঝতে পারিস যেদিন যাস?’

‘সব কি আর পারি? ইংরাজিটাতো একদম পারি না।’

‘আর অঙ্ক? অঙ্ক পারিস?’

‘অঙ্ক একটু একটু পারি। লাভ-ক্ষতি, সুদকষা, এসব পারি।’

বুঝলাম শশা-পেয়ারা বেচতে যাওয়ার একটা প্র্যাক্টিক্যাল সুবিধা আছে। অঙ্ক বোঝার উদ্যমে নয়, নিছক সার্ভাইভ্যালের তাগিদেই বাজারি অঙ্কে পারদর্শী হতে হয়েছে ওকে।

ওর পেয়ারাগুলো বেশ ভালো ছিল। ছিবড়েসমেত সব খেতে বললাম, ‘তোর পড়াশুনা করতে ইচ্ছে হয়?’

লাজুক মুখে উত্তর দিলো সে, ‘ইস্যে তো হয়, কিন্তু কী করবো? রোজ ইস্কুলে যাওয়া হয় না, দেকিয়ে দেওয়ারও কেউ নেই।’

‘ভোর ভোর আমাদের এখানে চলে আসতে পারবি? আমি দেখিয়ে দেবো’, আমার প্রস্তাব।

খুব উৎসাহী দেখালো না ছোকরাকে। ভাবলো ঠাট্টা করছি বুঝি। আমি আবার বললাম, ‘সূর্য্ ওঠার আগে চলে আসবি এখানে, আমাকে ডাকবি। তাহলে আমারও সকাল সকাল ওঠা হয়ে যাবে।’

‘আপনারে কত করে দিতে হবে? আমাদের তো টাকা বেশি নেই।’

‘তোকে টাকার কথা ভাবতে হবে না। ভালো করে পড়াশুনা করবি। পরীক্ষা পাশ করলে দেখা যাবে। বুঝলি?’

কী বুঝলো কে জানে, ঝুড়ি নিয়ে সেদিনের মত ফিরে গেল চাঁদামারির কিশোর।

তারপর আর তার পাত্তা নেই। ভুলেই যাচ্ছিলাম প্রায় তার কথা। হঠাৎ একদিন,বোধ হয় মাসখানেক পর, আবার উদয় সেই ছেলের, এবারও পেয়ারার ঝুড়ি নিয়ে।

‘কী রে উল্লুক, পেয়ারা রেখে গেলি না তো আর? পড়তে আসবি বললি, তাও এলি নে, ব্যাপার কি তোর? সারা জীবন পেয়ারা বেচাই ঠিক করলি তা হলে?’

‘আসছিলাম তো। আপনারে কত করে ডাকলাম, আপনি তো ঘুম থেকে ওঠলেন-ই না।’

‘হারামজাদা, মিথ্যে কথা বলছিস! কবে এসেছিলি তুই?’

‘পরের দিন-ই তো আসছিলাম। আপনারে 'ছার ছার' বলে ডাকলাম। আপনি নড়লেন, তবু ওঠলেন না। আমি ভাবলাম--’

চোখ দেখে বুঝলাম মিথ্যে বলছে না। এসেছিলো নির্ঘাৎ। আমি অলস মানুষ, সকালের ঘুমে বালকের মৃদু 'ছার ছার' কোনো ঢেউ তোলেনি নিশ্চয়।

বললাম, ‘শোন, ঐ রকম মিউ মিউ করে ডাকলে আমার ঘুম ভাঙবে না। আমি জানালার পাশে একটা লাঠি রেখে দিচ্ছি, ওটা দিয়ে আমাকে খোঁচাবি। তবে আমার ঘুম ভাঙবে। বুঝলি?’

পরের দিন ভোরবেলা এসেছিল সে। দু' একবার 'ছার ছার' বলে ডেকেছিল। আমি যথারীতি উঠিনি। তারপর সাহস করে সেই লাঠি দিয়ে একটু খুঁচিয়েছিল। আমি ঘুম চোখে গরম

গরম গালাগালি দিয়েছিলাম বাপ মা তুলে। তারপর উঠেও পড়েছিলাম। অনেকদিন পর ক্লাস টেন-এর ইংরাজি বইয়ের চেহারা দেখলাম।

এর পর বেশ কিছুদিন ঐ রকম-ই চলল। রোজ আসতো না ছোকরা, কিন্তু যেদিন আসতো, সেদিন সকাল-সকাল উঠতে হত আমাকে। আমারও একটু কেমিষ্ট্রি পড়া হয়ে যেত সেই সুবাদে। এরকম কতদিন চলেছিল এখন আর মনে নেই। আমার পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর ওকে আসতে বারণ করে দিয়েছিলাম। শেষ হওয়ার পরও ওকে বেশ কিছুদিন দেখিনি। তার বহুদিন পর উদয় হল আবার, বোধহয় টেস্ট পরীক্ষার পর। ঐ সব স্কুলে টেস্টে সবাই ক্লিয়ার হয়ে যায়, সেও গেছে। ইংরাজিতে যথারীতি ফেল।

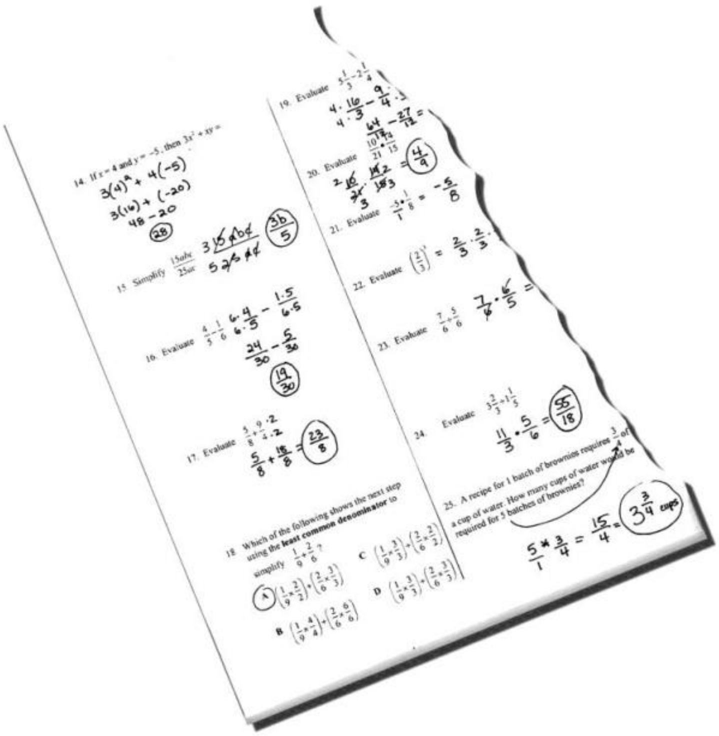

করুণ চোখের লাজুক বালক আবার পড়তে আসতে লাগল ভোরবেলা। আগের মতোই, রোজ নয়, মাঝে মাঝে। অ্যালজেব্রা শিখতে বেশি উৎসাহ ছিল ইংরাজির চেয়ে। ভোরবেলা আসার সময়ও কোন কোনদিন সঙ্গে নিয়ে আসতো গাছের কুল, পয়সা নিতে চাইতো না, খুচরোর বাটি থেকে ওকে নিতে বাধ্য করতে হত।

এম এস সি-র স্পেশ্যালাইজেশনের সময় আমি নিয়েছিলাম ইনর্গানিক, স্বপন ফিজিক্যাল। পার্ট টু-র সময় তাই ও আর হোস্টেলে আমার কাছে আসেনি। তার বদলে বেনিয়ান হোস্টেলের সোমনাথ, সেও ইনর্গানিক স্পেশ্যাল নিয়েছিল, বেশিক্ষণ থাকত আমার সঙ্গে। ইউনিভার্সিটির লাস্ট ইয়ার, এটা পার করতে পারলেই যাবতীয় পড়াশুনা শেষ, এই আনন্দেই কাটছিল দিনগুলো।

সেই লাস্ট ইয়ারের স্টাডি লিভের দুপুর। আমার ঘরের সামনের হসপিট্যাল-মার্কা খাটে বসে ঝিমুচ্ছি, এমন সময় আবার উদয় সেই বালকের। এবার আর তার হাতে পেয়ারার ঝুড়ি নেই।

‘কী রে হনুমান, পরীক্ষা কেমন দিলি? আমাকে তো একবার জানাতেও এলি না, ব্যাটা অকৃতজ্ঞ!’

আমার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে আমার সামনে সে এগিয়ে ধরলো একটা কাগজ, মাধ্যমিকের মার্কশিট। পরীক্ষায় পাশ করেছে তো বটেই, ইংরাজিতে পেয়েছে পুরোপুরি চল্লিশ!

পকেট থেকে বের করলো সে সযত্নে ভাঁজ করা দশ টাকার পাঁচটা নোট। 'এটা ধরেন, কাকা আপনারে দিতে বলেসে।'

****

আমাদের পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি হোস্টেল ছেড়ে চলে যাই পিকনিক গার্ডেনের কাছে একটা মেসে। কলকাতায় পি এইচ ডি-তে জয়েন করতে আসার আগে সেখানে ছিলাম মাস দুয়েক। তারপর কলকাতা-বম্বে হয়ে এখন ব্যাঙ্গালোর।

সেই ঘটনার পর প্রায় বাইশ বছর কেটে গেছে। ভারতের অর্থনীতিতে পরিবর্তন এসেছে অনেক। বড় বড় বিদেশ কোম্পানি ইন্ডিয়াতে অফিস খুলে রমরমা বিজনেস করছে। বিদেশি ইনভেস্টররা লাইন দিয়ে কিনছে দেশি কোম্পানির শেয়ার। রাস্তা ভর্তি গাড়ি, ছোট-বড়, দেশি-বিদেশি। কাচে ঢাকা বিশাল বিশাল বিল্ডিং-এ ভরে গেছে রাজপথের দুপাশ। এখানকার অটোওয়ালা পানওয়ালারাও মোবাইল ফোন বার করে কথায় কথায়।

চাঁদামারি গ্রামের কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। সেই বালকের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। তার মলিন চোখে 'ক্ষান্তবর্ষণ কাক-ডাকা বিকেলের লাজুক রোদ্দুর'-এর স্বপ্ন দেখেছিলাম। সে স্বপ্ন পূরণ হয়েছে কিনা জানা হবে না কোনদিন।

ছবিঃ সৌভিক

ভ্রমণ

পাহাড়ি গ্রামের গপ্পো

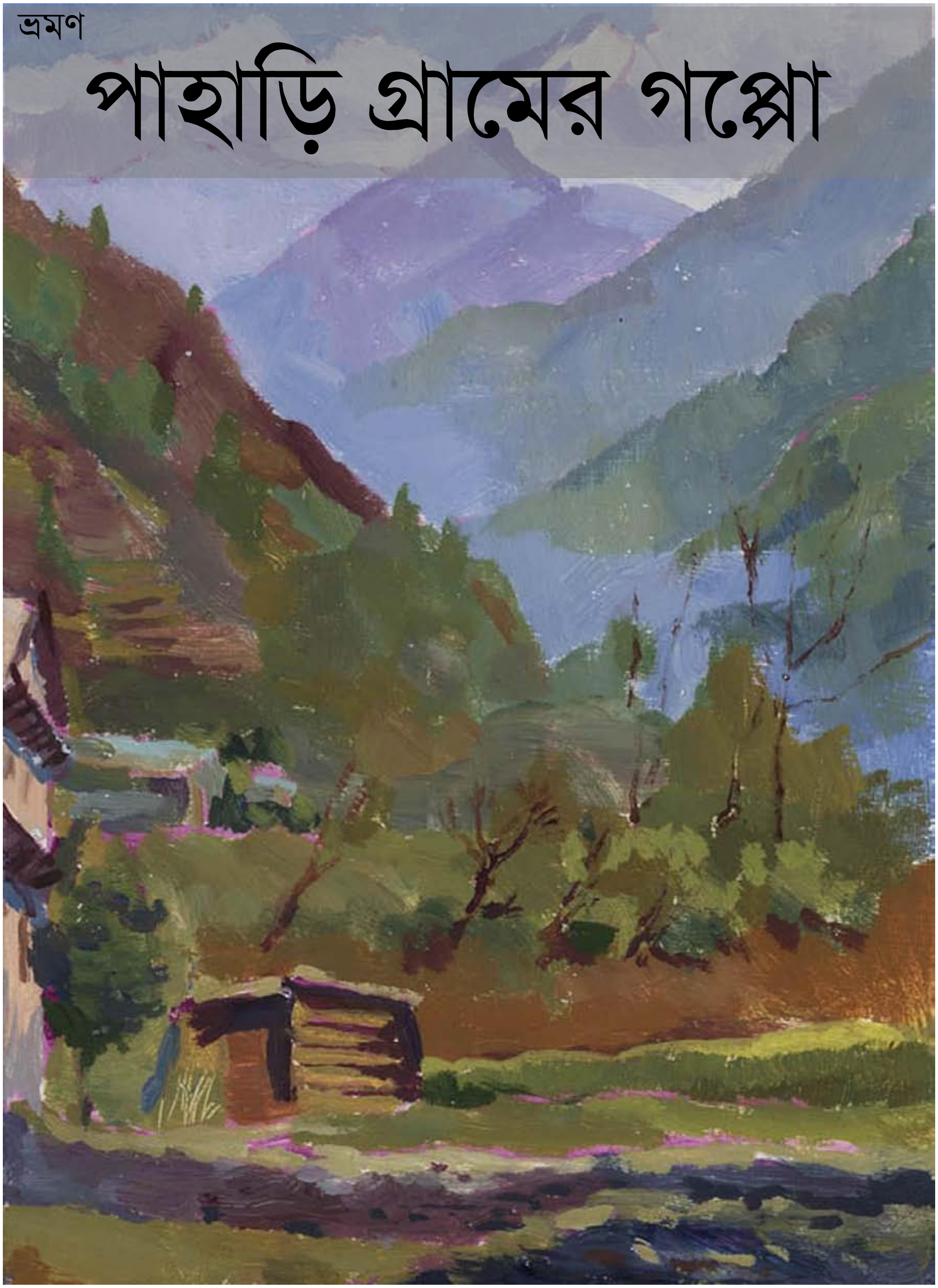

ইন্দ্রনাথ

আমাদের দেশের উত্তরদিকে যে বিরাট পাহাড়শ্রেণী সেটাই হিমালয়। এই হিমালয় পাহাড়ের গায়ে গাড়ি চলা রাস্তার ধারে কাছে, আনাচে কানাচে দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য গ্রাম। কোনো কোনো গ্রামে পায়ে হেঁটে পৌঁছতে সারা দিন এমনকি দুদিন তিনদিনও লেগে যায়। ছবির মতো সুন্দর সেসব গ্রাম। আরো সুন্দর সেখানকার মানুষজন।

এরকমই বেশ কিছু গ্রামে যাবার সুযোগ ঘটেছে আমার, অনেকের সাথে, বেড়াতে বেড়াতে নেহাৎ এক দুদিনের জন্যে। কোনো গ্রামে একবার, কোনো গ্রামে একাধিকবার। উত্তরাখন্ডের এমন কয়েকটা গ্রাম বেড়ানোর সাদামাটা গল্পই শোনাব এবার। সেসব গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা পাহাড়ি নদী, গভীর জঙ্গল, সবুজ পাহাড়ি ঢাল, পাহাড়ের চূড়ার মাথার সাদা বরফ, রঙ বেরঙের জানা অজানা ফুল, নানান প্রজাতির পাখি, যদি কখোনো দেখতে ইচ্ছে করে তোমাদের!

তোমাদেরই মতো আমার এক ছোট্ট বন্ধু আমাকে এমনি এক পাহাড়ি গ্রামের কাছে দাঁড়িয়ে বলেছিল, “ জানো, আমাদের দেশটা এতো বড়ো আর এত সুন্দর......”

পানা

কথায় বলে ‘পানা কী চড়াই জার্মান কী লড়াই’। মানে হল গিয়ে বিরহী নদীর বুক থেকে তোমাকে যদি পানা গ্রামে উঠতে হয় তবে বেদম চড়াই ভাঙতে হবে, আর সে কি যে সে চড়াই!! একেবারে নাক ঠেকা পথ। গোনা গ্রাম থেকে বিরহীর ডানদিকের পাড় ধরে ধরে দিব্যি এগোতে এগোতে যেই পানা বগড়-এ পৌঁছলে ব্যস অমনি চড়াই শুরু। বগড় মানে মনে আছে নিশ্চয়? পানা বগড়ে কিন্তু সেরকম দোকান টোকান নেই। নদীপাড়ে একটা বাড়িতে নুন তেল আটা ময়দা আলু পেঁয়াজ মেলে ব্যস এই অবধি। বললে সে পথিককে কি এক কাপ চা বানিয়ে খাওয়ায় না? তা খাওয়ায় বৈ কী! তো সেই হল গিয়ে চায়ের দোকান। চড়াই শুরু করার আগে গ্রামের মানুষজন দুদণ্ড এখানে জিরিয়ে নিল। চা জল পান করে নিল। তারপর ‘চলি হে’ বলে পা রাখল সেই চড়াই পথে। আর যারা শখ করে পাহাড়ে হাঁটতে গিয়ে আনন্দ পায় তারাও ওইখানেই চা বিস্কুট খেয়ে দেয়ে রওনা হয় সেই চড়াই ডিঙোবে বলে।

সে চড়াই পথের আধাআধি পার হয়ে এসে দেখা মিলবে রাস্তার ডানপাশে মস্তো এক পাথরের, তার নাম ভীম-পাত্থর। অর্থাৎ কিনা মহাভারতের ভীমসেন বারো বছর বনবাসের কোন না কোন সময়ে এ অঞ্চলে এসে ঐ পাথরখানা সরিয়ে নাড়িয়ে থাকবেন অথবা পাথরখানায় হেলান দিয়ে স্রেফ বিশ্রাম নিয়ে থাকতে পারেন। সে যাইই হোক না কেন পাথরখানার বিরাট আকার দেখলে তোমাদেরও মধ্যম পান্ডব ভীমের কথাই মনে হবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

হিমালয়ের বুকে বিভিন্ন জায়গাতে মহাভারতের গল্প ও তার চরিত্ররা এমনি নানা কাহিনির মধ্যে ছড়িয়ে আছেন। গল্পের সত্যতার চেয়ে সামাজিক আচরণের সত্যতা এসব গল্প থেকে ফুটে ওঠে। ঐ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাপনের গল্প মহাভারতের গল্পের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। সেখানেই গল্পগুলোর আসল মজা।

ভীমের পাথর পেরিয়ে আরও চড়াই ভেঙে যখন তোমার দমও বেদম, তখনই পাহাড়ের গায়ে গ্রামের বাড়িঘর দেখতে পাবে আর পথটাও সেখান থেকে আর তেমন বেদম চড়াই নয়। এবারে সে সোজা চলে গেছে গ্রামের খেতের মধ্যে দিয়ে। সেদিকে না গিয়ে বাঁহাতে ঘুরে টিলা মতো জায়গাটাতে উঠলে, সেটাও অবিশ্যি গ্রামের মধ্যেই তবে

গ্রামের মূল ঘরবাড়িগুলো যেখানে তার থেকে থেকে একটু দূরে, একপাশে, চার পাঁচখানা ঘরদোর। সেগুলোর মধ্যে আবার সবচেয়ে উঁচুতে যেটা, সেটাই মুঙলিরামের ঘর।

সেই ঘর যখন দেখতে পেলাম, অমনি আমার একটা ছড়া পেয়ে বসল, আর ছড়া মানেই তো জয়ঢাক। সেই ছড়াটা এবারে তোমাদের শোনাচ্ছি।

<u>পইনি চড়ে পানায়</u>

এক পা দু পা, পানা
চড়াই চড়তে যা না।
দমও ফুরোলে দেখতে পাবি
ভীমের পাথর খানা।

আরও চড়ার পর
এক ঘন্টাই ধর
টং এর মাথায় দেখা যাবে
মুঙলিরামের ঘর।

পইনি লাঠি হাতে
নায়কদাদার সাথে
চড়তে চড়াই কেমন লাগে
দেখছে হাতে নাতে।

মুঙলিরামজি ভালো মানুষ। আজ থেকে বহু বছর আগে যখন ‘‘জঙ্গল বাঁচাও’’ স্লোগান এত হইহই করে চতুর্দিকে বলাবলি শুরু হয়নি, তখনি উনি গাছ জঙ্গল পাহাড়ের সম্পদ সংরক্ষণের কথা ভেবেছিলেন। সেইমতো তাঁর ছোট্ট গ্রামে কাজও শুরু করেছিলেন। পাশে কখনো কাউকে কাউকে পেয়েছিলেন কখনো কাউকে নয়, কিন্তু নিজের মতো করে কাজ করা তাঁর থেমে থাকেনি। তার মতো করে সংরক্ষণের ভাবনা তিনি শুনিয়েছিলেন তাঁর এক সমতলের বন্ধু বনভূষণ নায়ককে। সেসব কথা বনভূষণ নায়ক লিখেছেন তার বিখ্যাত বই ‘সাত পা পথ’ এ। তোমরা যদি কখনো সে বই হাতে পাও, আজ কাল, পরশু, বড়ো হয়ে, পড়ে দেখো।

বছর পঁচিশ বাদে এই সেদিন নায়কদাদার সঙ্গে আমি এক বিকেলে পানার চড়াই ঠেলে হাজির হলাম মুঙলিরামজির বাড়িতে। তখন সেখানে খেত থেকে সদ্য কেটে আনা হয়েছে মুসুর ডাল-এর গাছ। উঠোনময় ছড়ানো। তা থেকে মাড়াই-ঝাড়াই চলছে। বাড়ির মহিলারাই ঝাড়াইয়ের কাজ করছেন, ঐ বেলা পড়ে আসা রোদ্দুরের দিকে পিঠ করে। মুঙলিরাম একইরকম আছেন। শুধু বয়স বেড়েছে। বয়স ছাপ ফেলেছে তাঁর চেহারায়, তামাটে ত্বকে। তাঁর চিন্তাভাবনা এখনো সেইরকম, আরও পরিণত, আরও ধীর স্থির। একটা হুঁকোয় তামাক সেজে ভুড়ুক ভুড়ুক টান দিচ্ছিলেন। পুরোনো বন্ধুকে প্রথমটায়

চিনতে পারেননি, পরে চিনতে পেরে কি আনন্দ!

আরও পাঁচটা পাহাড়ি গ্রামের মতো পানার চাষের খেতেও ভুট্টা আর রামদানার আধিক্য। ভুট্টা মূলত গবাদি পশুর জন্য ফলানো আর রামদানা পিষে আটা করে তা দিয়ে নিজেদের জন্যে রুটি। রামদানা পেকে উঠলে লাল হয়ে যায় গোটা মাঠ। সবুজের ফাঁকে ফাঁকে অমন গাঢ় লাল অসাধারণ সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। আলু, স্কোয়াশ, লাউ এটা সেটা ফললেও সেই অবেলায় আমরা যখন পৌঁছলাম তখন মুংলিরামের ঘরে আনাজপাতি বলতে কিছু নেই। ওঁর বাড়ি থেকে মূল গ্রামের বাড়িঘর এবং একমাত্র দোকানঘর প্রায়

দেড় কিলোমিটার। অগত্যা সেখানেই যেতে হল। কিন্তু সেখানে গিয়েও শোনা গেল দোকানে সব বাড়ন্ত। কিসসু নেই, একমাত্র পেঁয়াজ রয়েছে।

গোনা গ্রামের আমাদের এক বন্ধু সঙ্গে ছিল। গ্রাম থেকে রামজির বাড়িতে ফেরবার সময় সে বলল, 'চলো এক কাজ করা যাক, জঙ্গল থেকে লেঙ্কুয়া নিয়ে যাই।'

'সেটা কী?'

'ওটা এক ধরনের শাক।' বাড়িঘর খেত পার হয়ে জঙ্গল মতো জায়গাতে এসে সে আমাকে লেঙ্কুয়া গাছ চেনালো। কেমন করে তার নরম মোটা শুঁয়োওয়ালা ডগা ভেঙে নিতে হয় তার কৌশল শিখিয়ে দিল। জঙ্গলের মধ্যে আপনিই প্রচুর ঝোপঝাড় হয়ে রয়েছে। আমরা দুজনে অনেকখানি শাক বেছে তুললাম। আর তা দিয়ে তৈরি কী অপূর্ব তরকারি সে রাতে খেয়েছিলাম যে ভোলবার নয়। পাহাড়ি শহরের বাজারে পরে খেয়াল করে দেখেছি জঙ্গলের অনাদরে বেড়ে ওঠা লেঙ্কুয়া সেখানে দশ-দশ টাকা আঁটি বিক্রি হচ্ছে।

পানা একটা সমৃদ্ধ গ্রাম। চাষের জমি অনেক। অনেকে শহরে চাকরি করে। গোনা যেমন বাসরাস্তার কাছে হওয়ায় সুবিধে অনেক, এখন সেখানে স্কুলের চৌহদ্দি বেড়েছে। ছেলেমেয়েরা ভালো ফল করছে। শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ, গোচর থেকে মাস্টারমশাই দিদিমনিরা এসে পড়াচ্ছেন। পানায় অবশ্য ততটা সুবিধে না থাকলেও লোকজন বেশ খেয়েপরে আছে। আছে প্রাথমিকের চেয়ে একধাপ উঁচু স্কুল। বাড়িঘরদোর পাকা। পাকা বাথরুম আর শৌচাগার। লোকজনও পরিষ্কার থাকার চেষ্টা করে। তবু মুংলিরামের বাড়িতে দেখলাম বেশ মাছি। সেটার কারণ গবাদি পশুরা হতে পারে, কারণ ঘরদোর বা বাথরুম শৌচাগার বেশ সাফ সুতরো। এখন বিদ্যুতের খুঁটি এসেছে। তাতে টিমটিম করে একখানা বড়জোর আলো জ্বলে। তাও বেশিক্ষণের জন্যে বিদ্যুত থাকে না। সন্ধেবেলা দু তিন ঘন্টা ব্যাস। সোলার ল্যাম্প অবশ্য আছে। আর কেউ কেউ আজকাল জেনারেটরও ব্যবহার করছে।

ঘুরতে ঘুরতে পানা গ্রামের ওপরে পাহাড়ের মাথায় একটা চওড়া চ্যাটালো জায়গা দেখে সেটা কী কাজে লাগে জিজ্ঞেস করলাম। দেখে মনে হল মানুষের বানানো। কীসের প্রয়োজন ওটা? গ্রামের মানুষের? রামজি বললেন না না, ফৌজিরা এক দুবছর হল এসে কসরৎ করে, ওখানে হেলিকপ্টার নামায়, ক্যাম্প লাগায়। গ্রামের ঝরণার জল নিয়ে যায় টন টন। হৈ হল্লা মশগুল। রামজির গলা খাটো হয়ে আসে। আমাদেরও মন ভার হয়ে আসে। কথা ঘুরিয়ে আমরা গ্রামের সীমানা-পাথরের ওপর শান্ত হয়ে বসে থাকা বিরল

প্রজাতির সার্পেন্ট ঈগলের দিকে মুখ ফেরাই। সেও আমাদের দেখাদেখি আলতো হাওয়ায় গা ভাসালো এইমাত্র। গ্রামের লোকেরা ওকে বলে গরুড় দেবতা।

সেবার যখন পানা বগড় থেকে পানায় ওঠার জন্য পা রেখেছি পথে, দেখি আমাদের সঙ্গী হয়েছে এক মেয়ে আর তার বাপ। তাদের বাড়ি পানা বগড়-এর ওপারে পাগানা গ্রামে। বাপ যাচ্ছেন মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিতে। একটু আধটু গল্পগাছা করতে করতে আমরা পথ চলেছি। মেয়েটির বয়স কেবল আঠারো হয়েছে। পাহাড়ি মেয়েরা খুব পরিশ্রম করে, একা হাতে বাড়ির কাজ সামলে, গরু মহিষের জন্যে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে ঘাস কেটে বোঝা করে বয়ে আনে দূর দূর থেকে। এ মেয়েটিকেও হয়তো, হয়তো কেন সত্যিই ওরকম অনেক কাজ করতে হয়। ওরকম ঘাসের বোঝা পিঠে নিয়ে

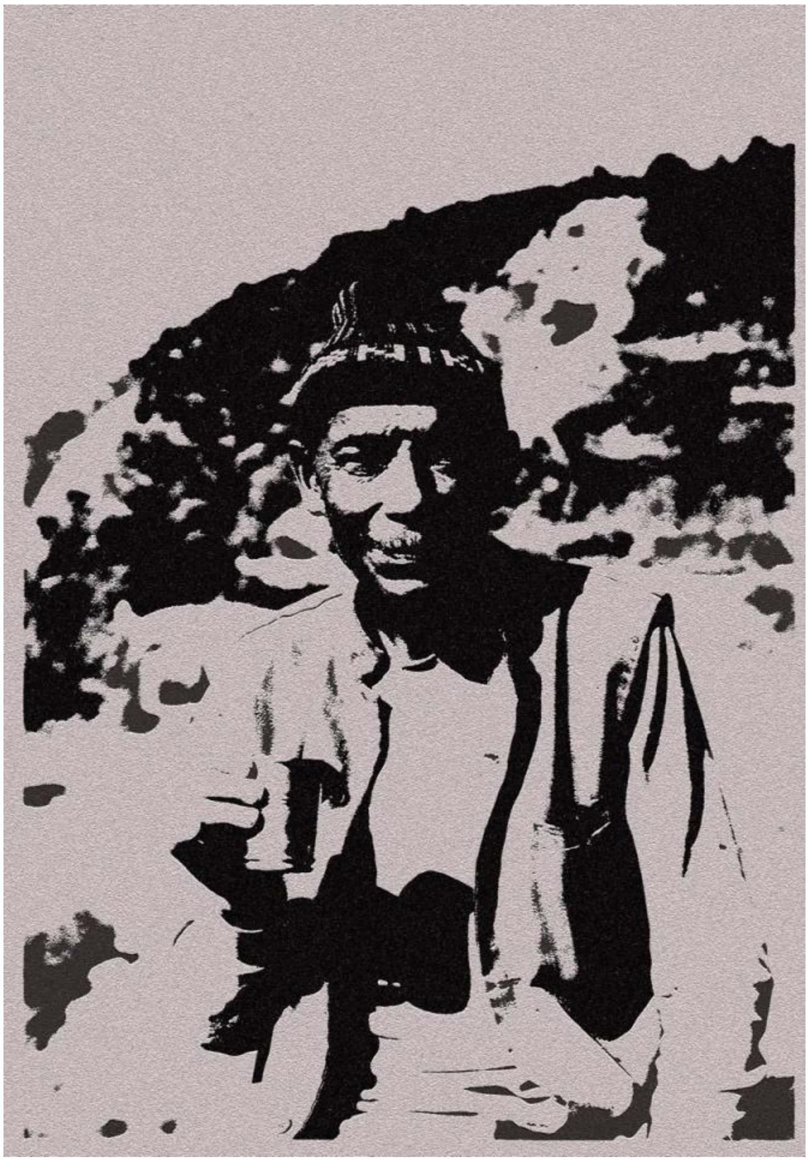

যখন আসে তখন মানুষটিকে আর দেখা যায় না, চলমান বিশাল এক ঘাসের বোঝা যেন। না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত যে একজন মানুষ ঐ ভার বহন করে আনছেন। এমনই তাঁদের ক্ষমতা।

তো চলতে চলতে এক গাছের ছায়ায় আমরা সকলে দাঁড়ালাম একটু জল খেয়ে বিশ্রাম নিয়ে নেবো বলে। মেয়েটি তার ঝোলা থেকে বার করল একটা বোতল, তাতে লাল রঙের একটা তরল। সে সেটা আমার দিকে এগিয়ে শুধু বলল, ‘ভাইয়া...’ আমি বললাম, ‘কী? এটা খাব

নাকি? কী এটা?’ সে যা উত্তর করল তা বোঝায় ওটা রডোডেনড্রন ফুলের রস থেকে বানানো পানীয়। মেয়েটির অনেকদিনের পরিশ্রমে বানানো রস, হয়তো শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে, আমি চোঁওওও করে তার খানিক খেয়ে নিতেই ঠাণ্ডা আর মিষ্টি স্বাদে আমার মুখ গলা তৃপ্তিতে ভরে গেল। এত ভালো মিষ্টি পানীয় আমি এর আগে আর কখনোই খাইনি। আমি জিজ্ঞেস করলাম ‘কীভাবে তৈরি কর?’ মেয়েটি বলল, ‘ফুলের মধু নিংড়ে।’ বাপ্‌স রে! এমন পরিশ্রমের কাজ! মেয়েটি হাসছিল, হাসির মধ্যে ওর কোথাও একটা ব্যথা টের পাচ্ছিলাম। মুখে চোখে তার প্রতিফলন।

মুংলিরামজির বাড়ির দিকে চলে যাবার আগে বিদায় নেবার পালা। ওঁরা গ্রামের দিকে যাবেন। আমি মেয়েটির বাবাকে হঠাৎই তার মেয়েকে দেখিয়ে বললাম, কোই বিমারি? ভদ্রলোকের মুখে একরাশ চিন্তা ভিড় করে এল, ‘হাঁ সাব পেট মে অচানক দর্দ। বিলকুল মার ডালতা হ্যায়।’ হসপিটাল যেতে গেলে অন্তত একদিনের হাঁটাপথ তারপর জিপ, বাস। হ্যাংগাম করে গোপেশ্বর প্রায় পৃথিবীর শেষপ্রান্তে। গ্রামে হাতুড়েও নেই। সুতরাং গরীব মানুষ কী করে? ওদের অসহায়ত্ব দেখে নিজেকে আরও বেশি অসহায় লাগে। কী করা, তবু জোর করে হসপিটাল যেতে বললাম।

বাবা মানুষটি বললেন, ‘আপকা পাস আজ আভি কে লিয়ে কুছ দাওয়া?’

‘কিঁউ, আভি চাহিয়ে?’

হ্যাঁ, পুরো রাস্তাতেই ওর পেট ব্যথা করেছে। আশ্চর্য একবারও বুঝতে দেয়নি, বরং কষ্ট করে হলেও হেসে গেছে। তাকিয়ে দেখলাম মেয়েটি মুখ নীচু করে আছে। আমার ব্যাগে সাধারণ পেটব্যাথার এক দুটো ওষুধ ছিল, আর গ্যাস অম্বলের। সে কটা বার করে ওনার হাতে দিলাম। তারপর ওঁরা গ্রামের পথ ধরলেন। আমরা ভার ভার বুক নিয়ে মুংলিরামজির ডেরার দিকে।

ছবিঃ মৌসুমী (ফটোগ্রাফ অবলম্বনে)
প্রচ্ছদ ছবিঃ সংগৃহীত
ক্রমশ

আমাকে পোষ্য বানাবে নাকি!

অরিন্দম দেবনাথ

আমার বাস ভারতবর্ষ থেকে বহুদূরে ব্রাজিলের আমাজন উপত্যকার বর্ষণবনে। এ ছাড়াও পেরু, বলিভিয়া, ইকুয়েডার ও কলম্বিয়ার ঘন বৃষ্টিস্নাত জঙ্গলে আমাদের দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের আকৃত এতই ছোট যে তোমার আঙুলে দিব্যি আঁকড়ে বসে থাকতে পারি। এই ধর আমরা যখন পূর্ণবয়স্ক হই তখন আমাদের শরীরের আয়তন হয় গড়ে ইঞ্চিপাঁচেক। একবার যদি তুমি আমাকে দেখ আর আমাকে তোমার আঙুলে জড়িয়ে নাও, আমি নিশ্চিত তুমি আমাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে পোষ্য না বানিয়ে পারবে না। যদিও আমাকে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য তোমাকে বেশ খানিকটা অর্থ খসাতে হবে। এই ধর দু থেকে আড়াই লক্ষ টাকা। তা আমার মত সবাইকে তাক লাগিয়ে দেওয়া একটা পোষ্য বাড়িতে রাখতে হলে এটুকু ত খরচ করতেই হয়! আমার শরীরটা পুরু নরম মসৃণ লোমে ঢাকা। দেখলেই হাত বোলাতে ইচ্ছে করবে। গায়ের লোম ধূসর কালো। পেটের দিকটা সাদা অথবা হালকা হলদে যাকে তোমরা ইংরেজিতে "ক্রিম কালার" বল। আমার ঘাড়ের চারপাশে সিংহের কেশরের মত বড় লোম। সেইজন্য অনেকে আমাদের আদর করে ক্ষুদ্রাকৃতি সিংহ বলে। আমার লেজটা একটু লম্বা। এই ধর আট-ন ইঞ্চি। আমার ওজনটা তোমাদের তুলনায় অনেকটাই কম। এই মেরেকেটে তিনশ গ্রামের মত। হাসছ কেন?

ওজনটা বেশি হলে তোমরা কি আমায় বুড়ো আঙুলে বসিয়ে বেড়াতে যেতে পারতে! আমাদের গড় আয়ু এই বছর পনেরো। তবে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বছর পঁচিশ মত বাঁচে।

আমাদের নখগুলো কিন্তু মারাত্মক ধারালো ও ছুঁচলো। একটু সাবধানে থেকো। আসলে তোমরা যদি আমাকে পুষ্যি করে বাড়ি নিয়ে না যাও তাহলে তো আমাকে গাছের মগডালে ডালে ঘুরে বেড়িয়ে খাবার জোগাড় করতে হয়। তাই ঈশ্বর আমাকে ধারালো নখ দিয়েছেন, আমি জঙ্গলে গাছের ছোট্ট কোটরে থাকি। উপায় তো নেই! তাই গাছের কোটরই সই। খুব যদি জল-ঝড় হয় তাই কোটরের চেয়ে নিরাপদ আশ্রয় আমাদের জন্য আর কিছু নেই। সারাদিন গাছে গাছে ঘুরি। গাছের আঠা, ফল, ফুল, কচি পাতা, শ্যাওলা খাই। বলতে নেই ছোট ছোট পোকা মাকড় যেমন মাকড়শা, বিছে, ক্ষুদে গিরগিটি এসব খেয়ে ফেলি মুখ বদলাতে। কোন কারণে যদি এক অঞ্চলের খাবার কমে যায় তখন অন্য পাড়াতে গিয়ে আবার ঘর বাঁধতে হয়। খুঁজতে হয় নতুন গাছের কোটর। আমরা কিন্তু খুব সমাজবদ্ধ জীব। সবসময় আট দশ জন এক সাথে থাকি। দল ছাড়া আমাদের দেখতেই পাবে না! আমরা যখন এক সাথে থাকি তখন সবসময় কথা বলতে পছন্দ করি। অবশ্য পুরোটাই আমাদের নিজস্ব ধারায়। অঙ্গ ভঙ্গি করে। কখনও সামান্য আওয়াজ করে। আমাদের বড় শত্রু হল বুনো বেড়াল, সাপ আর ওই বিচ্ছু শিকারী বড় পাখিগুলো। ঈগল-বাজ। যখন ওগুলো কাছাকাছি আসে। তখন আমরা একদম নট নড়নচড়ন হয়ে থাকি। নড়লেই তো বুঝে যাবে কোথায় আছি। আর টপ করে ধরে একদম যমালয়ে পাঠিয়ে দেবে! তবে আমরা কিন্তু বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী নই। আমরা প্রচুর পরিমাণে বেঁচেবর্তে আছি। আশা করি থাকবও যদি তোমরা আমাদের আবাসস্থলে এসে হামলা না চালাও। আমাদের থাকার জায়গা অর্থাৎ জঙ্গল কেটে সাফ না করে দাও। পাহাড়ি অঞ্চলের ঢালের জঙ্গল আমাদের পছন্দ। তাই আমরা সমুদ্রতল থেকে ছশো থেকে তিন হাজার ফুট উচ্চতায় থাকি। আমাদের আরো পছন্দ নদীর ধারের জঙ্গল। আমাদের চিনতে পেরেছ কি? আমাদের একটা পোশাকি খটমট নাম আছে বটে। তবে সবাই আমাদের আদর করে ডাকে ফিঙ্গার মাঙ্কি বলে। কেউ কেউ পিগমি মাঙ্কিও অবশ্য বলে। আমাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে হলে ব্রাজিল, মার্কিন দেশ, কলম্বিয়া কিংবা পেরুর পোষ্য জন্তু জানোয়ারের দোকানে খোঁজ নিতে পার। তবে আমাকে বাড়িতে নেবার আগে স্থানীয় আইনকানুনগুলো একটু

খুঁটিয়ে দেখে নিও। না হলে ঝামেলায় পড়তে হতে পারে। তবে আমরা সহজেই তোমার বাড়ির অন্য পোষ্যদের সাথে মিশে যাই। তাই আমাদের নিয়ে খুব একটা দুশ্চিন্তা নেই। তবে আমাদের কেনার আগে ভাল করে দেখে নিও আমাদের শরীর স্বাস্থ্য সব ঠিক আছে কিনা। আমাদের চিকিৎসক পাওয়া একটু মুশকিল। আমাদের খাবার নিয়েও দুশ্চিন্তা নেই। সামান্য ফল, আর মাসে দু-একদিন একটু মাংসের ছাঁট দিলেই যথেষ্ট। তবে আর কেন? এস, আঙুলে জড়িয়ে নাও আমায়!

ছবিঃ সংগৃহীত

।৫।

পিথাগোরাসের গল্পের শেষে ফের ফিরে আসা যাক শূল্বসূত্রের কথায়। আধুনিক গণিতশাস্ত্রের, বিশেষত জ্যামিতির বহু দরকারী তত্ত্বেরই সূচনা হয়েছে এই শূল্বসূত্রের পুঁথিগুলোতে। এইবারে তার কয়েকটা উদাহরণ দেবো।

সমকোণী ত্রিভূজ নিয়ে পিথাগোরাসের তত্ত্বটি (কোন সমকোণী ত্রিভূজের অতিভূজের ওপর গড়ে তোলা বর্গক্ষেত্রটি তার অন্য দুই বাহুর ওপরে গড়ে তোলা বর্গক্ষেত্রের যোগফলের সমান হবে) রয়েছে বৌধায়নের শূল্বসূত্রে।

তা বাদে বৌধায়নের বইতে রয়েছে একটি অজানা রাশি দিয়ে তৈরি রৈখিক সমীকরণের জ্যামিতিক সমাধান।

$5x+8=48$-এই জাতীয় সমীকরণ হল একটি অজানা রাশির রৈখিক সমীকরণের উদাহরণ। বীজগণিতের প্রথম পাঠ যারা নিয়ে ফেলেছো তাদের কাছে এ অতি সাধারণ অংক, কিন্তু মনে রেখো, আজ থেকে দু-আড়াই হাজার বছর আগে এর সমাধান বের করতে পারাটা

কিন্তু এক বিরাট বৈজ্ঞানিক সাফল্য ছিল। এ যেন অনেকটা প্রথম আগুন জ্বালাতে শেখার মতো ব্যাপার।

বৌধায়নের সূত্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও কিছু নতুন সূত্র নিয়ে তৈরি হয়েছিল অপস্তম্বের শূল্বসূত্র। সেখানে আমরা দ্বিঘাত সমীকরণের উদাহরণ পাই। ($5x^2+6x-63=0$-এই ধরণের সমীকরণকে বলে দ্বিঘাত সমীকরণ)

এ ছাড়া অপস্তম্বের সূত্রে ২-এর একটা পাঁচ দশমিক স্থান অবধি নিখুঁত বর্গমূলের সন্ধান মেলে ($\sqrt{২}$=১.৪১৪২১)।

অপস্তম্ভ আরো অনেক কাজ করেছিলেন। যেমন ধরো, একটা রেখাংশকে সাতটা সমান টুকরোয় ভাগ করার পদ্ধতি বের করেছিলেন তিনি। বৌধায়নের রৈখিক সমীকরণের জ্যামিতিক সমাধানকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে সাধারণিকৃত রৈখিক সমীকরণদের সমাধানের পদ্ধতিও তৈরি করেছিলেন। (একে ইংরিজিতে বলে জেনারেল লিনিয়ার ইকোয়েশন। ওপরের বৌধায়নের সমীকরণটাকে যদি লিখি $5x+8y=48$ তাহলে তাকে এই ধরণের সমীকরণ বলা যাবে।) জ্যামিতি সংক্রান্ত আরো একটা উল্লেখযোগ্য কাজ রয়েছে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের জৈন পুঁথি সুর্য প্রজ্ঞাপতি-তে। সেখানে উপবৃত্ত (ইলিপস্)-এর জ্যামিতিক বিবরণ দেয়া হয়েছে।

এই গাণিতিক সূত্রদের নিয়ে একটা রহস্য রয়ে গেছে। সেটা হল, সূত্রগুলো তো পুঁথিগুলোতে রয়েছে, কিন্তু তারা কোন গাণিতিক পদ্ধতিতে সৃষ্টি হলো, বা কীভাবে তাদের কষে বের করা হলো তার কোন উল্লেখ কিন্তু কোথাও বিশেষ পাওয়া যায় না। অংকবইতে যদি উপপাদ্যগুলো সাজিয়ে দেয়া থাকে, কোন প্রমাণ ছাড়া, এ অনেকটা সেইরকম ব্যাপার।

ফলে, কোন পদ্ধতিতে এই সূত্রগুলো সেই প্রাচীন যুগে তৈরি করা হয়েছিলো সে ব্যাপারে আজকের বিজ্ঞানিরা কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারেন নি।

তিনটে মত আছে এক্ষেত্রে। কেউ বলেন সূত্রগুলো তৈরি হয়েছিলো ট্রায়াল অ্যান্ড এরর পদ্ধতিতে, কারো মতে, এগুলো তৈরি হয়েছে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে, আবার কেউ কেউ বলেন, বিশুদ্ধ গাণিতিক পদ্ধতিতেই এদের জন্ম।

এইখানে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পৌঁছোবার এই তিনটে পদ্ধতি সম্পর্কে একটু বুঝে নেয়া যাক।

<u>ট্রায়াল অ্যান্ড এরর পদ্ধতিঃ</u>

ওপরের দ্বিঘাত সমীকরণটা দেখোঃ $5x^2+6x-63=0$। প্রথমে x-এর মান ধরলে ১। এতে সমীকরণটার মান আসবে -৭৪। অতএব x-এর মান ১ হবে না। এবারে x-এর মান ধরলে ধরো

২। এতে সমীকরণটার মান আসবে -৩১। অতএব x-এর মান ২ হবে না। এবারে x-এর মান ধরলে ধরো ৩। এতে সমীকরণটার মান আসবে ০। অতএব x-এর মান হলো ৩। এক কথায়, চেষ্টা করে যাচ্ছি, ভুল হয়ে যাচ্ছে। করতে করতে অবশেষে সঠিক মানটায় পৌঁছোলাম।

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

একটা সমবাহু ত্রিভূজ আছে। তার বাহুর মাপ জানা আছে। তার সমান আয়তনের বর্গক্ষেত্রের মাপ বের করতে হবে।

বেশ খানিকটা গোটা গোলমরিচ নাও। ত্রিভূজের বাহুর মাপের তিনটে কাঠি নিয়ে মেঝের ওপর ত্রিভূজটা বানাও। তারপর তার মধ্যে গোলমরিচগুলো ছড়িয়ে দাও। খেয়াল রেখো যাতে গোলমরিচগুলো সবটা এলাকাকে ঠিকমতো ঢাকে এবং একটার ওপর আরেকটা কোথাও চেপে না থাকে। এবারে কাঠিগুলো সরিয়ে নাও। ত্রিভূজাকৃতি গোলমরিচের স্তরটাকে হাত দিয়ে চেপে চেপে বর্গক্ষেত্রাকার বানাও। চারপাশটা সমান হলো কিনা সেটা একটা কাঠি দিয়ে বারবার মেপে মেপে ঠিক করো। বর্গক্ষেত্রটা তৈরি হলে তার একধারের মাপ নিয়ে নাও। সেটাই উত্তর। (সাবধান, এক্ষেত্রে বালি, মাটি এসব ব্যবহার করলে উত্তরে ভুল হবে। কেন? বড়োদের জিজ্ঞাসা করে দেখ। কেউ বলতে না পারলে জয়ঢাককে জিজ্ঞাসা করো।

বিশুদ্ধ গাণিতিক পদ্ধতিঃ

ফের একবার ওপরের দ্বিঘাত সমীকরণটা দেখা যাক- $5x^2+6x-63=0$

একে গাণিতিক পদ্ধতিতে এইভাবে সমাধান করে ফেলা যাবে--

or, $5x^2 +21x-15x -63 =0$

or, $(5x+21)(x-3)=0$

or, $x=-21/5$ কিংবা 3

এই তৃতীয় পদ্ধতিতে প্রাচীন যুগের গাণিতিক সমীকরণগুলো তৈরি হয়েছিলো বলে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁদের মতে, এদের গাণিতিক প্রমাণগুলো নিশ্চয় ছিলো কিন্তু গুরুকুল পদ্ধতিতে মুখে মুখেই তা প্রবাহিত হয়েছে গুরুশিষ্য পরম্পরায় ও অবশেষে যখন মুখে বলা পুঁথিরা লিপিবদ্ধ হয়েছে তখন প্রমাণের বদলে কেবল উপপাদ্য এবং সিদ্ধান্তগুলোই লিখে রাখা হয়েছে।

ওপরের তিনটে রাস্তা ছাড়াও আরও একটা কারণ থাকতে পারে প্রমাণহীন উপপাদ্যদের উপস্থিতির। সেটা হল কিছু কিছু বিজ্ঞানির এক বিচ্ছিরি অভ্যেস-- উপপাদ্যটা বলে দেয়া কিন্তু প্রমাণ না দেয়া। সমসাময়িক ও উত্তরসূরী বিজ্ঞানিদের সামনে যেন মজা করে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন এইসব বিজ্ঞানি, পারলে যুক্তি দিয়ে ঠিক কিংবা ভুল প্রমাণ করে দেখাও দেখি আমার উপপাদ্যকে!

এ লাইনে বিশেষজ্ঞ ধরা যায় সপ্তদশ শতকের ফরাসি আইনজীবি তথা গণিতজ্ঞ পিয়ের দা ফার্মা-কে (১৬০১-১৬৬৪)। পাসকালের সঙ্গে একত্রে প্রবাবিলিটি বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করা থেকে শুরু করে অ্যানালিটিকাল জ্যামিতি ও আলোকবিজ্ঞানের বহু মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের জনক এই মানুষটি। ফার্মার বহু বিখ্যাত তত্ত্ব ও গাণিতিক প্রস্তাব খুঁজে পাওয়া গেছে বন্ধুদের লেখা তাঁর চিঠিপত্রের মধ্যে, এবং তার বেশির ভাগই হলো প্রমাণহীন কিছু উপপাদ্য। কেমন করে সেসব সিদ্ধান্তে তিনি পোঁছোলেন তার কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেবার চেষ্টাই করেন নি ফার্মা। এইরকম সব রহস্যময় প্রমাণহীন উপপাদ্যের মধ্যে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ও বিখ্যাতটি ফার্মা'জ লাস্ট থিওরেম নামে খ্যাত।

ফার্মার লাইব্রেরিতে ডায়োফ্যান্টাস-এর 'অ্যারিথমেটিকা' নামে একটা বই ছিল। তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরে তাঁর ছেলে বাবার লাইব্রেরির সেই বইটা দেখতে দেখতে তার একটা পাতার মার্জিনে খুদে খুদে অক্ষরে নিচের উপপাদ্যটা লেখা দেখতে পান—

যে কোন তিনটে ধনাত্মক সংখ্যা (a,b,c) ই নেয়া যাক না কেন তারা কখনো এই সমীকরণটা মেনে চলবে না—$a^n+b^n=c^n$(এক্ষেত্রে n-এর মান ২ এর চেয়ে বেশি যেকোন সংখ্যা হতে পারে।)

উপপাদ্যের তলায় খুদে খুদে অক্ষরে লেখা—এ উপপাদ্যের একটা দারুণ প্রমাণ আমি আবিষ্কার করেছি, কিন্তু পাতার মার্জিনে জায়গা বেশি নেই, তাই প্রমাণটা এইখানে দিতে পারলাম না।

(ফার্মার নিজের ভাষায়-- it is impossible to separate a cube into two cubes, or a fourth power into two fourth powers, or in general, any power higher than the second, into two like powers. I have discovered a truly marvelous proof of this, which this margin is too narrow to contain)

সাড়ে তিনশো বছর পরে ১৯৯৫ সালে এসে অত্যাধুনিক সব গাণিতিক তত্ত্বের প্রয়োগ করে অবশেষে বিজ্ঞানিরা ফার্মার শেষ উপপাদ্যের সম্পূর্ণ প্রমাণ দিতে সক্ষম হয়েছেন।
আমাদের প্রাচীনকালের অংকবইরাও এইরকমই সব অসাধারণ গভীর অথচ প্রমাণহীন উপপাদ্যে ভরপুর।

ক্রমশ

মাথে মে ট্রিকস

একটা যেকোন সংখ্যা নাও।
তার থেকে **১** বিয়োগ করো।
বিয়োগফলকে **৩** দিয়ে গুণ করো।
গুণফলের সঙ্গে **১২** যোগ করো।
যোগফলকে **৩** দিয়ে ভাগ করো।
ভাগফলের সঙ্গে **৫** যোগ কর।
যোগফলের থেকে গোড়ায় ধরা সংখ্যাটা বিয়োগ করে দাও।
গোড়ায় তুমি যে সংখ্যাই ধরে থাকোনা কেন, উত্তর তোমার সবসময়েই আসবে ৮।

নানান দেশের এক দুই তিন

এই সংখ্যায় রাশিয়ান এক দুই তিন-এর পালাঃ

1 - один **(**আদীন)
2 - два **(**দ্বা)
3 - три **(**ত্রি)
4 - четыре **(**চ্যেতির‍্যে)
5 - пять **(**প্যাত)
6 - шесть **(**ষেস্ট)
7 - семь **(**স্যিয়েম)
8 - восемь **(**ভোস্যিয়েম)
9 - девять **(**দ্যেভিয়াত)
10 - десять **(**দ্যেসিয়াত)

দুই থেকে সাত, আর দশ। এই ক'টার ক্ষেত্রে রাশিয়ান আর সংস্কৃত নামে বেশ মিল রয়েছে খেয়াল করে দেখো।

বরাহমিহির

টুপুর

গুপ্ত রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম ছিলেন বরাহমিহির। এর থেকেই বোঝা যায় যে তাঁর জন্ম হয়ে ছিল খ্রিষ্টজন্মের পাঁচশ বছর পরে। তাঁর মৃত্য সন ছিল ৫৮৭ খ্রিষ্টাব্দ। মধ্য ভারতের উজ্জয়িনীতে তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা। তাঁর বাবা ছিলেন আদিত্যদাস।

বরাহমিহিরের মূল বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম পঞ্চ সিদ্ধান্তের ওপর। পঞ্চসিদ্ধান্তের প্রথম ভাগে আলোচিত হয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞান আর দ্বিতীয় ভাগে জ্যোতিষ। এই দ্বিতীয় ভাগের বৃহৎ সংহিতা অংশই কেবলমাত্র আসল বই হিসেবে পাওয়া গেছে। বাকি অংশগুলোর অস্তিত্বের কথা জানা যায় অন্যান্য সংকলনে তাদের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে বলে।

পঞ্চ সিদ্ধান্ত আসলে পাঁচটি আলাদা আলাদা সিদ্ধান্তের সংকলন। সেগুলি হলো পৌশিলা, রোমক, বষিষ্ঠ, সূর্য, পিতামহ। তবে এই সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কেবলমাত্র সূর্যসিদ্ধান্তই আসল বই হিসেবে পাওয়া যায়, বাকি অংশগুলোর অস্তিত্ব জানা যায় বিভিন্ন অন্য লেখার মধ্যে তাদের উল্লেখ থেকে। তবে বরাহমিহির পঞ্চ সিদ্ধান্তের প্রণেতা নন, প্রণেতা আর্যভট্ট। বরাহমহির এই সংকলনকে সময়োপযোগী করেছিলেন মাত্র।

বরাহমিহির তাঁর যাবতীয় গবেষণায় প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন পৃথিবী গোলাকার, কিন্তু স্থির গ্রহ। মানে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে একথা বরাহমিহির মানেন নি।

বরাহমিহিরের অন্যান্য সংকলনের মধ্যে প্রধান একটি হলো বৃহৎ জাতক। পঁচিশ পর্বে ভাঙা এই বইতে জাতপত্রিকা বা কুষ্ঠি নির্ণয়ে লাগে এমন জ্যোতিষ আলোচনা করা হয়েছিল। এই বইয়ের যে অংশে নানা ধরনের অভিযান বা যাত্রার কথা বলা হয়েছে তার নাম বৃহৎ যাত্রা। বিয়ের ব্যাপারে নানা কথা আলোচনা করা হয়েছে বৃহৎ পটল অংশে।

এছাড়াও বরাহমিহিরের অন্য আরেকটি উল্লেখযোগ্য বই হলো বৃহৎ সংহিতা। বৃহৎ সংহিতায় আছে একশ অধ্যায়ে বাঁধা চার হাজার শ্লোক। এই বইকে বৃক্ষায়ুর্বেদও বলা হয়। কারণ এই বইতে মূলতঃ চাষবাস ও বন সৃজনের ও পালনের কথা আলোচনা করা হয়েছে। খুব বিশদে এই বইতে আলোচনা করেছেন কীভাবে গাছ লাগানোর জন্য মাটি বানাতে হয়, গাছের বেড়ে ওঠার জন্য কোন সার উপযোগী ও তা তৈরি করতে কী উপাদান লাগে, কতক্ষণ ধরে কীভাবে তা পচাতে হয় এইসব। সারের ব্যাপারে এই বইতেই সবার আগে বলা হয় সিমজাতীয় গাছ চাষ করে কী করে মাটিতে সার বাড়ানো যায়। তা ছাড়াও এই বইতে বলা হয়েছে গাছে ভালো ফুল ধরানোর বা নির্দিষ্ট ঋতু ছাড়াও কী করে গাছে ফুল ধরানো যায় তার উপায়। কলমের গাছ বানানোর নানা উপায় গ্রন্থিত আছে বইতে। তাছাড়াও এই বইতে লেখা আছে গাছের ওপর আবহাওয়ার প্রভাব। এইসব কারণে বৃহৎ সংহিতাকে বরাহমিহিরের যুগান্তকারী সৃষ্টি বলে ধরা হয়।

বৃহৎ সংহিতায় বলা এলাঞ্জি গাছ। বাড়িতে লাগালে হাওয়া ভালো হয়।

ছবিঃ সংগৃহীত

আকাশচারী

বৈজ্ঞানিক

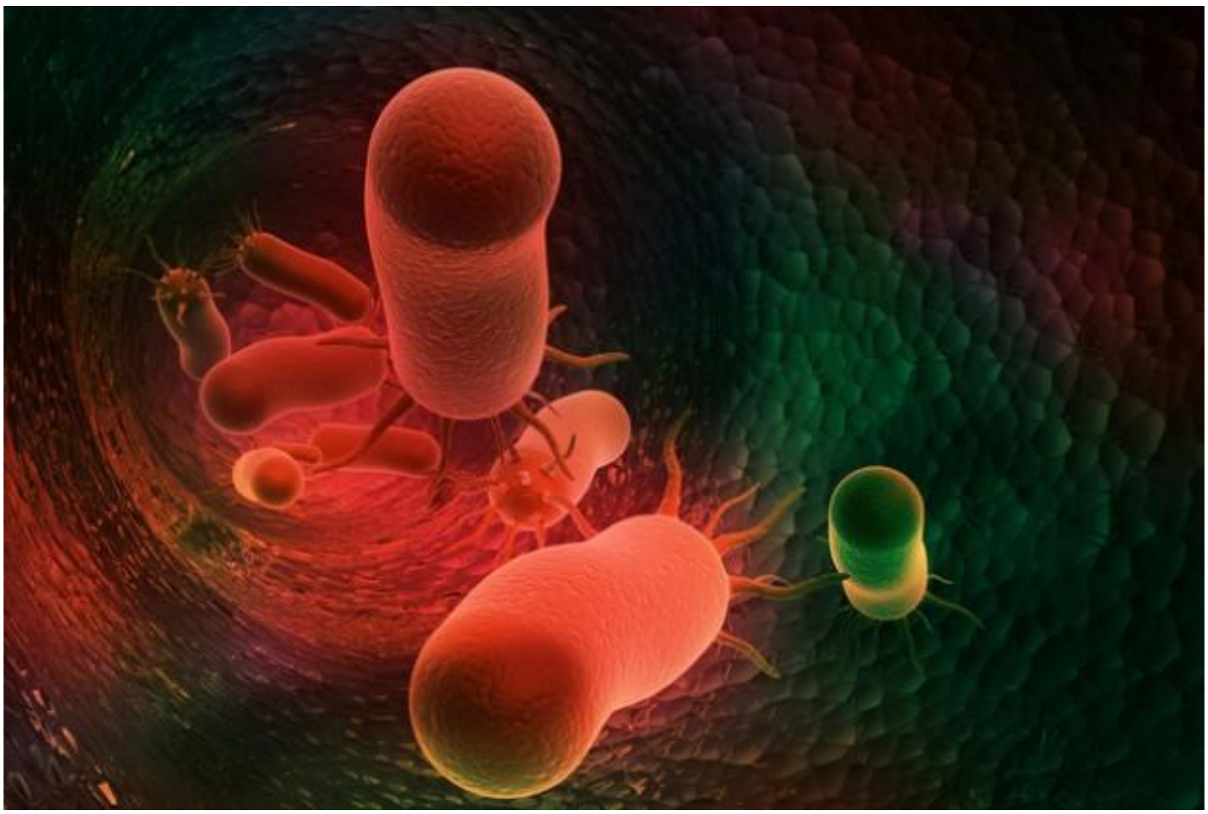

নামঃ ব্যাসিলাস স্ট্র্যাটোফেরিকাস। আকারে ছোট ছোট লাঠির মতো। মাটি থেকে ৪১ কিলোমিটার ওপরে তীব্র অতিবেগুনি রশ্মিতে ধোয়া স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের পাতলা আবহমণ্ডলে তাদের বাস। সমুদ্রে যেমন শ্যাওলা ভেসে বেড়ায়, তেমনি হাওয়ার সমুদ্রের একেবারে ওপরের তলার বাসিন্দা এই জীবেরা। তাদের কাছে আমরা হলাম তাদের হাওয়া সমুদ্রের ৪১ কিলোমিটার গভীর তলদেশের রহস্যময় জীব।

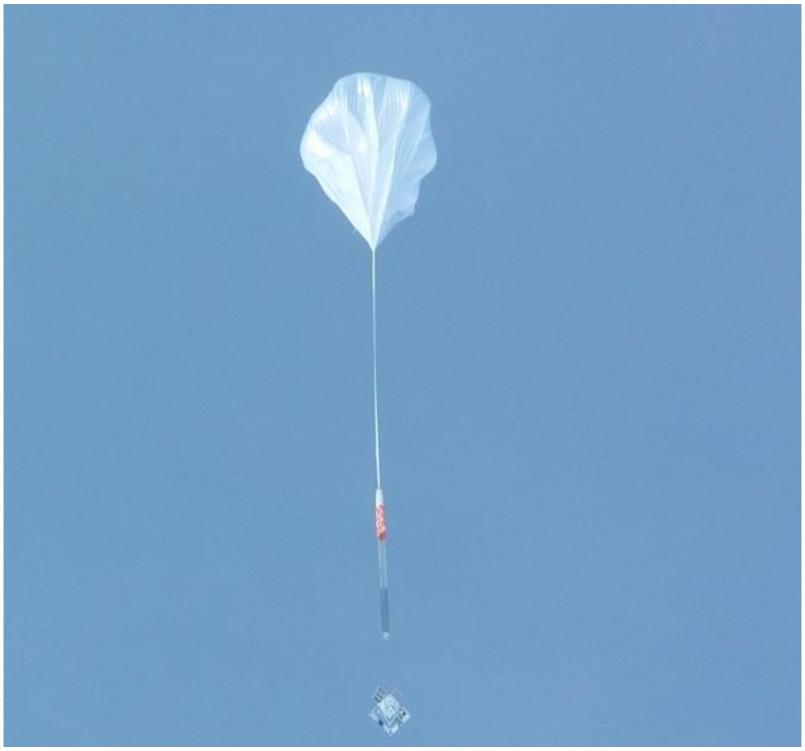

২০০১ সালে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে একটা বেলুন অভিযানে প্রথম এদের কয়েকটিকে জীবন্ত সংগ্রহ করে আনা হয়েছিলো। ২০১২ সালে চিনা আর ইংরেজ বিজ্ঞানিরা মিলে এদের ব্যাপারে একটা নতুন তথ্য আবিষ্কার করলেন। সেটা হল এই যে এই ব্যাক্টিরিয়ারা জৈব বস্তুকে খেয়ে হজম করবার সময় বেশ ভালো পরিমাণ বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারে।

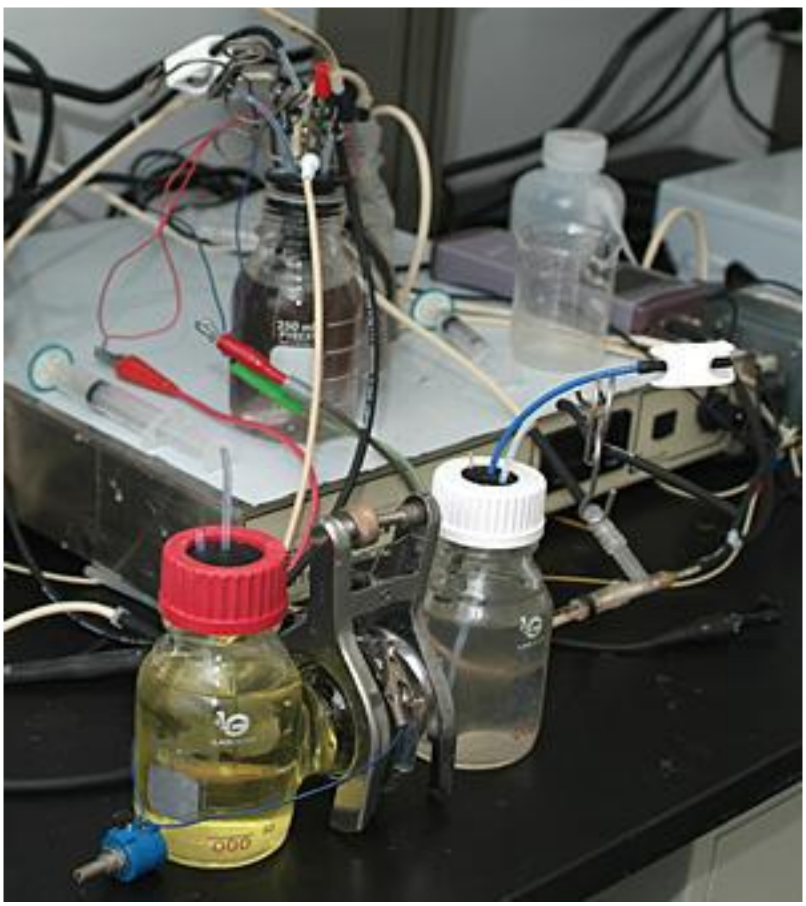

এদের দিয়ে তাঁরা ব্যাক্টিরিয়ানির্ভর ব্যাটারি তৈরি করেছেন। এদের এক ঘনমিটার জায়গায় ছড়িয়ে দিলে তার থেকে ২০০ ওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি করা যাচ্ছে। চেষ্টা করা হচ্ছে এদের আরো ছোট জায়গায় একত্র করে ব্যাটারি বানাবার। তৈরি হলে আমরা এমন একটা ব্যাটারি পাবো যার শক্তি কখনো ফুরোবে না।

ছবিঃ সংগৃহীত

টেকনো টুকটাক

বৈজ্ঞানিক

আলোছুরি

ট্রেকিং-এ যাবার অভ্যেস আছে নাকি? তাহলে নিশ্চয় কখনো না কখনো ক্যাম্পে অন্ধকারে কিছু কাটাকাটি করবার দরকার পড়েছে? এক হাতে টর্চ আর অন্য হাতে ছুরি দরে কাজটা করতে বেজায় অসুবিধে হয় না? তা এসওজি কোম্পানি সমস্যাটার সমাধান করে দিয়েছে তাদের নতুন আলোছুরি বাজারে এনে। প্রায় ছ ইঞ্চি লম্বা স্টেনলেস স্টিলের এই ছুড়ির বাঁটের মধ্যে ব্যাটারি ভরে দিয়েছে তারা। বাঁটের মাথায় ছখানা ছোট ছোট আলো। ব্যস! অন্ধকারে বাঁটের সুইচ অন করে নিলেই আর কোন সমস্যা থাকলো না। এক মিটার জলের নিচে অবধি দিব্যি কাজ করে এই আলোছুরি। ফলে অন্ধকারে অগভীর পুকুরে ডুব মেরে শিকার করতেও কাজে আসবে। আর একটা বেশ নিরীহ ব্যবহার আছে এর। একে অন্ধকারে পথ চলবার সময় টর্চ হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। কিন্তু চাইলে এই ঠিকানায় গিয়ে দেখো- www.SOGKnives.com

জলছুরি

হিন্দি সিনেমার ডায়ালগ আছে, “লোহে লোহেকো কাটতে হৈ।” সে তো ভালো কথা। কিন্তু জল দিয়ে লোহা কাটা? হ্যাঁ তা_ও হয়। তীব্রগতিতে পাঠান সরু জলের ধারাকে ছুরি হিসেবে প্রথম ব্যবহার করা হয় ১৯৩৩ সালে উইসকনসিনের এক কাগজ কলে। যন্ত্র থেকে বের হয়ে আসা কাগজের লম্বা ফিতেকে কেটে কেটে সঠিক মাপের টুকরো বানাবার কাজে ব্যবহার শুরু হয় এই জলছুরির।

১৯৫৬ সালে লাক্সেমবার্গের ডুরক্স কম্পানি আরো শক্তিশালী জলের ধারা দিয়ে প্লাস্টিক কাটা শুরু করে।

জলের ধারার শক্তি আরো বাড়াতে হলে তাকে আরো সুক্ষ্মতর ফুটো দিয়ে আরো বেশি চাপে বের করতে হবে। কিন্তু এতে সমস্যা হচ্ছিল এই যে, তেমন চাপের মুখে টিঁকবে এমন কোন উপাদান পাওয়া যাচ্ছিলনা যা দিয়ে জল ছোঁড়বার কলের মুখটা (নজল) বানানো যায়। শেষে ১৯৭০-এর দশকে করানডাম স্ফটিক দিয়ে নর্মান ফ্রানজ তৈরি করলেন 0.05 মিমি ব্যাসার্ধের ফুটো , যা দিয়ে অতি উচ্চচাপে জল পাঠানো সম্ভব হবে। প্রায় একই সময়ে জন ওলসেন তৈরি করে ফেললেন জলের ওপর অতি উচ্চচাপ তৈরি করবার প্রযুক্তি। ১৯৭৬ সালে তৈরি হল সেই সুক্ষ্ম ফুটো দিয়ে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৭০,০০০ পাউণ্ড চাপে শব্দের চেয়েও বেশি গতিতে জলের ধারা পাঠাবার পদ্ধতি। কঠিনতম ধাতুকেও নিখুঁতভাবে মাখনের মত কেটে ফেলতে সক্ষম এই জলছুরি।

প্রথাগত কাটিং পদ্ধতিগুলোর চেয়ে অনেক সুবিধের এই পদ্ধতিতে অপ্রয়োজনীয় তাপ তৈরি হয়ে ধাতুকে খারাপ করেনা, ধাতু বলো, কাচ বলো, হীরে বলো সবকিছু কাটতেই একই অস্ত্র ব্যবহার করা যায়। তাছাড়া জলছুরিকে প্রায় আর্টিস্টের তুলির মতই ব্যবহার করে অনেক জটিলে ডিজাইনে কেটে ফেলা যায় ধাতুকে। এর ফলে সহজে জটিল যন্ত্রাংশ তৈরির কাজে জুড়ি নেই এই জলছুরির।

নীল-সবুজ বিদ্যুৎ

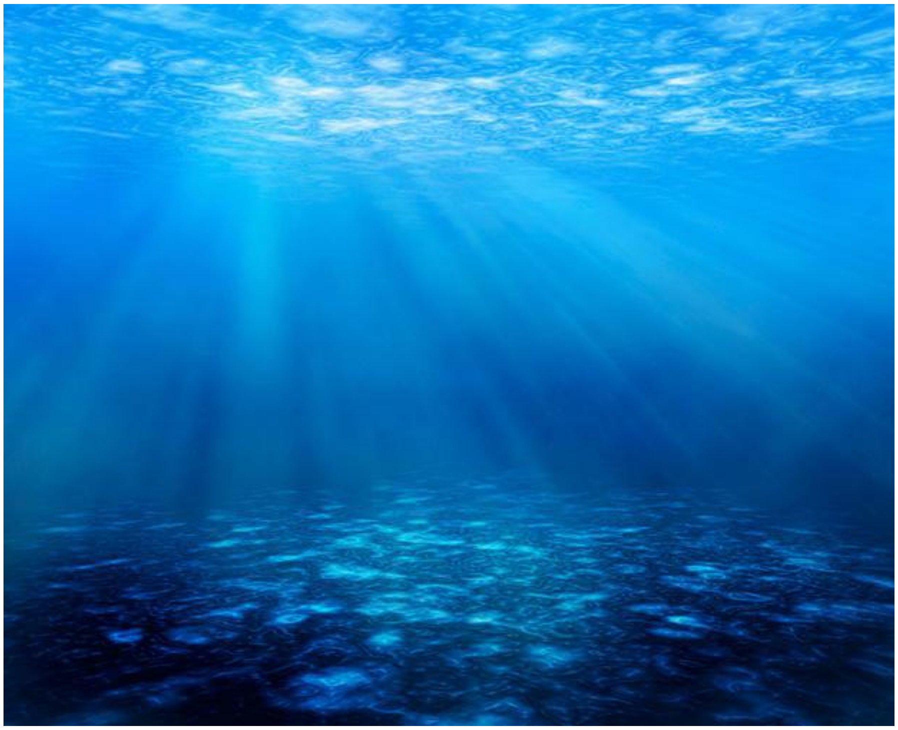

গ্যালিয়াম ইন্ডিয়াম ফসফাইড নামের একটা ধাতুমিশ্র রয়েছে যেটা নীল-সবুজ আলো পেলে তা থেকে বেজায় ভালো বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারে। সিলিকন দিয়ে তৈরি আলোক তড়িৎ কোষের চেয়েও অনেকগুণ ভালো। আরো একটা খবর হলো সমুদ্রের অগভীর এলাকায় জলের নিচে কেবল নীল-সবুজ আলোই পৌঁছোয়। সূর্যের আলোর অন্য রঙগুলোকে ফিল্টার করে শুষে নেয় জল। এখন অবধি গবেষণা যে স্তরে রয়েছে তাতে ৩০ ফিট গভীরতায় একটা এক বর্গমিটারের প্যানেল থেকে সাত ওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। আমরা অপেক্ষায় রইলাম।

মুকুর্থি জাতীয় উদ্যান

মুকুর্থি জাতীয় উদ্যানের ব্যাপারে সব থেকে সাড়া জাগানো খবর হলো এ বছরের জুলাই মাসের শুরুতে এই সংরক্ষিত বন ইউনেসকোর বিশ্ব হেরিটেজ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। যার অর্থ হলো এই এলাকায় বন সংরক্ষণের কাজ আরও জোরদার হবে। এই বনের মূল সমস্যা হলো ঘাস জমি কমে যাওয়া। তামিলনাড়ু রাজ্যের বনাধিকারিকরা সে সমস্যার মোকাবিলা যথাযথভাবে করে চলেছেন বলেই আজ মুকুর্থি জাতীয় উদ্যান বিশ্ব হেরিটেজ এলাকার তকমা পেয়েছে।

নীলগিরি মালভূমির পশ্চিমকোণে উধাগামণ্ডলম বা উটির পশ্চিমে তামিলনাড়ু রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম কোণে পশ্চিমঘাট পর্বতের মাথায় এই বন অবস্থিত ৭৮.৪৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে। নীলগিরি বায়োস্ফিয়ার অঞ্চলের অন্যান্য অংশের মতো এখানেও সমস্যা ছিল আসবাবের জন্য চাষ করা কাষ্ঠল গাছের আবাদে বা কাগজকলের জন্য চাষ করা গাছেদের আবাদে প্রাকৃতিক বনের ধ্বংস হয়ে যাওয়া। তার ওপর এখানে জ্বালানি কাঠের জন্য ওয়াটেল নামে চারটে আলাদা আলাদা জাতের গাছের চাষ করা হয়েছিল ১৮৪০ থেকে ১৮৫৬ সালের মধ্যে। ১৮৪১-এ কাটাই শুরু হয় আসবাবের উপযোগী স্থানীয় গাছপালারও, মানে শোলা বনের গাছপালার। ১৮৬৮ সাল নাগাদ কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে যে যথেচ্ছ চিরহরিৎ শোলা বন কেটে ফেললে সেই বনের ওপর নির্ভরশীল অন্যান্য গাছপালা, জন্তুর বিলোপ অবধারিত। সে জন্যই মুকুর্থির বনকে জলদি সবুজ করে ফেলার জন্য ১৮৮২ সাল নাগাদ সিলভার ওয়াটেল নামে এক বিদেশি গাছে ছেয়ে দেয়া হল, মনে করা হলো শোলা বনের অভাব আর টের পাওয়া যাবে না।

কিন্তু বাস্তুতন্ত্রে শোলার জায়গা সিলভার ওয়াটেল নিতে পারে না। মুকুর্থির বনের সব থেকে নিচু এলাকা সমুদ্রতল থেকে ১৫০০ মিটার উঁচুতে আর সবথেকে উঁচু এলাকা ২৬২৯ মিটার উঁচুতে। এখানে প্রচুর বৃষ্টি পড়ে, হাওয়া চলে আর ঠান্ডা প্রায় বরফ জমার মতো। ফলে এখানে মূলত ঘাসজমি থাকার কথা ছড়িয়ে ছিটিয়ে যার মাঝে মাঝে থাকার কথা ঘন সবুজ শোলা বন। এই সব গাছ আর ঘাসের আশ্রয়ে থাকা জীবজন্তুরা নিজেরা টিঁকে থাকার সাথে সাথে টিঁকে থাকতে সাহায্য করে ঘাসজমি আর শোলা বনকে। শোলাবন আর ঘাসজমি মাটি ধরে রাখে পাহাড়ের গায়ে, ফলে বৃষ্টির জল গভীর মাটির মধ্যে চুঁইয়ে যায়, বন্দি হয়ে থাকে। সেই জন্যই পশ্চিমঘাট পাহাড়ের মাথা থেকেই দক্ষিণ ভারতের বা ভারতীয় উপদ্বীপের সমস্ত নদী তৈরি হয়েছে আর বয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু সিলভার ওয়াটেল শোলাবনের জায়গা নিতে জীবজন্তুরা একে একে মুকুর্থি ছেড়ে যেতে লাগল। ফলে ঘাসজমি বা শোলাবনের ফিরে আসার সম্ভাবনাও কমে যেতে লাগল। তাছাড়া ঘাসজমির টিকে থাকার পথে প্রধান বাধা ছিল চার রকমের ওয়াটেল। ওয়াটেল গাছ বনসৃজনের জন্য বাছা হয়ে ছিল এই জন্যই যে একবার লাগিয়ে দিলে এ গাছের শিকড় থেকে মালার মতো নতুন নতুন গাছ গজাতে থাকবে। বার বার বীজ বোনার বা চারা পোঁতার দরকার হবে না। বন আপনাআপনি বাড়তে থাকবে। বন বানাবার এই সস্তা আর সহজ পদ্ধতিতে ওয়াটেল দখল করে নিয়েছে শোলাবনের জায়গা, ধীরে ধীরে একশো বছরের বেশি সময় ধরে।

আর এখনও মুকুর্থির ঘাসজমি টিকিয়ে রাখার পথের বাধা ওয়াটেলের শিকড়, যা ঘাসজমিকেও গিলে খাচ্ছে প্রায়। বনবিভাগ রোজরোজ যুদ্ধ করে চলেছে ওয়াটেলের সাথে, নতুন গাছ দেখা গেলেই উপড়ে ফেলা হয় তার শিকড়। তার মানে দাঁড়াল গাছ লাগানোর জন্য যা হোক একটা গাছ লাগিয়ে দিলেই হয় না, পরিবেশের উপযোগী গাছ লাগাতে হয়, না হলে বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস হয়ে যায়।

মজার কথা হলো আইন করে মুকুর্থির বন সংরক্ষণের শুরু ওয়াটেলের বন তৈরি করেই। ১৮৮২ সালে এই বনকে সংরক্ষিত বনের তকমা পরানো হয়েছিল বলেই গাছ কাটা বন্ধ করে ওয়াটেল পোঁতা শুরু হয়েছিল এখানে। পরে ১৯২০ সালে শোলা গাছ উপড়ে ওয়াটেল লাগানো হয়েছিল কারণ কেটে ফেললেও এই গাছ নিজে থেকে গজিয়ে বনকে ঘন করে রাখতে পারে। ফলে ক্রমশঃ বেড়ে চলল জন্তু জানোয়ারদের দুর্ভোগ। সে কথা প্রথম জানা গিয়েছিল ১৯৭০-এর দশকে, বিভিন্ন জীববিজ্ঞানির গবেষণায়। ভারতীয় ও বিদেশি বৈজ্ঞানিকদের মিলিত গবেষণায় চিহ্নিত হয় যে নীলগিরি তাড় নামের ছাগল জাতীয় জন্তুই নীলগিরির বাস্তুতন্ত্রের ধারক। ইংরেজিতে বলা হয় কি-স্টোন স্পিসিস। একটা তোরণের মাঝামাঝি যে পাথরটা থাকে সেটা আকারে বা ওজনে বদলে দিলে পুরো তোরণ ভেঙে পড়ে বলে তাকে কি-স্টোন বলে। সেরকমই একটা বাস্তুতন্ত্রের যে প্রজাতি লুপ্ত হলে পুরো বাস্তুতন্ত্রই ধ্বংস হয়ে যায় অর্থাৎ বাকি সব

গাছপালা, জন্তু লুপ্ত হয়ে যায় তাকে ঐ বাস্তুতন্ত্রের কি-স্টোন স্পিসিস (স্পিসিস = প্রজাতি)বলে। নীলগিরি তাড় কখনও শোলা বনের চিরহরিৎ গাছ খায় না। ফলে তারা চিরহরিৎ বন বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে। আবার ঘাস আর গুল্ম খেয়ে চিরহরিৎ বনের গাছেদের জন্য সার ও জলের যোগান বাড়িয়ে দেয়। এইভাবে প্রত্যক্ষভাবে শোলা বনের সংরক্ষণ করে নীলগিরি তাড় আসলে পরোক্ষভাবে ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ বাড়ায়। তাই নীলগিরি তাড়ের মূল বাসভূমি মুকুর্থিকে ১৯৮২ সালে অভয়ারণ্য করে দেন ভারত সরকার। তবে এই মূহুর্তে মুকুর্থিতে তাড়ের সংখ্যা চারশোর আশে পাশে। তার কারণ শিং-এর জন্য প্রায়ই পরিণত বয়সের পুরুষ তাড়কে শিকার হতে হয় মানুষের হাতে। তবে মুকুর্থিতে পাহারাদারি বাড়ানোয় শিকারের ঘটনা কিছুটা কমেছে। তামিলনাড়ু রাজ্যের রাজ্যপ্রাণী হলেও নীলগিরি তাড় সবথেকে বেশি পাওয়া যায় কেরালার এরাবিকুলাম জাতীয় উদ্যানে।

শোলাবনের গাছ ছাড়াও এখানে বিভিন্ন ধরনের রডোডেন্ড্রন, রিঠা, চাঁপা, এবং নানা ফুলের গাছ পাওয়া যায়। তার মধ্যে আছে গোলাপ জাতীয় নানা গুল্ম। তাড় ছাড়াও নানা বিপন্ন প্রাণীর দেখা মেলে এখানে। তাদের মধ্যে রয়েছে এশিয়ার হাতি, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, ভোঁদড়, মুনজ্যাক, মাউস ডিয়ার, নীলগিরি মার্টেন, নীলগিরি লাঙ্গুর, চিতা, বনেট বাঁদর, সাম্বার, গন্ধগোকুল, বাঘরোল, ঢোল, শেয়াল, নানা জাতের ইঁদুর। পাখিদের মধ্যে প্রধান হলো পায়রা, বুলবুল, নানা ধরনের ফ্লাইক্যাচার, থ্রাশ, খঞ্জন, চিল, প্যাঁচা, ঈগল ইত্যাদি। আরও আছে নানা জাতের সাপ, ব্যাঙ, প্রজাপতি আর পোকামাকড়।

ছবিঃ সংগৃহীত

বনের ডায়েরি

কেনেথ অ্যান্ডারসনের গল্প

অদিতি ভট্টাচার্য

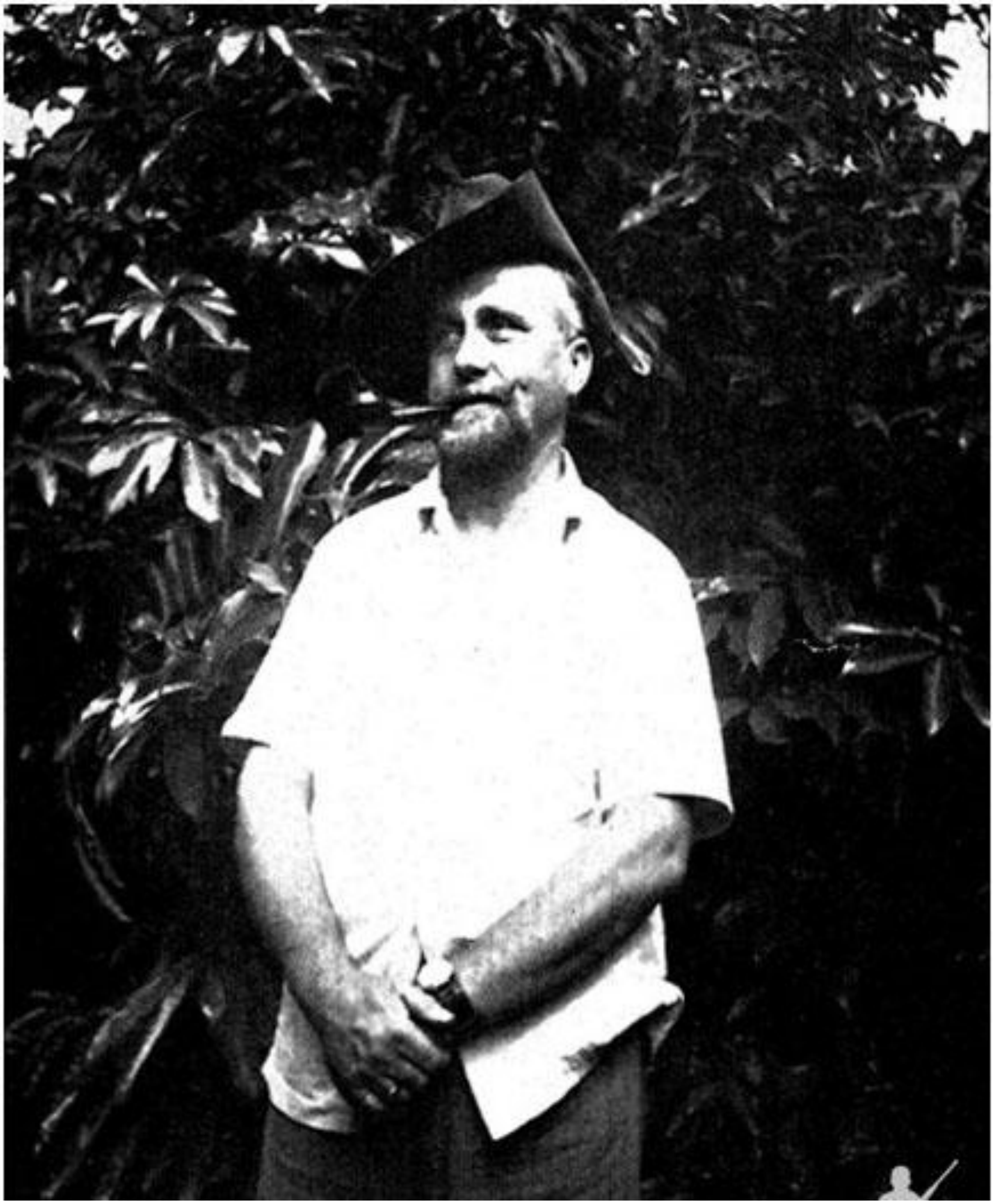

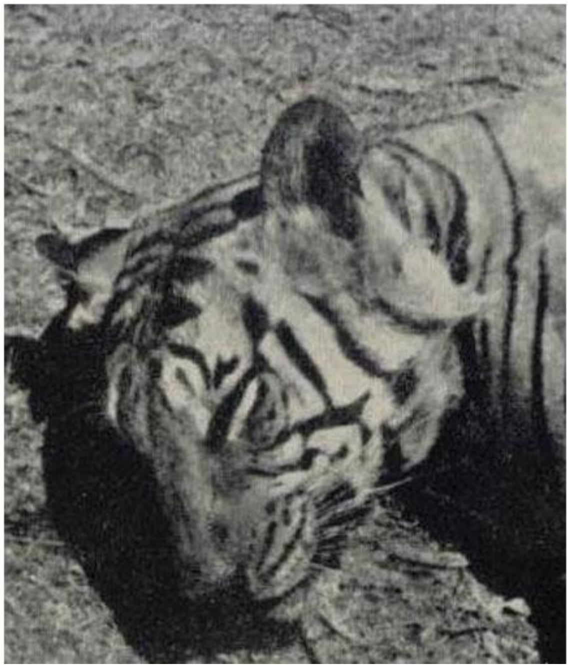

অনেক বছর আগেকার কথা। দক্ষিণ কর্ণাটকের গুম্মালাপুর গ্রামে হঠাৎই এক চিতাবাঘ হানা দেওয়া শুরু করল। ওই গ্রাম এবং আশেপাশের অঞ্চলে সে এক এক করে বিয়াল্লিশ জনকে মেরে ফেলল। অবস্থা এমনই দাঁড়াল যে গ্রামবাসীরা সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের ঘরের মধ্যে বন্দি করে ফেলত। সন্ধ্যের পর ঘরের বাইরে যাওয়ার কথা কেউ ভাবতেই পারত না। এই সাংঘাতিক মানুষখেকোকে শায়েস্তা করার জন্যে ডাক পড়ল কেনেথ অ্যান্ডারসনের। কিন্তু তাঁর পক্ষেও সহজ হয়নি ব্যাপারটা। তিনবারের চেষ্টায় তিনি শেষ পর্য্যন্ত মারতে পারেন চিতা বাঘটাকে।

কেনেথ অ্যান্ডারসন মানেই রোমহর্ষক সব শিকারের কাহিনী, মানুষখেকো বাঘের হাত থেকে গ্রামবাসীদের বাঁচানোর কাহিনী। শুধু বাঘ, চিতা বাঘ কিংবা প্যান্থারই নয়, তিনি কিছু পাগলা হাতিও মেরেছিলেন। ১৯৩৯ থেকে ১৯৬৬ পর্য্যন্ত তিনি মোট আটটা মানুষখেকো চিতাবাঘ (যার মধ্যে সাতটা পুরুষ ও একটা স্ত্রী), পাঁচটা বাঘ এবং দুটো বাঘিনী মারেন। যদিও জনশ্রুতি এই যে তিনি প্রায় গোটা কুড়ি প্যান্থার এবং তারও বেশি বাঘ মেরেছিলেন। অ্যান্ডারসনের শিকার সবই ছিল দক্ষিণ ভারতের বন জঙ্গলে যেমন অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, কেরালা ইত্যাদি অঞ্চলে।

কেনেথ অ্যান্ডারসনের (১৯১০ – ১৯৭৪) জন্ম এমনই এক স্কটিশ পরিবারে যাদের ভারতে বসবাস ছ'পুরুষ ধরে। তাঁর বাবা ডগলাস স্টুয়ার্ট অ্যান্ডারসন পুণার এফ সি এম এ –এর সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন যাঁকে মিলিটারিতে কর্মরত ব্যক্তিদের বেতন সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো দেখতে হত। সাম্মানিক ক্যাপ্টেন পদের অধিকারী ছিলেন তিনি। বাঘ শিকার না করলেও শিকারের নেশা তাঁরও ছিল। রাইফেল নিয়ে তিনি প্রায়ই হাঁস শিকার করতে যেতেন। কেনেথের জীবনে তাঁর বাবার প্রভাব যথেষ্ট ছিল। কেনেথ অ্যান্ডারসনের স্কুল ও কলেজ জীবন কাটে ব্যাঙ্গালোরে। বিশপ কটন বয়েজ স্কুল এবং সেন্ট জোসেফ'স কলেজে তিনি পড়াশোনা করেন। এরপর ব্যাঙ্গালোরেরই ব্রিটিশ এয়ারক্রাফট ফ্যাক্টরিতে ফ্যাক্টরি ম্যানেজার পদে যোগদান করেন। তাঁর লেখা বইতে পাওয়া তথ্য অনুসারে কর্ণাটক, হায়দরাবাদ, তামিলনাড়ুতে তাঁর প্রায় দুশো একরের কাছাকাছি নিজস্ব জমি ছিল।

বন এবং বনের বাসিন্দাদের প্রতি বরাবরই তাঁর এক অদম্য আগ্রহ এবং ভালোবাসা ছিল। বনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে এবং সেখানে সময় কাটাতে তিনি প্রায়ই গভীর বনে

যেতেন একা এবং নিরস্ত্র অবস্থায়। এই ভালোবাসা থেকেই গ্রামবাসী এবং বনে বসবাসকারী উপজাতির মানুষদের মানুষখেকো জন্তুদের হাত থেকে মুক্তি দিতে তাঁর শিকারী হয়ে ওঠা। কানাড়া, তামিল ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত এই মানুষটির সঙ্গে নানান উপজাতির লোকেদের অবাধ মেলামেশা ছিল। ভয়ংকর সব জন্তু জানোয়ারের খবর এরাই অনেক সময় তাঁকে দিত। তাঁর করা বিখ্যাত শিকারগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মাইশোরের স্লথ বেয়ার, গুন্মালাপুরের চিতা বাঘ, ইয়েলাগিরি পাহাড়ের চিতা বাঘ, জয়লাগিরির বাঘিনী, সেগুরের বাঘ ইত্যাদি। শিকারের জন্যে তিনি ব্যবহার করতেন .405 উইনচেষ্টার 1895 মডেলের একটি রাইফেল। শুধু শিকার নয় দক্ষিণ ভারতে বন্য প্রাণী সংরক্ষণের একজন পথিকৃৎ ছিলেন তিনি। নিপার নামে তাঁর একটি কুকুর ছিল। এই নিপার একবার তাঁর প্রাণ রক্ষা করে।

শিকারের কাহিনী এবং তৎকালীন ভারতের বন ও বন্যপ্রাণীর ওপর লেখা তাঁর অনেকগুলো বই আছে। সহজ, স্বচ্ছন্দ ভাষায় তিনি শুধু বাঘ, চিতা বাঘ শিকার বা বাইসন, ভাল্লুক, হাতি ইত্যাদির সঙ্গে তাঁর অ্যাডভেঞ্চারের কথাই লেখেন নি অন্যান্য বন্যপ্রাণী যেমন বুনো কুকুর, হায়না, সাপ এদের স্বভাব, প্রকৃতি এসবও বর্ণনা করেছন। সেই সময়কার বনে বসবাসকারী নানা উপজাতির মানুষদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে তাদের বেঁচে থাকার কৌশল এসবের এক জীবন্ত দলিল তাঁর বইগুলো। নিম্নমানের রাস্তাঘাট, দুর্বল স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার কথাও তাঁর লেখায় স্থান পেয়েছে। শিকার ছাড়াও ছবি তোলার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল।

কেনেথ অ্যান্ডারসনের লেখা যথেষ্ট জনপ্রিয় বইগুলো নিয়ে সম্প্রতি দুটো অমনিবাস প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লেখা বইগুলো হল, নাইন ম্যান ইটারস অ্যাণ্ড ওয়ান রোগ (১৯৫৪), দ্য ব্ল্যাক প্যান্থার অফ শিভানিপাল্লি অ্যাণ্ড আদার অ্যাডভেঞ্চারস অব দ্য ইণ্ডিয়ান জাংগল, জাংগলস্ লং এগো, ম্যান ইটারস অ্যাণ্ড জাংগল কিলারস্, টাইগার রোরস্, টেলস ফ্রম দ্য ইণ্ডিয়ান জাংগল, দিস ইস দ্য জাংগল, দ্য কল অব দ্য ম্যান ইটার।

ভিনগ্রহের ট্রেন

রতনতনু ঘাটী

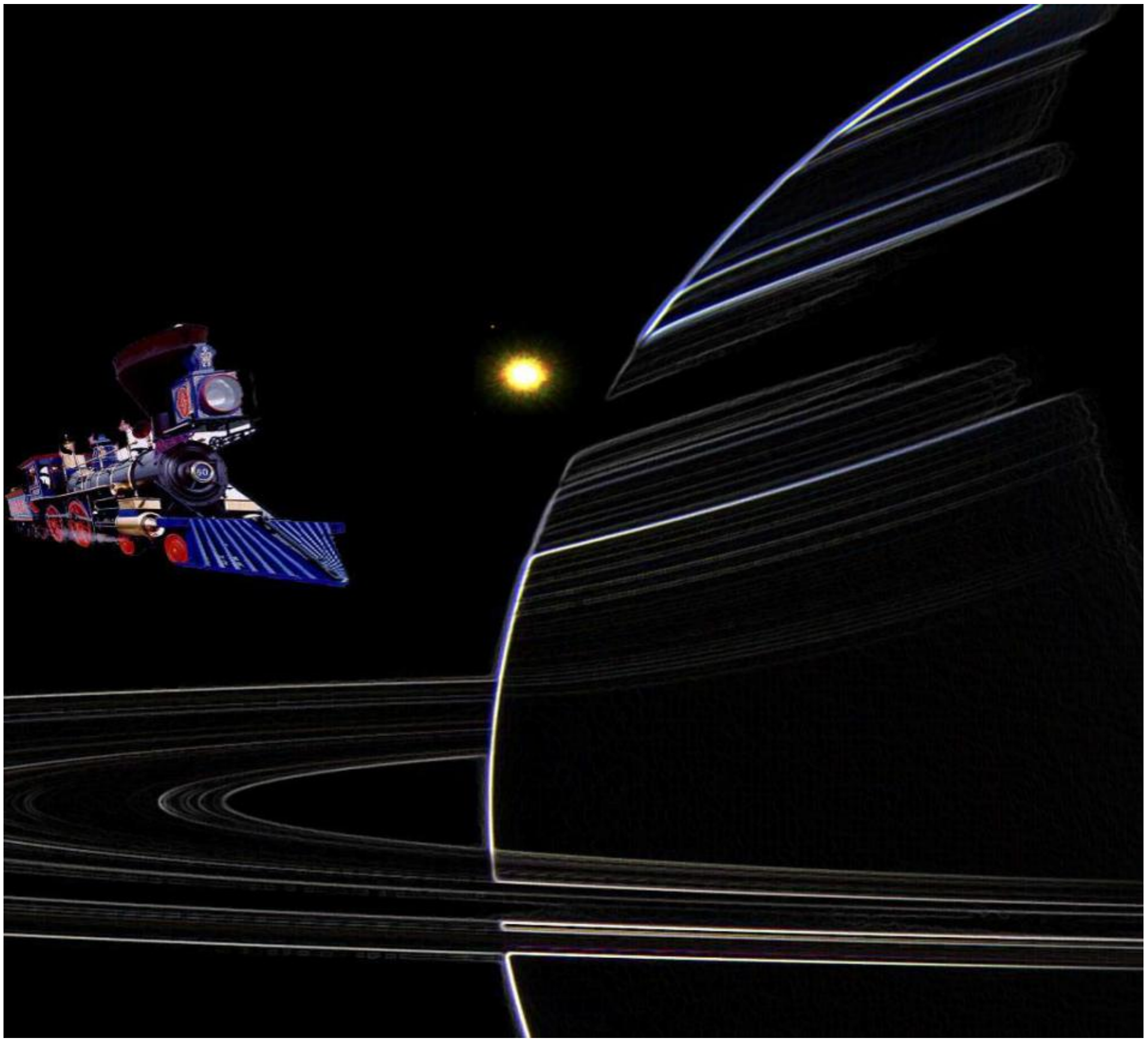

বারবার ফেল করে হাবু বসে ভাবে
সবকিছু ছেড়েছুড়ে ভিনগ্রহে যাবে।
রাগ করে নয় মোটে শুধু অভিমানে
একা সে দেখিয়ে দেবে সেও কিছু জানে।
বিজ্ঞানে কতভাবে নাম করা যায়
দেখবে হিসাব কষে, আকাশ কী খায়?
জ্যোৎস্নায় দেখবে সে হরোলজি নিয়ে
মাছেরা ঘুমায় কেন ঢেউ চাপা দিয়ে?

সাপ কেন কালো রঙ দেখে আড়ে আড়ে
চুপিচুপি দেখবে সে ক্যালরিমিটারে।
এর পরে ঠিক তার পড়ে যাবে মনে
শুকোবে চাঁদের নদী ডিহাইড্রেশনে।
নামডাক হবে বটে, মাথা ঘোরে তার
একটি জটিল কথা ভেবে বারবার।
কোন পথে যাওয়া যায় সোজা ভিনগ্রহে?
ট্রেন পাবে হাওড়ায় না শিয়ালদহে?

ছবিঃ ইন্দ্রশেখর

চিলেকোঠার বাসিন্দারা

আবু হোসেন

আমাদের মেসবাড়ি কলেজ পাড়ায়। সারি সারি ঘরে কত লোক আসে যায়। (শুধু) তালা দেয়া তেতলার চিলেকোঠাখানা। ওই ঘরে এ বাড়ির কারো যাওয়া মানা। কেন জানো?

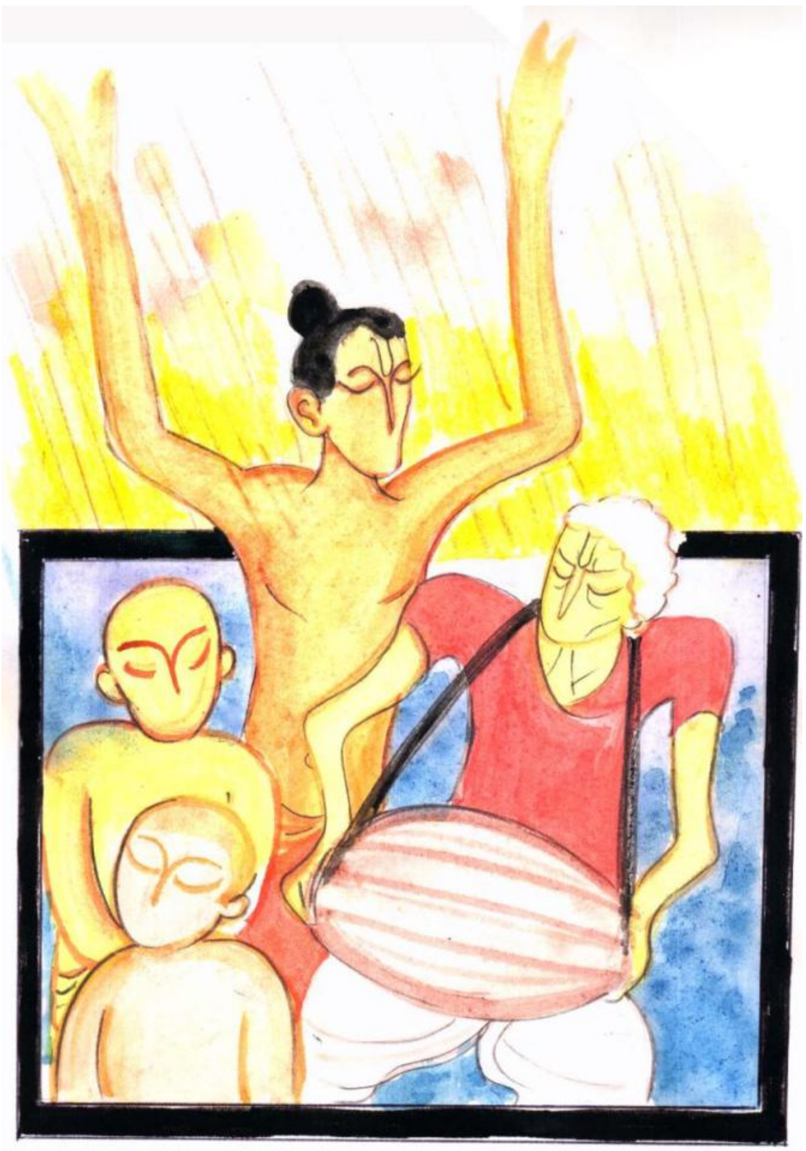

তেতলার চিলে ঘরে
পুবের দেয়াল জুড়ে
যেইখানে আলো খুব কম
সেখানে দেয়ালে সাঁটা
(ঘষা কাচ। ফ্রেম ফাটা)
ছবিটিতে বাস করে চার বোষ্টম।
একজন পাকাচুলো, লাল জামা গায়
একমনে বসে বসে শ্রীখোল বাজায়
চুড়োবাঁধা কালোচুল আরো এক জন
চোখ বুঁজে হাত তুলে করে কীর্তন
বাকি দুই, বেঁটে খাটো পরণে গেরুয়া
বসে বসে মাথা নেড়ে ধরে যায় ধুয়া
দিনমানে সাদা চোখে থেমে থাকে সবই
চার বোষ্টম মিলে একখানা ছবি
সূর্য ডুবলে পরে যেই আসে রাত
সবাই ঘুমিয়ে গেলে তখন হঠাৎ
পাকাচুলো বোষ্টম মাথাখানা নেড়ে
খোল হাতে উঠে আসে ঘষা কাচ ছেড়ে
চাটিম চাটিম বোল বাজে গম গম
ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে তিন বোষ্টম
দূর থেকে শোনা যায় তেতলার ছাদে
কারা যেন গান গায় হরি হরি রাধে
রাত কেটে সকালের আলো ফোটে যেই
থেমে যায় গান, কেউ কোথাও নেই!
লোকজন ভরা বাড়ি করে গম গম,
ছবি হয়ে জেগে থাকে চার বোষ্টম।

গড়িয়ে হাঁটা

হীরক সেন

তিনসুকিয়ার তিন বুড়োতে
গড়িয়ে চলে গড়িয়া-
বারাসাতের সাত ছোকরা
পথে তাদের ধরিয়া
বললো, 'দাদু হাঁফিয়ে গেলে
দম নিও দমদমে...
কিম্বা, যদি পায় গো খিদে
নেইকো কোনও অসুবিধে-
মুরগীহাটায় মুরগীর ঝোল
খেয়ে নিও কম দামে'।
তিন বুড়োতে ফোকলা হেসে
জানিয়ে দিল একটু কেশে-
'গড়িয়ে চলায় কষ্ট হ'লে
করবো শুরু হাঁটা,
গড়গড়িয়ে নাইবা গিয়ে
পথও একটু কমিয়ে নিয়ে,
কিছু গড়িয়ে কিছুটা হেঁটে
থামব গড়িয়াহাটা'।

ছবিঃ অমৃতা

বিদ্যাধরী

জামাল ভড়

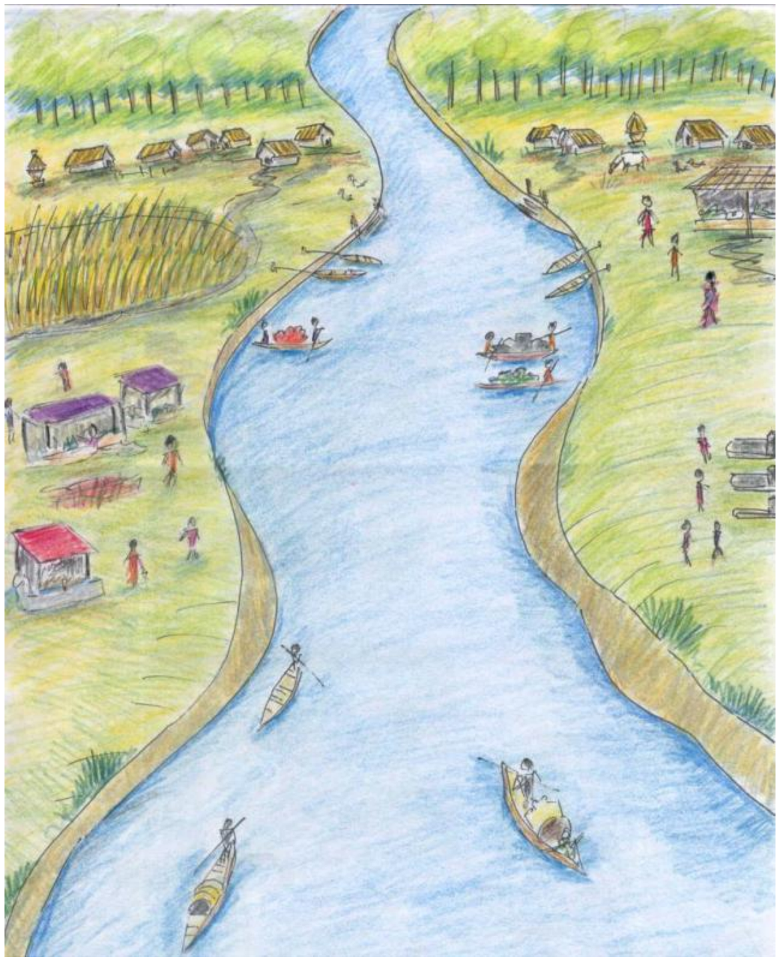

ছোট্ট-নদী এঁকেবেঁকে চলছে গাঁয়ের পাশে
বিদ্যাধরী নামেই তাকেই সবাই ভালবাসে
সরস্বতীর আশীর্বাদে নামটি পেলে বুঝি
সে কথাটাই শুধাই আমি তোমায় সোজাসুজি ;
তোমার তীরেই সবুজগাঁয়ে গাছগাছালি ভরা
তোমার পারেই দূরে দূরে গাঁওগুলি দেয় ধরা ;
রাস্তা গাঁয়ের তোমার বুকেই বাহন তাদের নায়
সব্জিভরা নাওটি নিয়ে এপার-ওপার যায় ;

মাছের বাজার ধানের আড়ত তোমার পাশেই হাটে
বিচলি-বোঝাই নাওগুলি সব বাঁধা তোমার ঘাটে
ফাল্গুনের ওই প্রথম দিকে তোমার পাশেই মেলা
পিরের মাজার ফুলের বাজার ভক্তি-ভরে খেলা ;
জোয়ার-ভাঁটায় বাড়ে কমে তোমার বুকে জল
ভরাকোটাল মরাকোটাল দু`পাড়ে টলমল
বিদ্যাবতী সরস্বতী বিদ্যাধরী মোর
তোমার আমি আমার তুমি চিরজনমভর ।

ছবিঃ সোমা

অদল বদল

লীনা ভট্টাচার্য

পড়তে বসে ভানু দেখে,
ভূগোল বইটা খালি.
প্যাসিফিক শুকিয়ে আছে:
মরুভূমির বালি.
হিমালয় হারিয়ে গেছে,
পাত্তাও নেই তার.
আমাজন ফরেস্ট
কে করেছে ছারখার!
গ্রিনল্যান্ড এ আম জনতা
ভিড় করেছে খুব.
মাউন্ট এভারেস্ট জলের তলায়
মেরেছে যে ডুব!

নায়াগ্রা আর করেনা •ফল•,
ভলকানো সব স্থির,
টিউবওয়েলটা অচল তবু
লক্ষ কোটির ভিড়!
খুব গরমে মানুষে আর
করতে না'রে বাস,
এই না দেখে ভানু গেল
পড়তে ইতিহাস.
বদলে যাবে সকল কিছু,
শুকিয়ে যাবে নীর,
থাকবে শুধু কুরুক্ষেত্র,
ঢাল তলোয়ার তির

ছবিঃ অনুপম

অদ্ভূতুড়ে

অমিতাভ প্রামাণিক

বাইশ তারিখ সন্ধেবেলায়
হাটখোলার ঐ গাছের তলায়
পাঁচটা ভুতের শ্রাদ্ধ হলো।
চারটে কোরাস, একটা সোলো।
ভুতগুলো সব গাইলো খেয়াল।
চারশো কুকুর, দেড়শো শেয়াল
যোগ দিলো সেই ফাংশনেতে।
তারপরে সব বসলো খেতে।
ভোজনরসিক শাকচুন্নি —
তার বিড়ি চাই, আর শিন্নি।
পুৎপুতে ঐ মামদোগুলো
সাবড়ে দিলো পথের ধুলো।
পেত্নীবুড়ির মাজায় ব্যথা,
খাচ্ছিলো ঘর মোছার ন্যাতা।
বেম্মো ব্যাটার বেজায় নোলা,
কপকপিয়ে খায় আরশোলা।
খাওয়ার মাঝে বায়না ধরে
খেলতে যাবে সে শিলচরে।
ক্রিকেট ব্যাট আর মোম দেশলাই
সঙ্গে নিয়ে সে প্রেমতলায়
রওনা দিলো গটগটিয়ে,
গৌহাটিতে করলো বিয়ে।
এই না শুনে ভুতের জ্যাঠা
বললো, ব্যাটা এমন ঠ্যাঁটা!
নিয়ম কানুন নেই জগতে?

যা, মুভি দ্যাখ নাইট শো'তে।
ক্যাট্রিনা আর রিতিক রোশন
কেমন করে লাগায় লোশন
চুলকুনি আর বেজায় দাদে,
উড়ায় পতং বাসের ছাদে।
মামদো বলে, জ্যেষ্ঠতাত –
দাদ না ওটা, শুকনো ঘা তো।
যেই না বলা, একটি ঘায়ে
মুন্ডুটা তার পড়লো বাঁয়ে।
মৃত্তিকা টাচ করার আগে
সেই গোলোকে ভীষণ রাগে
ঝাড়লো কে এক দারুণ লাথি;
মুন্ডু গিয়ে পড়লো কাঁথি!
লাইন দিয়ে কিনতে চিনি
হাজরাখুড়ি মাতঙ্গিনী
দাঁড়িয়ে ছিলো রেশন শপে;
ছিন্ন বসন, কী ধপধপে!
তার ব্যাগেতেই পড়লো গোলা,
তাই নিয়ে যে কী জলঘোলা!
পূবপাড়ার এক পুরুতমশাই
বলল, এরা সং না কষাই?
এই না বলে মন্ত্র পড়ে
পৈতেতে টান দিলেন জোরে।
অমনি অবাক! ভূতের মুড়ো
এক নিমেষেই কী ঝুরঝুরো!
সেই গুঁড়োতে মিশিয়ে জিরে
ডুবিয়ে দিয়ে উষ্ণ ক্ষীরে
মাখিয়ে নিয়ে আধলা ইঁটে
তৈরী হল ভূতের পিঠে!
শ্রাদ্ধশেষে এটাই বিধান –
এই পিঠেতেই যে পিন্ডদান!

ছবিঃ সৌভিক

লিমেরিক

তরুণ সরখেল

লিমেরিক ১

ঘোর বর্ষায় ধান ক্ষেতের এক আলে
অবনী ঘোষ মিহিন সুতোর জালে
চুনোপুঁটি ধরবে বলে এসে
জালখানাতে নিজেই গেল ফেঁসে
এবং শেষে পড়ল সটান খালে।

লিমেরিক ২

শিবু আংকেল গান ধরেছেন সন্ধ্যারাতে
এমন সময় ভূতের ছোঁয়া পেলেন হাতে
ভূতটা বলে ওরে শিবেন
জলদি করে আয় নিয়ে পেন
গানটা লিখে দে না আমায় খাতার পাতে!

ছবিঃ সোমা ও সংগৃহীত

ঠাণ্ডা গরম

সুবীর বোস

কুনো ব্যাঙ - ভীষণ গরম তবুও যেন শান্ত কেমন ভোর
অশত্থ কি বন্ধু নাকি ওর!
নইলে কেন গাছের পাতায় তীব্র রোদের খেলা
শান্ত অমন — বলছে ডেকেআয় না রে এই বেলা ,
দু'চারটে ঘাস জমিয়ে রাখি
যেমন জমায় বাবুই পাখি
তারপরে নয় উল্টো করেই খুঁজব সব উত্তর।

সোনা ব্যাঙ - বলিস কি রে উল্টো করে দেখব খেলার মাঠ
তুই কি ভাবলি এই পৃথিবী শুধুই ভূগোল পাঠ -
ভোর পেরিয়ে এক সে রাতে
পৌঁছে গেলে বরফপাতে
দেখতে পাবি এস্কিমোরা উল্টানো গামলাতে
উল্টো বসেই গল্প করছে শব্দকে সামলাতে -
বুঝলি কিছু— প্রতিধ্বনি ওরাও বোঝে ? আমরা দেখাই ঠাঁট।

কুনো ব্যাঙ - হচ্ছিল এক ভোরের কথা আনলি ডেকে রাত
শীতের সঙ্গে বরফ জুড়ে ভাবলি গরম কাৎ
ঠান্ডা— গরম- জ্ঞান না হারাই
তুই বা কেমন বদ্যিমশাই
গ্রীষ্মদিনে কি আনন্দ শোনাস বরফপাত!

সোনা ব্যাঙ - জ্ঞানের কথা বললি যখন এবার তবে শোন
অজ্ঞানও জ্ঞান বোলতা রানি বলতে চায় এমন
হুলের ছোঁয়ায় মাকড়শারা
অজ্ঞান তাও টাটকা তারা
তৈরি খাদ্য 'সদ্যজাত বোলতা শিশু কে ক -টা খায় গোন।

কুনো ব্যাঙ - প্রণাম কাকা — কী শোনালে এ দিল মাঙ্গে মোর ,
সোনা ব্যাঙ - আজকে চলি — খুঁজতে হবে অনেক সে উত্তর।

ছবিঃ মৌসুমী

শিশিরপাত

সুকুমার বাগচি

শিশিরবাবু সকালবেলা শিশির নেবেন বলে
যেই খুলেছেন শিশির ছিপি
ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে
দৈত্য-দানোর প্রাচীন লিপি।
সঙ্গে তেড়ে আসেন
আগুনচোখে ঝিলিক দিয়ে তুখোড় রৌদ্রবাবু,
তা-ই না দেখে দূর্বাদেবী
মুখ লুকিয়ে হাসেন।

শিশিরবাবুর মাথায় হাত
শিশির গুমোর কুপোকাত
সকালবেলার শিশির কেন মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে
শিউলিপাতার চুমো খেয়ে
করছে কেবল অশ্রুপাত?

ব্রায়ান জেনকিন্স ও তাঁর স্কুল

উমা ভট্টাচার্য

সেদিন বাড়িতে মহা আনন্দ। ছেলেমেয়েরা আনন্দে সারাদিন খইয়ের মত ফুটছে। রান্নাঘরেও ধুন্ধুমার কাণ্ড চলছে। ভাজা, বড়া, ইলিশ মাছ, মুড়িঘণ্ট, মাংস, চাটনি, আরও কত কি রান্না হচ্ছে! আজ পিসেমশাই পিসিমারা আসছেন তামিলনাড়ু থেকে। বিলেত থেকে ফিরে ওঁরা আর কলকাতাতে আসতে পারেননি। আজ প্রায় তিন বছর পরে আসছেন। সঙ্গে আসছে তিন ছেলেমেয়ে। ওদের এখন একমাস ছুটি। থাকবে আমাদের বাড়িতে।

প্লেন লেট করাতে পিসিমাদের আসতে প্রায় বিকেল হয়ে গেল। ফ্রেশ হয়ে খাওয়া দাওয়া সারতে প্রায় সন্ধে। সবাই গল্পগাছা করতে করতেই ঝপ করে অন্ধকার হয়ে গেল।

লোডশেডিং। সবাই রেগে কাঁই। লোডশেডিং নিয়ে নানান মন্তব্য হতে লাগল চারপাশে। পিসেমশাই জানলা দিয়ে বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এবার বলতে লাগলেন এক আশ্চর্য মানুষ আর অন্ধকারের বিরুদ্ধে তাঁর সফল লড়াই এর কাহিনি।

শুরু হয়েছিল ১৯৬৯ সাল থেকে এই ভারতে। আজ তা চূড়ান্ত সফল। মানুষটির একক প্রচেষ্টায় ও অর্থে কোদাইকানালের পিলানি হিলস-এর মাথার ওপর একটা বিচিত্র স্কুল গড়ে উঠেছে। নাম "শোলাই স্কুল।"

স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রিন্সিপাল হলেন সমাজ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী ব্রায়ান জেনকিন্স। জন্ম ইংল্যান্ডে। ২ বছর বয়সে বাবাকে হারান।অবস্থা অতি সাধারণ ছিল। সঙ্গীসাথী বিশেষ ছিলোনা। মা উপার্জনের জন্য ব্যস্ত থাকায় দিনের বেশির ভাগ সময়ই কাটতো একা একা , সুন্দর প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে, ফুল, পাখি ,গাছপালা দেখে।

স্কুলের পড়াশোনা শেষ হবার পরে মায়ের অনুমতি নিয়ে বেরোলেন অন্য দেশের মানুষের অবস্থা দেখতে। প্রথমে গেলেন কেনিয়ায়। এখানেও দেখেন সাধারণ মানুষের অবস্থা খুবই করুণ। সেখানে একটি স্কুলে তিনি ২ বছর শিক্ষকতাও করলেন। শিক্ষকতা করতে করতেই মনে হল, মানুষের জন্য সত্যিকারের কিছু করতে হলে নিজের জ্ঞানের পরিধি বাড়ানো দরকার। দেশে ফিরে গেলেন। ভর্তি হলেন সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিষয় সামাজিক নৃতত্ত্ব। উদ্দেশ্য মানুষের উৎপত্তি ও সামাজিক বিকাশের বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা। এইসময় তিনি দেখা পান এক ভারতীয় গুরুর, যার কাছে শোনেন ভারতের মানুষের কথা। ডিগ্রি নেবার পর জেনকিন্স চলে আসেন ভারতে। প্রথমেই গেলেন বুদ্ধগয়ায়। এক বছর থাকলেন সেখানে। তারপর ভারতের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।সিংহল ও নেপালেও গেলেন ,আবার চলে এলেন ভারতে। ততদিনে কী করবেন তার একটা ছক তৈরি হয়ে গেছে মাথায়। দরকার শুধু উপযুক্ত জায়গার। অন্ধ্রপ্রদেশ আর তামিলনাড়ুর প্রায় ৭০০০ কিঃ মিঃ জায়গা তিনি ঘুরে বেড়ালেন সুন্দর নির্মল প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বেশ খানিকটা জায়গা আর আত্মস্বার্থবোধহীন কিছু ভালো মানুষের খোঁজে যারা তাঁকে তাঁর পরিকল্পনার বাস্তব রূপ দিতে সাহায্য করবেন। অবশেষে দুইই পাওয়া গেলো। পিলানি হিলস-এর ওপর প্রায় ১১৫০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত সবুজের সমারোহের মধ্যে প্রায় ১০০একর জায়গা নিয়ে স্থাপন করলেন তাঁর স্বপ্নের কারখানা, শোলাই স্কুল।

শোলাই ইশকুলে লোডশেডিং হয়না। সরকারি বিদ্যুৎ সরবরাহের কোন লাইন তারা নেয়নি এখানে। সামান্য খরচে নিজেদের বুদ্ধি আর শ্রম দিয়ে প্রকৃতির নানা সুবিধাকে কাজে

লাগিয়ে নিজেদের দরকারের বিদ্যুৎ তারা নিজেরাই বানিয়ে নেয়। লোডশেডিং হলে আমাদের রাজ্যে যেমন সব কাজ বন্ধ, পড়াশুনা সব শিকেয় ওঠে, তামিলনাডুতেও কিন্তু অবস্থা ঠিক তাই। সেখানে সারা রাজ্যও বিদ্যুতে ডুবে যায় যদি , শোলাই ইশকুলে কিন্তু আলো যাবে না।

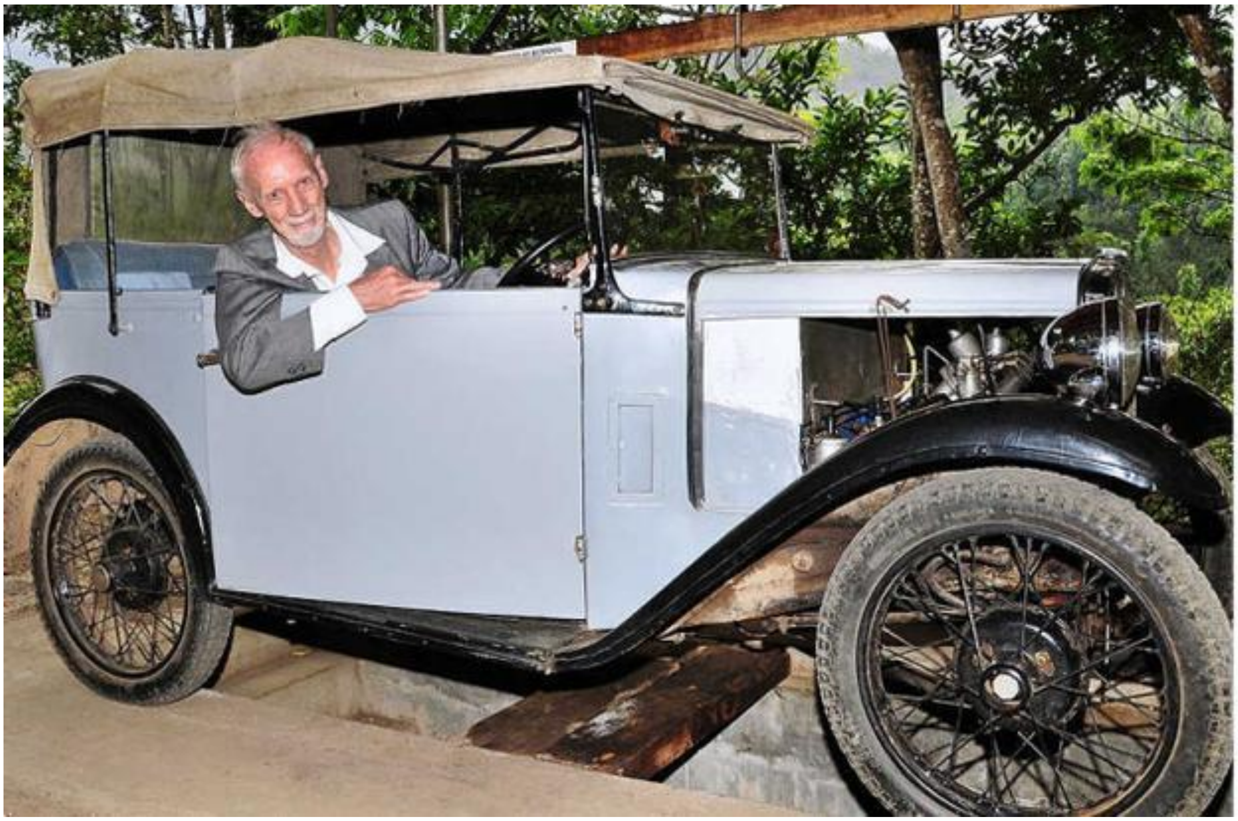

এ'সবই সম্ভব হয়েছে অধ্যক্ষ ব্রায়ান জেনকিন্সের পরিকল্পনা আর প্রচেষ্টায়। তিনি ১৯৮০ সালে তাঁর ঠাকুমার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সুত্রে কিছু সম্পত্তি পেয়েছিলেন। এই সম্পত্তি বেচে পাওয়া টাকাপয়সাই কাজে এল তাঁর স্বপ্নকে বাস্তব করতে। ১৯৮৯ সালে এই স্কুল বাড়ি তৈরি করা শুরু হল, যার পরিবর্ধনের কাজ এখনও একটু একটু করে চলছে। ছাত্রদের কাছ থেকে টাকাপয়সা নেওয়া হয়না।

তিনজন মাত্র ছাত্র নিয়ে শোলাই স্কুলটি শুরু হয়েছিল। একজন ছিল রাশিয়ান, একজন তিব্বতি আর একজন তামিলনাডুর। সবাই খুবই অভাবি ঘরের ছেলে।

এতদিন পরে এখন সেই স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ৬৫টি জন আর শিক্ষকের সংখ্যা ১৮ জন। ছাত্রদের অর্ধেক ঐ জেলার নানা গ্রামের দরিদ্র পরিবারের ছেলে। সবাই বিনা বেতনেই পড়াশুনার সুযোগ পায়। আর বাকি অর্ধেক ছাত্র পৃথিবীর নানা দেশ ও নানা জাতির। জেনকিন্সের

উদ্দেশ্যমতই, যে ছেলেরা বা মেয়েরা এখানে থাকে তারা বিভিন্ন দেশ , বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ভাষভাষী হওয়াতে নিজেদের অজান্তেই এক বিশ্বজনীন মনোভাবের মানুষ হয়ে গড়ে উঠছে তারা, চামড়ার রঙ নির্বিশেষে সব মানুষকে ভালোবাসতে পারবার শিক্ষা নিয়ে।

এত উচ্চতায় অবস্থিত হওয়াতে বাতাস সারা বছরই ঠাণ্ডা থাকে এখানে। প্রায় ২০৫ দিন মত পরিষ্কার সুর্যকিরণ পাওয়া যায়। ৮০টির মত সৌরপ্যানেল ছড়ানো আছে সারা ক্যাম্পাসে,যা দিয়ে তৈরি বিদ্যুত ৫০ টি ব্যাটারিতে ধরা থাকে। তাই দিয়ে ক্যাম্পাসের সমস্ত আলো জ্বলে,

চলে কম্পিউটার, ডিভিডি প্লেয়ার, রান্নাবাড়ির মিক্সার গ্রাইন্ডার।

ছোটন প্রশ্ন করলো, বর্ষাকালে সুর্যকিরণ কোথায় পায়? তখন কী করে চলে ওদের? উত্তরে পিসেমশাই বললেন, তার জন্য ছাত্র ও শিক্ষকদের তৈরি ছোট্ট একটা জলবিদ্যুৎকেন্দ্রকে কাজে লাগানো হয়। ক্যাম্পাসের মধ্যে দিয়ে যে ছোট্ট নদীটি বয়ে গেছে তার বুকে ছোট আকারের একটি হাইডেল প্রজেক্ট তৈরি করেছে তারা। একটু উঁচুতে তৈরি একটি ট্যাঙ্কে বয়ে আসা নদীর জল ভরা হয়, তার পর সেই জলকে ছেড়ে দিয়ে তার গতির সাহায্যে ছোট টারবাইন

ঘুরিয়ে বিদ্যুত উৎপাদন করা হয়। বর্ষার সময় যখন সুর্যকিরণ কম পাওয়া যায়, কিন্তু নদীর জলের জোর বাড়ে তখন এর ব্যবহার হয়। আবার বাতাস যখন জোরে বয় তখন সেই বাতাসকেও তারা কাজে লাগায়। হাওয়ার ধাক্কায় হাওয়া কল চালু করে তা থেকে বিদ্যুৎ বানিয়ে ধরে রাখা হয় ব্যাটারিতে। এছাড়া, রান্নাবান্নার কাজের জন্য স্কুলের ছাত্ররা বানিয়েছে চারটে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট।

স্কুলের অরগানিক ফার্মে জৈব সার ইত্যাদি প্রকৃতিতে যা পাওয়া যায় সেগুলিকেই কাজে লাগিয়ে চাষআবাদ করে তারা। তাদের একটা বিরাট চাষের ক্ষেত আছে। কৃষিকাজে ছাত্ররাও হাত লাগায়, প্রকৃতিকে চিনতে শেখে, ফসলের জমি, সার, জল, চাষের উপযুক্ত জলবায়ু, বীজ সব বিষয়ে অনায়াসে শিখে ফেলে। ভূগোলের বই পড়তে হয় না। অনেকক্ষণ মুক্ত প্রকৃতির কাছে থেকে তাদের শরীর ও মনেরও উন্নতি হয়। এ শিক্ষা পরবর্তী জীবনে বাস্তবে তাদের কাজে লাগে। ৩০ একর জমির ফার্মের সব কাজই ছাত্ররা করে ,আর এই ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলেই হস্টেলের খাবারের সব সবজির প্রয়োজন মেটে। ফার্মের উৎপাদনের মধ্যে নানা ঋতুর শাকসবজি ও ফল ছাড়াও আছে কলা , গোলমরিচ ও কফি। এই কফি তারা রপ্তানিও করে। তাছাড়া দুগ্ধজাত দ্রব্য , যেমন অরগানিক দুধ, চিজ এসব তারা নিজেদের চালানো ডেয়ারি থেকেই পায়। জমিতে জলসেচও তারা নিজেরাই করে।

আর আছে একটি কারিগরি বিভাগ, যেখানেও ছাত্ররাই অংশগ্রহণ করে। স্কুলের প্রয়োজনীয় অনেক জিনিস ছাত্ররা এখানে তৈরি করে ও সারাই করে। এখানের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশে তারা গাড়ি সারানো এবং অন্যান্য কারিগরি বিদ্যা শেখে। তারা সাইকেলের যন্ত্রাংশ আমদানি করে জুড়ে সাইকেলও তৈরি করে। ছোটদের জন্য আছে যন্ত্র সংক্রান্ত দক্ষতা তৈরি করার উপযুক্ত খেলনা। এই কারিগরি বিভাগেই ছাত্ররা একটি অ্যামবাসাডরের ইঞ্জিনকে এমনভাবে বদলে নিয়েছে যাতে সেটি পেট্রলেও চলবে আবার বায়োগ্যাসেও চলবে। ৪৩ বছর আগে জেনকিন্স জাহাজে এদেশে আসার সময় তাঁর প্রিয় বেবি অস্টিন গাড়িটিকে খুলে বস্তায় ভরে প্যাকিং করে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। কারিগরি বিভাগের ছাত্ররা সেটাকে জুড়ে দিয়ে তার জন্য জন্য একটি পাওয়ার ইঞ্জিন তৈরি করে দিয়েছে।

শোলাই স্কুলে আছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির কম্পিউটার ল্যাব, একটি বড় লাইব্রেরি, বিরাট খেলার মাঠ, সুইমিং পুল , টেনিস কোর্ট। বিকেলে স্কুলের পর সাড়ে চারটে থেকে ছ 'টা পর্যন্ত তাদের খেলার মাঠে যেতে হয়, নিজেদের বাসন নিজেদেরই ধুতে হয়, খাওয়ার পর রান্নাঘর পরিষ্কার করতে হয়। স্কুলের ক্যাম্পাসের মধ্যেই আছে ছেলেদের জন্য দুটি আর মেয়েদের জন্য

একটি হস্টেল।

সব শোনার পর ছোটন , যার পড়াশোনায় সব চেয়ে অনীহা, সে জিজ্ঞেস করল, ওখানে তা হলে পড়তে হয় না! কি মজা না! পিসেমশাই বললেন পড়তে না হলে আর স্কুল হল কী করে? এখানে যারা পড়ে তারা বিলেতের কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির সিলেবাস অনুযায়ী পড়াশোনা করে। স্কুলে আছে দুটি প্রাইমারি গ্রুপ। প্রথম গ্রুপে ১০ -১১ বছর পর্যন্ত ছাত্র আছে,দ্বিতীয় গ্রুপে আছে ১২ বছর পর্যন্ত ছাত্র। আর আছে ১২ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত ছাত্রদের নিয়ে মিডল গ্রুপ। ১৪ থেকে ১৬ বছর বয়সীরা কেম্ব্রিজের যে পরীক্ষাটি দেয় সেটি ভারতের দশম শ্রেণীর মানের সমান।

শিক্ষার ইংরিজি প্রতিশব্দ এডুকেশান কথাটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ ই-ডাক্টো থেকে। তার অর্থ হল মানুষের মধ্যে যা কিছু সম্ভাবনা আছে তার পরিপুর্ণ বিকাশ সাধন ঘটানো। সেই কথাটাকে সার্থক রূপ দেবার মত করেই জেনকিন্স তাঁর স্কুলের ছাত্রদের জন্য অনেক ভেবেচিন্তে স্কুলের কার্যক্রম স্থির করেছেন। পড়াশোনার কোন চাপ নেই। এখানে সব কাজে সবাই অংশ নিতে পারে, কোনও কাজে দরকার হলে নিজের থেকেই একে অন্যের সঙ্গে কাজে হাত লাগায় কাউকে কোনও কাজের কথা বলতেই হয়না।।

৬৩ বছর বয়সের ব্রায়ান, নিজের সেই বেবি অস্টিন গাড়িটা চালিয়ে উঁচুনিচু খন্দে ভরা রাস্তায় রোজ যাতায়াত করেন, সব কাজের তদারক করেন। তাঁর কথা হল, শিক্ষার উদ্দেশ্য হল প্রকৃত সংবেদনশীল মানুষ গড়ে তোলা। আর এটাই তিনি করে চলেছেন।

ছবিঃ সংগৃহীত

প্রথম ধাঁধা

পৃথিবীর উপরিতল থেকে তার কেন্দ্র হয়ে একপাশ থেকে অন্যপাশে কলকাতা থেকে আমেরিকার হেলার টাউন অবধি একটা টানেল হয়েছে। তাই দিয়ে পৃথিবীর এপাশ থেকে ওপাশে যাওয়া শাটল ট্রেন গ্র্যাভ এক্সপ্রেসে করে দশ ঘন্টায় উপরিতলে কলকাতা স্টেশন থেকে থেকে পৃথিবীর কেন্দ্রে ‘সেন্ট্রাল’ স্টেশনে পৌঁছোনো যায়। সেখান থেকে হেলার স্টেশন আরো দশ ঘন্টা। ধরো তুমি শাটল ট্রেনে উঠে ক্রমাগত যাতায়াত করছ কলকাতা থেকে হেলার অবধি। আরো ধরে নাও, ভারত আর আমেরিকা দু জায়গাতেই সকাল আর সন্ধে হয় ঠিক ছটায়। আজ বিকেল পাঁচটায় যদি তুমি কলকাতা থেকে রওনা দিয়ে থাকো তবে কখন আর কোথায় তুমি ফের দিনের আলো দেখতে পাবে?

দ্বিতীয় ধাঁধাঃ

অমিত, অরুণ, অজয়, অসীম, অরিত্র এই পাঁচজন ছাত্রের ওজন নিতে হবে। মাস্টারমশাই তাদের জোড়ায় জোড়ায় ওজন নিলেন।

ফল হল এইরকম -

অমিত+অরুণ-৭৫ কিলো,	অমিত+অজয়-৮৮কিলো,	অমিত+অসীম-৮১কিলো
অমিত+অরিত্র-৭৮ কিলো ,	অরুণ+অজয়-৮৩কিলো,	অরুণ+অসীম-৭৬কিলো
অরুণ+অরিত্র-৭৩ কিলো ,	অজয়+অসীম-৮৯কিলো,	অজয়+অরিত্র-৮৬কিলো
অসীম+অরিত্র-৭৯		

ওদের কার ওজন কতো?

তৃতীয় ধাঁধা

নিজে দেখিনা তোমাকে দেখাই
আমায় দিয়ে ঢাকলে
মাঝেমাঝেই পাওনা খুঁজে
আমায় কোথা রাখলে
দড়ি দিয়ে রাখলে বেঁধে
দুলবো তোমার কোলে
যেমন করে বাগানে ওই
দোলনাখানি দোলে

কুইজঃ

১। আধুনিক কালের প্রথম অলিম্পিক কোন শহরে হয়েছিলো?

২। অলিম্পিক গেমস-এর মূলমন্ত্র হল সাইটিয়াস, অলটিয়াস, ফোরটিয়াস। এদের মানে কী?

৩। এবারের লণ্ডন অলিম্পিক গেমসটা কত নম্বর অলিম্পিক?

৪। অলিম্পিকে সবচেয়ে বেশি স্বর্ণপদক কে জিতেছেন?

৫। অলিম্পিকের পতাকার পাঁচটা রিঙ কী বোঝায়?

৬। প্রাচীন অলিম্পিক প্রথম কোন সালে হয়?

৭। আধুনিক অলিম্পিক প্রথম কোন সালে হয়?

৮। আধুনিক অলিম্পিকের প্রথম পদকটা কে পেয়েছিলেন?

৯। পরপর দুবার অলিম্পিক ম্যারাথন কে জিতেছেন?

১০। অলিম্পিকে ম্যারাথন দৌড়ের দূরত্ব কত?

জানো কি?

১। মানুষ ছাড়া দ্বিতীয় যে প্রাণীটার কুষ্ঠ হয় সে হল আর্মাডিলো।

২। বেড়ালের কানে ৩২টা পেশি থাকে।

৩। বলগা হরিণের প্রিয় ফল হল কলা।

৪। ভালুকের মুখে ৪২টা দাঁত থাকে।

৫। বেড়ালের চার সারি গোঁফ হয়। (গুণে দেখতে পারো)

৬। জিরাফের কোন স্বরনালী থাকেনা।

৭। সজারুকে জলে ফেলে দিলে সে ভাসবে।

৮। ছাগলের চোখের মনি চৌকো।

৯। গাধা হল একমাত্র জীব যে একসাথে নিজের চারটে পা দেখতে পায়।

১০। কুমির কখনো জিভ বের করতে পারে না।

ক। সঙ্গের ছবিটা দেখো। এই ম্যাজিকাল জলপ্রপাতটার নাম অশ্রুজলের দেয়াল। রয়েছে হাওয়াই-তে। পৃথিবীর এমনই অজস্র রোমাঞ্চকর সব জলপ্রপাতের খবর আর ছবি পাবে এই সাইটে- matadornetwork.com/trips/38-of-the-worlds-most-inspiring-routes-for-road-trips-pics/

খ। একই ছবির অর্ধেকটায় দিন আর বাকি অর্ধেকটায় রাত। কেমন করে হয়? আসলে ফটোগ্রাফার পনেরো ঘন্টা ধরে শহরের একই জায়গার ছবি তুলে গেছেন পরপর। তারপর সেগুলোকে একসঙ্গে একের ওপর এক মিশিয়ে দিতেই—ম্যাজিক!! এমনি সব মহা আশ্চর্য কাজকর্মের সন্ধান পাবে এই সাইটেঃ http://9wows.com

ড্রুডলঃ

বলো তো এটা কীসের ছবি?

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২

৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩

৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪

৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫

৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬

৭ ৭ ৭ ৭ ৭ ৭ ৭

৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮

৯ ৯ ৯ ৯ ৯ ৯ ৯

১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০

কীসের ফটো?

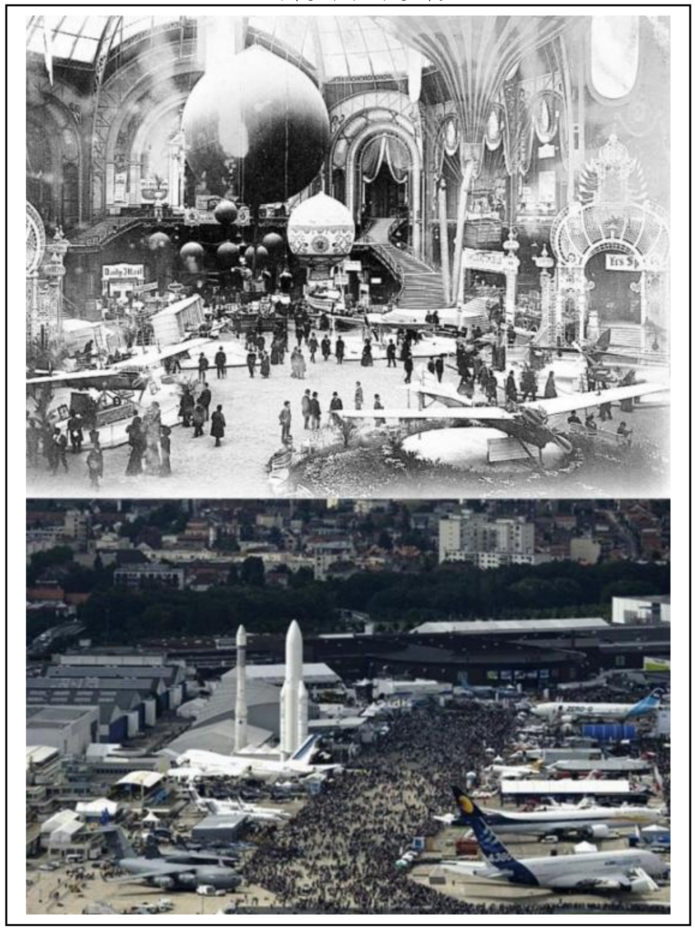

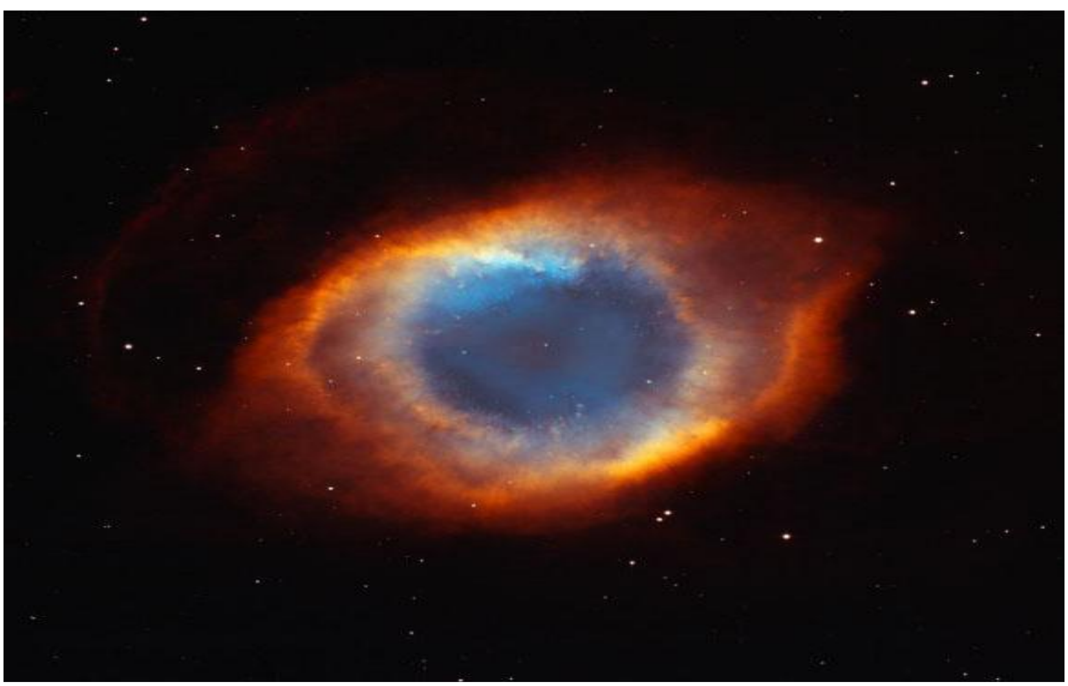

অবিশ্বাস্য

সাড়ে ছশো আলোকবর্ষ দূরের এই হেলিক্স নিহারিকা যেন মহাকাশের এক সদাজাগ্রত অতিকায় চোখ!

হযবরলঃ

চপ মাখা রশ

		○			

চলো দশ মাগুরো

				○		

রঙে হিচু করি

			○		○

ছুরি পাইস নাকি

					○	○

এইবারে গোল দেয়া অক্ষরগুলো দিয়ে নিচের শূন্যস্থানটা পূরণ করো।

“মাকে না ডেকে নিজে নিজে কর। এতো __ __ ________”

গত সংখ্যার উত্তরঃ

ধাঁধার উত্তরঃ জিভ, টেলিফোন-ল্যাণ্ডলাইন ও মোবাইল, ক্যাঁচ, কমপিউটার

কুইজের উত্তরঃ গঙ্গা, মানস, অমরকন্টক, অমরকন্টক, নর্মদা, নর্মদা, নদী, সিন্ধু (ইংরিজিতে ইন্দাস, সেই থেকে ইন্ডিয়া), সুন্দরবন, উত্তরবঙ্গে

কীসের ফটোঃ বেসিনের মধ্যের ফুটো দিয়ে জলের ধারা।

ড্রুডলঃ টমেটো স্যাণ্ডউইচ,

হযবরলঃ সল্টলেক শহর, শ্যামবাজার ডিপো, একটা লেজার প্রিন্টার, টি এফ টি মনিটর, আস্ত হনুমান

প্রশ্নের উত্তরঃ মজার মজার মার।

শুরু হল

নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস

পূর্বকথা

বিশ শতকের শেষের দিকে জ্যোতির্বিদ ব্রায়ান জি মার্সডেন গণনা করে পূর্বাভাষ দিয়েছিলেন, ২১২৬ সালের ১৪ আগস্ট পৃথিবীর ওপর আছড়ে পড়তে পারে ধুমকেতু সুইফট টাটল। তার পনেরো কিলোমিটার ব্যাসার্ধের নিউক্লিয়াসের আঘাতে পৃথিবীর বুক থেকে হয়তো মুছে যাবে গোটা জীবজগতটাই। সম্ভাব্যতা তত্ত্বের চুলচেরা হিসেব জানিয়েছিলো, সংঘাতের সম্ভাবনা দশ হাজারে মাত্রই এক। কিন্তু-----

----একবিংশ শতাব্দির ষষ্ঠ দশক। সৌরজগতের সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূরে উর্ট মেঘমণ্ডলে, গভীর মহাশূন্যের শীতলতায় জমাট বাঁধা একটা ধুলো গ্যাস আর বরফের পিণ্ড, তার যাত্রাপথের দূরতম বিন্দুতে পৌঁছে গতিমুখ বদলে নিল। শুরু হল ধুমকেতু সুইফট টাটলের শেষ সূর্যমুখী যাত্রা—তার অন্তিম অভিযান।

দশকের পর দশক কেটে গেছে তারপর। সবার অলক্ষ্যে অজানা অতিথি এসে পৌঁছোল সৌরমণ্ডলের সীমানায়। তারপর, দূরতম গ্রহ প্লুটোর কক্ষপথ অতিক্রম করে, তীব্র গতিতে দূরত্বকে গ্রাস করতে করতে ছুটে চলল সূর্যের দিকে। একখণ্ড জমাট ধুলোর পিণ্ডের চলন বিচলিত করতে পারেনা মহাকাশের বিশালদেহী গ্রহনক্ষত্রদের। কিন্তু তার গতিমুখ ক্রমশই বিচলিত করে তুলছিল একজন মানুষকে। সৌরমণ্ডলের তৃতীয় গ্রহটির মৃত উপগ্রহের বুকে একজন মানুষের চোখে তখন ঘুম নেই--------

।১।

একটি ভয়াবহ আবিষ্কার

"বোস, কদিন ধরে ভাবছি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো? মানে, যদি ব্যাপারটা জানাতে তোমার কোন আপত্তি না থাকে!"

মনিটর থেকে চোখ না সরিয়েই সত্যব্রত বোস নীচু গলায় বললেন, "বলো অঁরি।"

"কদিন ধরেই এই যে গভীর মহাকাশ পর্যবেক্ষণের এতো তথ্য নিয়ে যাচ্ছো আমার কম্পিউটার থেকে, ও দিয়ে তুমি করবেটা কী?"

তীক্ষ্ণ একটা শিসের শব্দ উঠল মনিটরের থেকে। তারপর একটা সুরেলা গলা ঘোষণা করল, "তথ্য আদানপ্রদান সম্পূর্ণ হয়েছে।"

হাতে ধরা ছোট্ট যন্ত্রটার পর্দায় সদ্য পাওয়া তথ্যগুলোতে চোখ বোলাতে বোলাতে সত্যব্রত বললেন, "সে তো আমার চিঠিতেই বলেছি- মহাকর্ষকণিকা গ্র্যাভিটন অনুসন্ধান-"

"এবং সেই দিয়ে গ্র্যাভিটিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির চেষ্টা--, এই বলবে তো? সে তো ফাইলেই আছে। আমি তা জানতে চাইনি। সত্যি কথাটা জানতে চেয়েছি।"

চাঁদের অন্ধকার অর্ধে মেয়ার মস্কোভিয়েন্স নামের গভীর আগ্নেয়খাতের ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকা এই অতিকায় অবজার্ভেটরির গোটাটাই স্বচ্ছ, প্রায় অদৃশ্য টেফলো সিলিকনের আবরণে ঢাকা। চেয়ারটা পেছনে হেলিয়ে মাথার ওপর ঝুঁকে থাকা তারাদের দিকে চোখ রেখে সত্যব্রত মৃদু গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কী বলতে চাইছ অঁরি? আমি মিথ্যে বলছি?"

ডঃ অঁরি উঠে গিয়ে দুপাত্র কফিশুদ্ধ একটা ট্রে এনে প্রফেসর বোসের সামনে নামিয়ে রেখে নিজে একটা কাপ তুলে নিয়ে লম্বা চুমুক দিলেন। তারপর, স্বভাবমাফিক শান্ত, নিচু গলায় বললেন, "ব্যাপারটা একরকম তাই।"

সত্যব্রত হাতে তুলে নেয়া কফির কাপটা নামিয়ে রাখলেন ফের, "যা বলছো , ভেবে বলছো তো অঁরি? প্রতিরক্ষা বিভাগের স্বীকৃত একটা প্রজেক্টের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুললে জিনিসটা অন্য চেহারা নেবে কিন্তু। তুমি বা তোমার জ্যোতির্বিদ্যা বিভাগ কি তার জন্য তৈরি?"

ডঃ অঁরির হাবভাবে কোন তাপউত্তাপ দেখা গেল না। বললেন, "প্রমাণ নয় ডিয়ার বোস। যুক্তি, বিশুদ্ধ যুক্তি! প্রমাণ নকল করা যায়। যুক্তির সে ভয় নেই। অনেকগুলো যুক্তি আছে আমার, তোমার প্রজেক্টের সত্যতার বিরুদ্ধে। আমি শুধু তার একটা বলছি।

"এই নিয়ে তুমি গত তিন মাসে কুড়িবার রিডিং নিয়েছো আমার এখানে। প্রত্যেকবারই ১৬.৫ ডিগ্রি পূর্ব থেকে ১৬.৭ ডিগ্রি পূর্ব এলাকাটুকুরই রিডিং নিয়েছো তুমি। গ্র্যাভিটনের অনুসন্ধান করতে মহাকাশের এই ছোট্ট অংশটুকুকেই কেন বেছে নিলে তুমি বোস?"

"নমুনা সমীক্ষা অঁরি। সবটা আকাশের তথ্য একবারে নিয়ে তো আর কাজ করা যাবে না! কাজেই—"

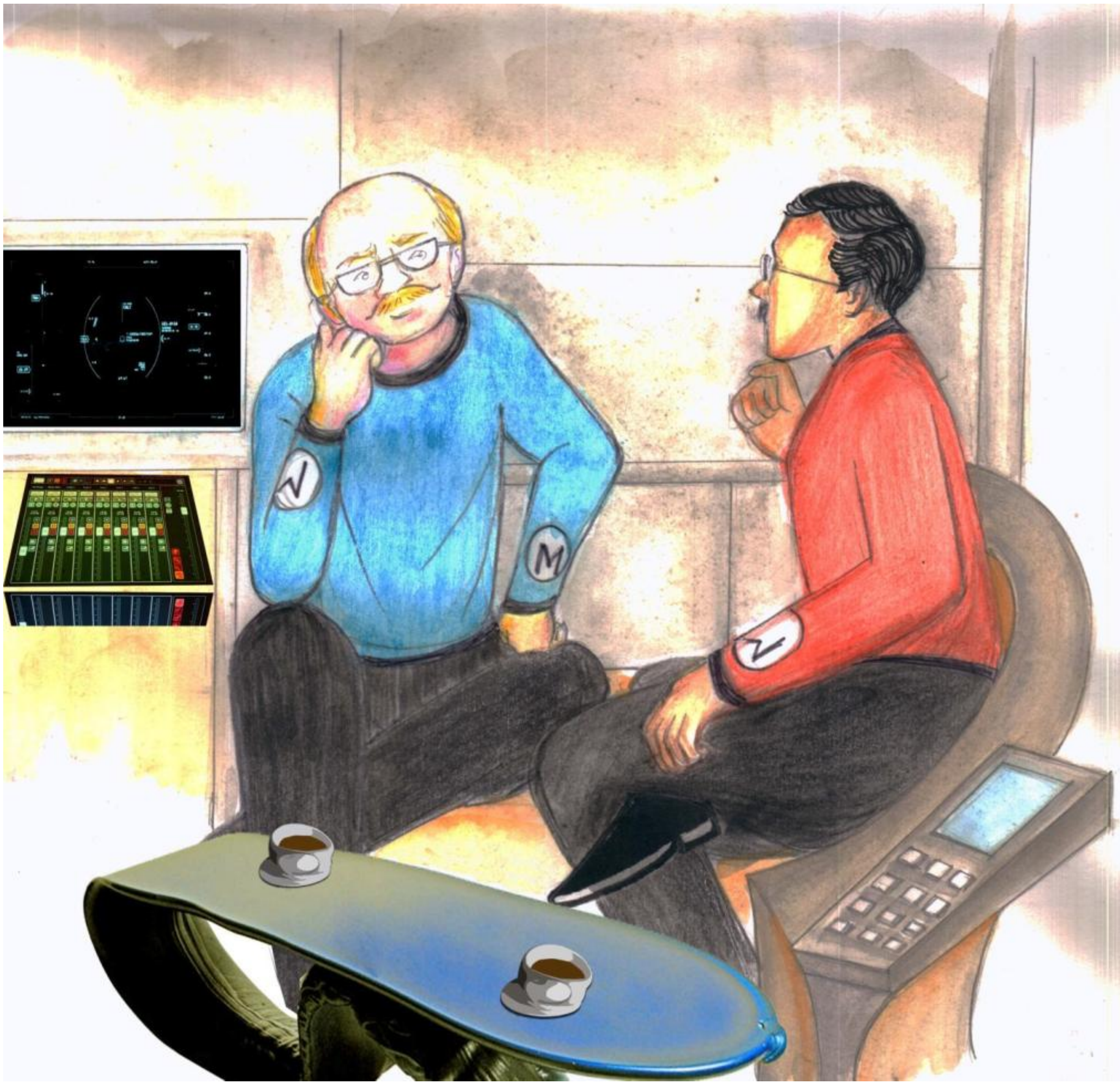

ডঃ মিশেল অঁরি মৃদু হাসলেন, "অত্যন্ত ভারী মহাজাগতিক বস্তু যে এলাকায় থাকে, যেমন ধরো কোন বড় নক্ষত্রপুঞ্জ, সেইখানেই তো গ্র্যাভিটনের ঘনত্ব বেশি হয়, তাই না বোস? তোমার নির্বাচিত এলাকাটার মহাকাশ ম্যাপ দেখো," বলতে বলতে অঁরির আঙুলের চাপে সামনের একটা বড় প্যানেল আলোকিত হয়ে উঠল। সেখানে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের বুকে একটামাত্র ছোট্ট আলোর ফোঁটা। তার দিকে আঙুল দেখিয়ে তিনি বললেন, এই সেক্টরটাতে অন্তত একশ আলোকবর্ষের মধ্যে কোন বড় নক্ষত্রপুঞ্জ নেই। থাকবার মধ্যে রয়েছে কেবল ওই ধুমকেতুটা। কী যেন নাম? উম্‌ম্‌—সুইফট টাটল। ধুমকেতু! মহাকাশের সবচেয়ে হালকা বস্তু! তার চারপাশে তুমি গ্র্যাভিটন খুঁজছো বোস? এ প্রশ্নটা যদি আমি তুলি তাহলেও প্রতিরক্ষা বা জ্যোতির্বিদ্যা , কোন বিভাগই কি সেটাকে অস্বীকার করতে পারবে?"

নিঃশব্দে বসে ছিলেন প্রফেসর সত্যব্রত বোস। সত্য কখনো চাপা থাকে না। বিশেষ করে মিশেল অঁরির মত বৈজ্ঞানিকের কাছে। তাঁর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে যেন তার মনের কথাটা পড়তে চেষ্টা করছিলেন অঁরি। খানিক বাদে ফের নিচু গলায় বললেন, "তোমার প্রতিরক্ষাবিভাগের

ডিরেক্টর স্মৃতিরেখা গণেশন আমার পুরোন সহকর্মী। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম আমি, তোমার প্রজেক্ট নিয়ে। না না, উত্তেজিত হয়োনা। তাঁকে আমি তোমার এই 'গ্র্যাভিটি মিসাইল গবেষণা' র কথা কিচ্ছু বলিনি। শুধু জানতে চেয়েছিলাম, চাঁদে তোমার মূল প্রজেক্টটা কী? উত্তরে তিনি জানিয়েছেন, তোমার কাজ চলছে ম্যাটার-অ্যান্টিম্যাটার মিসাইল নিয়ে। গ্র্যাভিটি মিসাইল সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন, ওটা এখনকার বিজ্ঞানের নাগালের বাইরের একটা অসম্ভব ব্যাপার। হয়তো শ খানেক বছর পরে ও নিয়ে তোমার মন্ত্রক ভাবনাচিন্তা শুরু করবে। এইবারে আমায় সত্যি কথাটা বলবে?"

খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে প্রফেসর বোস যখন ফের কথা বললেন, তখন তাঁর গলায় খানিক আগের উত্তেজনার ছিঁটেফোঁটাও নেই আর, "বুঝতে পারছি, তোমার কাছে আর কিছু লুকোনো সম্ভব নয়। কিন্তু, কী হবে সত্যি বলে? তুমি বিশ্বাস করবে? কেউ বিশ্বাস করবে?"

"চেষ্টা করে দেখো। আমি বিজ্ঞানী। মন্ত্রালয়ের নির্বোধ প্রশাসক নই যে, আইনের বইয়ের পাতার একচুল বাইরে গেলেই রে রে করে ছুটে আসবো। তোমার কথার যুক্তি থাকলে নিশ্চয় বিশ্বাস করবো, প্রতিরক্ষা বিভাগকে লুকিয়ে একটা নিজস্ব গবেষণা চালাবার উপযুক্ত কারণ তোমার আছে।"

কফির কাপটা নামিয়ে রেখে মিশেল আঁরির দিকে ঘুরে বসলেন এইবারে প্রফেসর বোস, "সত্যিটা হলো আমি ওই ধুমকেতুটার গতিপথ মাপবার চেষ্টা করছি কিছুদিন ধরে। আমি ধুমকেতু বিশেষজ্ঞ নই। নিতান্তই একজন অস্ত্রগবেষক। মন্ত্রালয়কে জানালে তারা নিজের কাজ ছেড়ে এই বুনো হাঁসের পিছনে দৌড়বার অনুমতি না-ও দিতে পারতো।"

"কেন বোস? ওর নিখুঁত গতিপথ মাপবার কাজ তো গত শতাব্দিতেই শেষ হয়ে গেছে। নতুন আর কী খুঁজে পাবে তুমি ওতে?"

"বলছি। মার্সডেন ক্যালকুলেশনের কথা তো তোমার জানা আছে? ২১২৬ সালের ১৪ই আগস্ট--"

"জানি।সেদিন ওর পৃথিবীর সাথে ধাক্কা খাবার একটা সম্ভাবনা আছে। দশ হাজারে এক-"

"ওইখানেই ভুল করলে আঁরি। দশ হাজারে এক নয়," বলতে বলতে আঙুলের দ্রুত চাপে যন্ত্রগনকের টার্মিনালে কিছু নির্দেশ টাইপ করছিলেন সত্যব্রত বোস, "গত তিনমাস ধরে সেটা আস্তে কমে এসে একশোয় এক হয়ে দাঁড়িয়েছে। হিসেবগুলো দেখো।"

মিনিট দশেক ধরে টার্মিনালের পর্দায় ভেসে চলা হিসেবগুলো খুঁটিয়ে দেখে আঁরি যখন মাথা তুললেন তখন তাঁর মুখে ভাব পালটে গেছে। খানিক অন্যমনস্কভাবে মাথা নেড়ে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলেন, "কিন্তু—তা কী করে সম্ভব? পৃথিবীর দিকে প্রায় এক ডিগ্রি সরে গেছে ধুমকেতুটার মুখ!! বাইরে থেকে কোন তীব্র অভিকর্ষীয় টান কিংবা ধুমকেতুটার ভেঙে গিয়ে তার ভরের বদল--"

"—কিংবা ওর গায়ে নিখুঁত হিসেব করা কিছু বিস্ফোরণ! কী বলো আঁরি?"

মিশেল আঁরি হেসে মাথা নাড়লেন, "ব্যাপারটা রহস্যময়। কিন্তু তাই বলে ওর গায়ে হিসেব করে কিছু বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গতিমুখ বদল? না বোস। তুমি চিরটাকালই কল্পনাপ্রবণ রয়ে

গেলে। একটা ধুমকেতুকে দিয়ে টার্গেট প্র্যাকটিশ করবে এমন বোকা কোন বিজ্ঞানি হতে পারে না। তত্ত্বটা পাল্টাও বরং তুমি।”

সত্যব্রত বোস গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন, “তত্ত্ব আমার ঠিকই আছে আঁরি। ধুমকেতুর গতিপথের গ্রাফটা একবার দেখো ভালো করে। তিনটে জায়গায় তিনটে তীক্ষ্ণ বাঁক দেখতে পাচ্ছো? ওই জায়গাগুলোতে এসে ধুমকেতুটা হঠাৎ মোচড় মেরে তার গতিমুখ পাল্টেছে। বড় কোন ধাক্কা না খেলে একটা বিরাট বরফ আর ধুলোর চাঁই নিজে থেকে বারবার দিক পালটাবে না। বিস্ফোরণ না হয় যদি, তাহলে সে ধাক্কাটা দিচ্ছে কিসে? না আঁরি, গোলমাল কিছু একটা আছে এর ভেতরে।”

বৃদ্ধ ফরাসিটি চিন্তিত মুখে মাথা নাড়লেন একবার।তারপর বললেন, “কথাটা তুমি কাউকে জানাও নি কেন?”

“কারণটা বোঝা কঠিন নয় আঁরি। কিছু রহস্যময় বিস্ফোরণে একটা ধুমকেতুর মুখ আস্তে

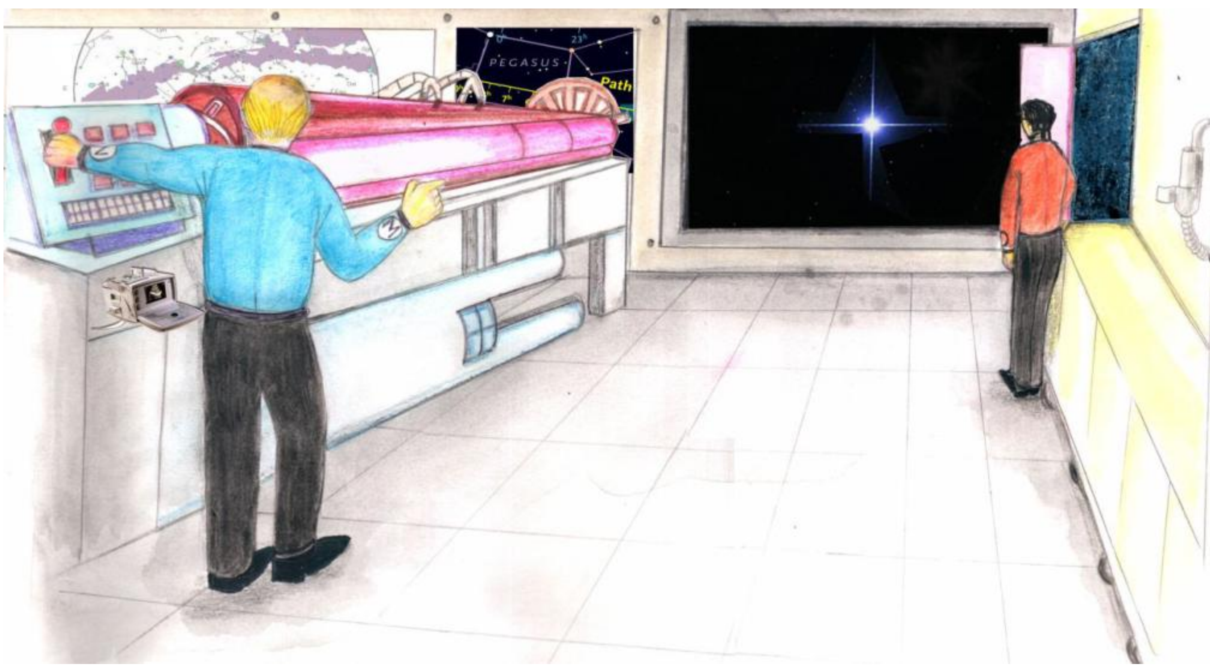

আস্তে পৃথিবীর দিকে ঘুরে যাচ্ছে! ব্যাপারটা প্রায় অবিশ্বাস্য। অতএব, একেবারে নিশ্চিত প্রমাণ হাতে না নিয়ে এই ব্যাপারে মুখ খুলে কেরিয়ার সুইসাইড করতে রাজি নই আমি। আরো দু একটা রিডিং নিতে হবে আমায়।”

“সে নাও না যত খুশি,” বলতে বলত হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটালেন ড: আঁরি, “তা তোমার মিসাইল প্রজেক্টের কদ্দূর?”

“এই রে, একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম,” অপ্রস্তুত গলায় কথাটা বলতেবলতেই পকেট থেকে একখণ্ড প্লাস্টিক বের করে এনে মিশেল আঁরির হাতে সেটি তুলে দিয়ে প্রফেসর বোস বললেন, “পরশু সন্ধেবেলা একাঘ্নির প্রথম টেস্ট ফ্লাইট আছে। অথরাইজেশন চিপ দিয়ে গেলাম। আসবেন মনে করে!”

ক্রমশ

ছবিঃ মৌসুমী, ইন্দ্রশেখর

চিত্ত ঘোষাল

আমাদের এই ছোট্ট শহরের নাম তোমরা অনেকেই জান না। আমিও জানাতে পারছি না। ধরো, এই যে পঞ্চার গল্পটা আমি লিখছি সেটা যদি কেউ ছেপে ফেলে, পড়েও যদি ফেলে অনেকে, একটা হইহই কাণ্ড তো শুরু হয়ে যেতেই পারে। কে কী ঝামেলা পাকাবে জানি না বাপু। হয়তো কোনো মন্ত্রী হুকুম দেবে পঞ্চাকে জঙ্গল ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে। তার চাইতে চুপচাপ থাকাই ভালো।

আমরা থাকি ধুকধুকিয়া বস্তির একটা ঘরে। ন'কড়ি মামা আর আমি। ধুকধুকিয়া নামটাও কিন্তু বানানো। বুঝতেই পারছ।

আমি ন'কড়ি মামার সঙ্গে আছি একেবারে ছোটো থেকে। আমার বাবা —মা কেউ নেই তো। ন'কড়ি মামারও কেউ নেই আমি ছাড়া। বস্তির ছোটো একটা ঘরে আমরা থাকি। খুব গরিব যে আমরা।

আমার ডাক নাম দশা, ভালো নাম দশকড়ি। অদ্ভুত না? তোমরা দেখেছো এককড়ি থেকে ন'কড়ি অবধি নাম হয়। তার মধ্যে চারকড়ি আটকড়ি বাদ। তাহলে আমার অমন হয়-না নাম দশকড়ি হল কী করে? সে ভারি মজার ব্যাপার। ন'কড়ি মামা আমাকে ভীষণ ভালোবাসে । আমি তখন পুঁচকে একটা । মামা একদিন আমাকে বলল- 'দ্যাখ, তোর আমার মতো হলে চলবে না, অনেক বড় হতে হবে তোকে। তোর নাম তাই আজ থেকে হল দশকড়ি। আমার ওপরে তোকে

থাকতেই হবে। ন'কড়ির ওপরে দশকড়ি।' তার আগে আমার অন্য একটা নাম ছিল। তা থাকগে,ও দিয়ে কী হবে আমার। আমি ন'কড়ি মামার ভাগ্নে দশকড়ি, এই নামই আমার ভালো।

আমার কথা তো শুনলে । এবার মামার কথা শোনো। মামাই তো এই গল্পের আসল লোক। আমি আর কী? ন'কড়ি মামা দু-দুটো পাশ দিয়েছিল। তারপর চাকরিবাকরির জন্যে অনেক চেষ্টাচরিত্তির করেছিল। কিন্তু চাকরি নাকি এমন জিনিস যা তুমি লেখাপড়া শিখেছো আর কাজ করতে পার বলেই যে পেয়ে যাবে এমনটি হয় না। ন'কড়ি মামারও হল না চাকরি। তখন মামা ঠিক করল, সে স্বাধীন ব্যবসা করবে । এসব কথা আমার ন'কড়ি মামার মুখ থেকে শোনা।

একটু আধটু বুঝতে শেখার বয়স হওয়া থেকে দেখে আসছি ন'কড়ি মামা একের পর এক স্বাধীন ব্যবসা করে যাচ্ছে। তোমরা বুঝি ভাবছ ন'কড়ি মামার অনেক ব্যবসা তাহলে। দুর, অনেক ব্যবসা যার সে তো বড়োলোক, সে কি আমাদের মতো বস্তিতে থাকে নাকি এত কষ্ট করে?

আসলে ন'কড়ি মামা একটা ব্যবসাও টেঁকাতে পারেনি। একটা ধরে, কিছুদিন চালাবার চেষ্টা করে পারে না, ছেড়ে দিয়ে আর একটা ধরে। এই চলে আসছে বরাবর। মামা একদিন দুঃখু করে আমাকে বলেছিল—'ব্যাপার কী জানিস, স্বাধীন ব্যবসা বলে কিছু নেই। আসলে সব পরাধীন ব্যবসা।' আমি কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে মামার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। মামা তখন বলেছিল—'কী, বুঝতে পারছিস না? বড়ো হ, তখন বুঝতে পারবি। আমাদের মতো গরিবদের কোন স্বাধীনতাই নেই রে দেশে।'

লোকে বলে ন'কড়ি মামার মতি স্থির নেই, বুদ্ধিশুদ্ধিও কম। বাজে কথা। আমি বিশ্বাস করি না। তবে হ্যাঁ, একটা কথা ঠিক, ন'কড়ি মামার মাথায় কোনো প্যাঁচ, কোনো খারাপ বুদ্ধি নেই। খারাপ বুদ্ধি যার মাথায় সে তো খারাপ মানুষ--পচা মানুষ। আমার ন'কড়ি মামা ভালো মানুষ, খুব ভালো মানুষ, তাই তার মাথায় শুধু ভালো বুদ্ধিই থাকে। বুদ্ধি কম! তাহলে আমার

ইস্কুলের আঁকগুলো অমন চটপট কষে দেয় কী করে! আমার তো আর বাড়িতে পড়ানোর মাস্টার নেই। তবু আমি ফার্স্ট হই কী করে? ন'কড়ি মামার জন্যেই না!

আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি। সরকারী বাংলা মিডিয়াম ইস্কুলে। গেলবার মাধ্যমিকে আমাদের ইস্কুল থেকে পঞ্চম হয়েছিল। স্টার পেয়েছিল আটজন। ফার্স্ট ডিভিশনে তেত্তিরিশ জন। ফেল? একজনও না। যাকগে ভাই, আসল কথায় ফিরে যাই এবার।

কথা হচ্ছিল ন'কড়ি মামার স্বাধীন ব্যবসা নিয়ে। তা তার শেষ ব্যবসার আগের ব্যবসাটার কথাই শোনো। তারপর তাকে বোকা বলতে চাও বোলো। ন'কড়ি মামার হিসেবমত সেটা হল তার সতেরো নম্বরের ব্যবসা। কোথা থেকে ফুচকা তৈরি করা শিখে এসেছিল মামা। ঠিক করল ফুচকার ব্যবসা করবে।

আমাকে বলল, -- 'দ্যাখ্ দশা, সব ফুচকাওলা পাইকিরি বাজার থেকে ফুচকা কিনে এনে বিক্রি করে। কী বিচ্ছিরিভাবে সেসব ফুচকা তৈরি হয়ে ভাবতে পারবি না। মোস্ট আনহাইজিনিক। ও বিষ আমি মানুষকে খাওয়াতে পারব না। আমি নিজে তৈরি করব। টপগ্রেড ফুচকা খাওয়াব খদ্দেরদের।'

যে কথা সেই কাজ। ঠ্যালাগাড়ি কেনা হল। ফুচকা ভাজার বড়ো কড়াই হল, আরো হেনতেন। ন'কড়ি মামা চাকি থেকে গম ভাঙিয়ে ভালো আটা নিয়ে এল। মিল থেকে খাঁটি তেল। কোনো জিনিসটিই ফার্স্টক্লাস ছাড়া সেকেন্ড ক্লাস চলবে না। ফুচকা তো হল, খেতেও হল

চমৎকার। হলে কী হবে, হিসেব করে দেখা গেল আলু চানা তেঁতুলজল নিয়ে একটা ফুচকার দাম পঞ্চাশ পয়সার কম হলে লাভ থাকে না। বাজারে বিক্রি হয় পঁচিশ পয়সায় একটা। ক'দিন রাস্তায় রাস্তায় ঠ্যালাগাড়িতে ফুচকা নিয়ে খুব ঘুরল ন'কড়ি মামা। রোজই বলে, 'ভাবিসনে দশা, ভালো জিনিসের কদর ঠিকই হবে আজ না হোক কাল।' কিন্তু লোকে বলে, 'খেতে বাপু একইরকম, ভালোমন্দ বুঝব কী করে?'

ফুচকার পাহাড় নিয়ে যেমন যায় ন'কড়ি মামা তেমনি ফিরে আসে। বস্তির ছেলেমেয়েদের ডেকে ফুচকার ভোজ দেয়। এমনি করে লোকসান দিয়ে ক'দিন আর চালানো যায়! ফুচকার ব্যবসা তুলে দিতে হল ন'কড়ি মামাকে। ঠ্যালাগাড়ি-টাড়ি সব বিক্রি করে দেওয়া হল। সেই টাকার সঙ্গে ধার করে আনা কিছু টাকা মিলিয়ে শুরু হল ন'কড়ি মামার নতুন ব্যবসার চেষ্টা।

ক্রমশ

ছবিঃ সোমা

এক ছোকরা জিকে টেস্টে শূন্য পেয়ে বেজায় রেগে গিয়ে কোর্টে মামলা করে দিয়েছিলো। তার দাবি, সে একটা প্রশ্নের উত্তরও ভুল লেখেনি। আদালত থেকে তার উত্তরপত্র চেয়ে পাঠানো হল। বিচারপতির সামনে যা পোঁছুলো তা এইরকম—

১। নেপোলিয়ন কী ভাবে মারা যান?

উত্তরঃ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে।

২। সলবাইয়ের সন্ধি কোথায় সই হয়েছিলো?

উত্তরঃ সন্ধিপত্রের শেষ লাইনের খানিক নীচে।

৩। একটি উপকারী জীবের উদাহরণ দাও ও কেন উপকারী তা বল।

উত্তরঃ ইঁদুর। না থাকলে কম্পিউটার অচল।

৪। প্রাতরাশে কী কী খাওয়া যায় না?

উত্তরঃ মধ্যাহ্নভোজ ও নৈশভোজ

৫। অর্ধেকটা আপেলকে কীসের মত দেখতে?

উত্তরঃ আপেলের অন্য অর্ধেকের মতো।

৬। রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে কাটালে কী হয়?

উত্তরঃ দিনের পর দিন ঘুম পায়।

৭। একটা চার মিমি ব্যাসার্ধের পাইপ একটি চৌবাচ্চাকে দু ঘন্টায় ভরেছে। দু মিলিমিটার ব্যাসার্ধের একটা পাইপ সেটাকে কতক্ষণে ভরবে?

উত্তরঃ ভরতে পারবেই না কারণ চৌবাচ্চা আগেই ভরে গেছে।

৮। তোমার দু হাতের প্রতিটিতে চারটে করে ডিম আছে। এবারে বাঁহাতে আরো তিনটি ও ডানহাতে আরো চারটি ডিম যদি রাখা হয় তাহলে তোমার দুহাতে মোট কতগুলি ডিম থাকবে?

উত্তরঃ একটাও থাকবে না। সব পড়ে গিয়ে ভেঙে যাবে।

শুভ দুর্গাপুজো

পুজো ভালো কাটাও সবাই।
ভালোবাসায়, দেবোপমা গোস্বামী। পঞ্চম শ্রেণী, কারমেল ইশকুল, কলকাতা

বিড়াল

লেখা ও ছবিঃ প্রিয়দর্শী (ক্লাস-থ্রি, এপিজে স্কুল , কলকাতা)

একদিন আমি কম্পিউটারে মাছের ছবি আঁকছিলাম, তক্ষুণি বৃষ্টি শুরু হল। তারপরই হঠাৎ করে আমি কিছু শুনতে পেলাম জানালার থেকে। আমি উঠে জানালায় দেখলাম একটা বিড়াল মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। আমি বুঝলাম যে ও মাছটা দেখতে এসেছিল।

টাইম মেনে

অরিজিতা

সূর্য দেখো টাইমে ওঠে ঠিক টাইমে অস্ত যায়
হিমবাহ টাইমে গলে টাইমে নদী বহে যায়
ঠিক টাইমে পাখিগুলো সবাই মিলে উড়ে যায়
টাইম মতো ইস্কুলে যাই টাইম মতোই ছুটি হয়
টাইমে আসে গ্রীষ্ম বর্ষা, শরৎ এবং হেমন্ত
টাইম মতই চলছে ছুটে গোটা বিশ্ব অনন্ত
মৌসুমী তার হাওয়ার টানে টাইমে বৃষ্টি এনে দেয়
সময় মতই ন্যাড়া অশথ নতুন পাতায় ভরে যায়
তারার দলও টাইমে ওঠে টাইম মতই ফুলও ফোটে
টাইম মতই গাছে গাছে ফল আসে ফল পেকেও যায়
টাইম হলেই ওঁয়াও কেঁদে ভাইটা আমার খাবার চায়
আমি হলাম কলুর বলদ টাইম আমার ঘানি
এবার থামি টাইম হয়েছে পড়ব একটুখানি।

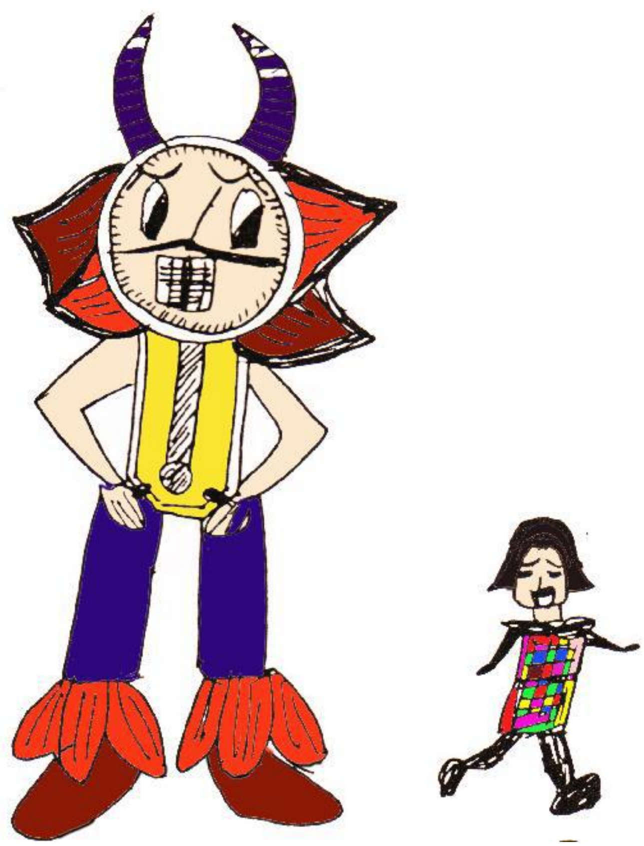

ছড়াটা বের হয়ছিলো ২০০৪ সালের মার্চ মাসের জয়ঢাক-এ। লিখেছিলো ক্লাস নাইনের অরিজিতা। সে এখন বেজায় বড় হয়ে গিয়ে বিদেশি এক কোম্পানিতে কীসব কঠিন চাকরি করে।

ভালো থেকো অরিজিতা।

তোমার জয়ঢাক

অন্তরার পাতা

ছবি ও ছড়া (ছড়া ইন্দ্রশেখর, ছবি অন্তরা)

থাকার মধ্যে পুঁটলি দুটি
আর আছে এক লাঠি
তাদের নিয়ে একলা পথে হাঁটি
হাঁটতে হাঁটতে পেরিয়ে গেলাম বিমলগড়ের হাট,
পেরিয়ে এলাম কিষাণগঞ্জ, তেপান্তরের মাঠ
সূর্য যখন বসতে গেল পাটে,
হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম অচিন পুকুরঘাটে।
দুচোখ জুড়ে ঘুম এসেছে সমস্তদিন হেঁটে
এই পাথরেই দুচোখ বুজে রাতটা যাবে কেটে
সকালবেলায়, এই পুকুরের কোলের কাছটি ঘেঁষে
হাটতে হাঁটতে হারিয়ে যাবো অন্য নিরুদ্দেশে

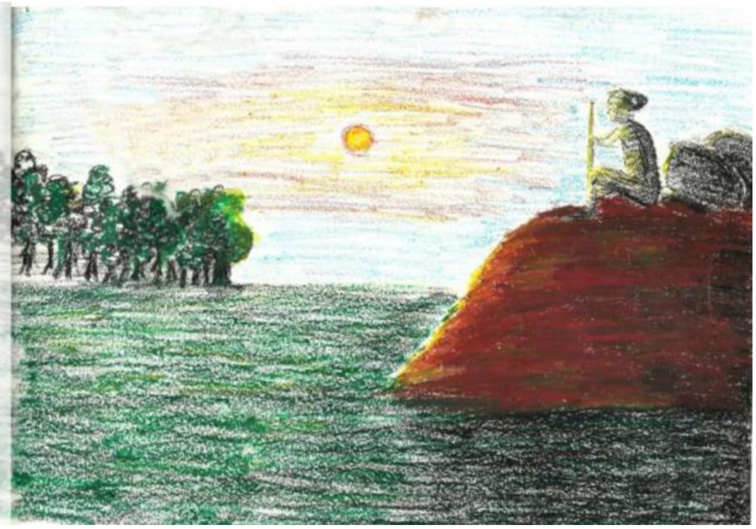

মধুবনি

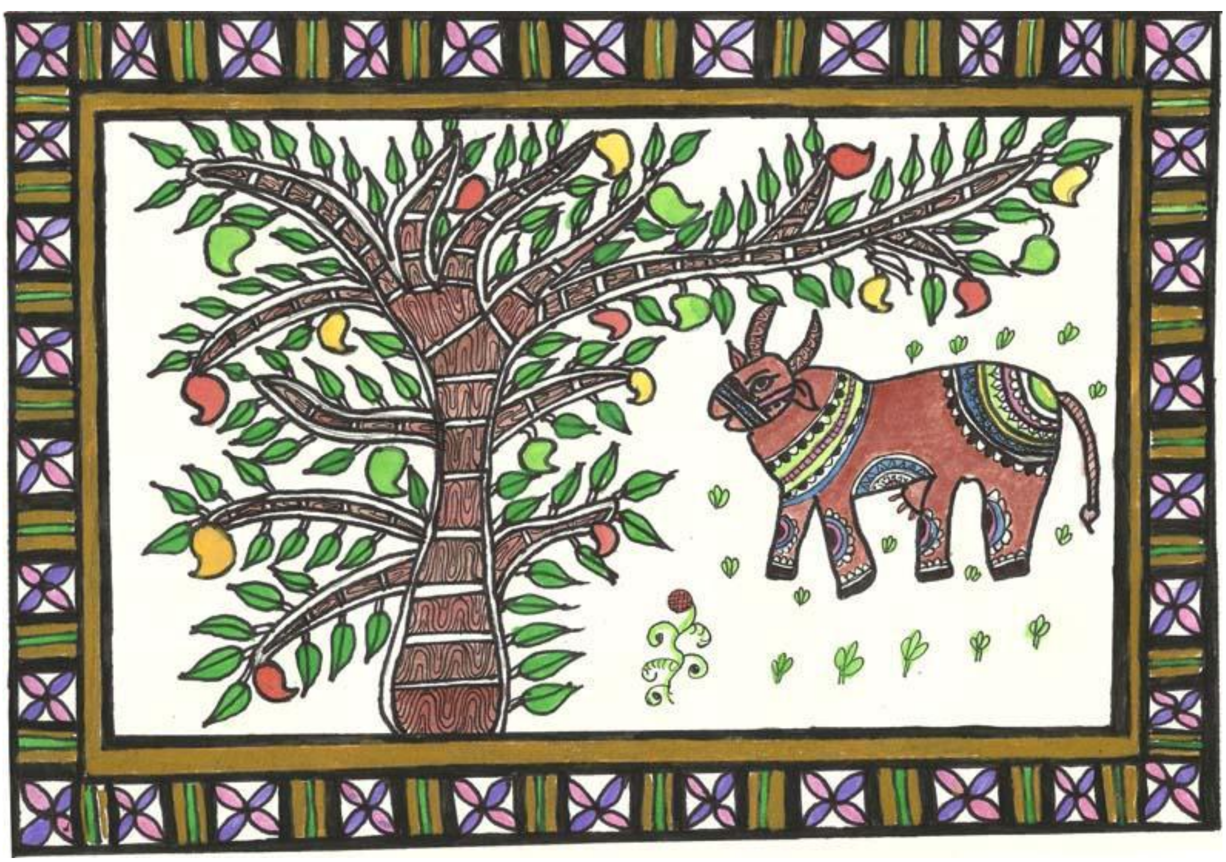

<u>কাজের কাজ</u>

বাবার অফিসের বাক্সে ভরা বাজে কাগজকে সুযোগ পেলেই কীভাবে ভালো কাজে লাগানো যায় সেই পরামর্শ দিচ্ছে সেন্ট জেভিয়ার্স ইশকুলের ক্লাস সিক্সের **রঙ্গিত মুখোপাধ্যায়**

সুন্দর ভারত

আমাদের সুন্দর দেশের এক সুন্দর নৃত্যশিল্পের ছবি পাঠিয়েছে
শ্রীশিক্ষায়তনের ক্লাস নাইনের রুচিরা মুখোপাধ্যায়

পুজোতে বেড়াতে চলল নৈহাটির সেন্ট লুক ইশকুলের ক্লাস ওয়ানের রাজেশ্বরী ভট্টাচার্য

বৃষ্টি গেছে ভিনদেশে ফের চলে
একটা বছর ফিরবে না আর ঠিক
রেলগাড়িতে যাচ্ছি দূরের দেশে
মায়ের সাথে, যাচ্ছি কুঝিক ঝিক

শ্রী গজানন কথা

সংহিতা

ময়ূরেশ কথা দিয়েছিলেন দ্বাপর যুগে সিন্দুর বধের জন্য জন্মাবেন। তার পরে দ্বাপর যুগে সিন্দুর নামে এক দানবের জন্ম হয়। সে জন্মের বৃত্তান্ত বেশ বিচিত্র।

একদিন দেবাদিদেব মহাদেব দেখা করতে গিয়েছিলেন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার সাথে। ব্রহ্মা তখন দিবানিদ্রা দিচ্ছিলেন। মহাদেবের ডাকাডাকিতে তিনি আড়মোড়া ভেঙে জাগলেন আর হাই তুললেন বড়ো করে। সেই সময় তাঁর মুখ থেকে একটা সুন্দর গোলাপি রঙের জীব তৈরি হলো। নিজের অস্তিত্ব জাহির করতে সে এক বাজখাঁই হুঙ্কার ছাড়ল। সেই হুঙ্কারে আকাশ বিদীর্ণ হলো, পর্বত কেঁপে উঠল আর সাগরের জল চলকে পড়ে গেল। ফলে ব্রহ্মারও ঘুম ছুটে গেল। তিনি জানতে চাইলেন, "কে তুমি, বাছা? আসছই বা কোথা থেকে? কী চাও আমার কাছে?"

সিন্দুর বলল, "হে জগৎপিতা, আপনি তো সর্বজ্ঞ! তবে কেন এসব কথা আমার কাছে জানতে চাইছেন? আমি তো আপনারই সন্তান, আপনার হাই থেকে তৈরি হয়েছি। এখন দয়া করে আমাকে একটা নাম দিন, আস্তানা দিন, খাবার দিন আর বলুন কী আমার কর্তব্য।" ছেলের গোলাপি রঙে মুগ্ধ হয়ে ব্রহ্মা তার নাম রাখলেন সিন্দুর। তাকে দিলেন ত্রিলোক জয়ের ক্ষমতা আর তিন লোকে বসবাসের অধিকার।

সিন্দুর তো সোল্লাসে ত্রিলোকে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। ওপরে স্বর্গ, মাঝে মর্ত্য আর তার তলায় পাতালে যতো দেব, মানব, দানব ছিল সবাই ভয়ে কাতর হয়ে উঠল। কিন্তু কয়েকদিন যেতেই সিন্দুরের মনে একটা সন্দেহ দেখা দিল। সে তো আর কোনো তপস্যাবলে ক্ষমতা পায় নি, যেমন পেত আর সকলে! ফলে নিজের সত্যিকারের ক্ষমতা নিয়ে তার মনে জেগে উঠল

সন্দেহ। সন্দেহ দূর করতে সে দৌড়ল ব্রহ্মার কাছে, তাঁরই ওপরে নিজের ক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখতে।

সিন্দুরের সাধের কথা শুনে পিতামহ খুবই বিরক্ত হয়ে বললেন, "আমিই তোমাকে বর দিলাম, আর তুমি কিনা বরের শক্তি পরীক্ষা করতে আমাকেই বেছে নিলে!" তারপর তিনিও নিদান হেঁকে দিলেন, "শিব-দুর্গার ছেলে গজাননের হাতেই তোমার নাশ হবে, এই বলে রাখলুম।" কিন্তু সিন্দুর তখন নিজের শক্তি পরীক্ষার জন্য ব্যাকুল। ওসব কথায় কান না দিয়ে সে ব্রহ্মাকে তাড়া করল। তার হাত থেকে বাঁচতে ত্রিলোকময় ছুটে বেড়াতে লাগলেন ব্রহ্মা। দুজনের লুকোচুরি খেলায় ত্রিলোকের সব জীবের সংকট ঘনিয়ে উঠল।

সিন্দুরের হাত থেকে পালাতে পালাতে ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠে পৌঁছোলেন। সেখানে স্বয়ং নারায়ণ পথরোধ করলেন সিন্দুরের। বললেন, "পিতামহের যা বয়স হয়েছে তাতে তিনি তোমার মতো ত্রিকালজয়ী শক্তিমান যুবকের সঙ্গে পেরেই উঠবেন না। ওরকম একটা থুত্থুড়ে বুড়োকে কেন মারবে? ছেড়ে দাও।" কিন্তু সিন্দুরের তখন ক্ষমতার প্রমাণ নেওয়ার নেশা চড়ে গেছে। সে তখন নারায়ণকেই মারার জন্য ছুটে গেল। তখন নারায়ণ বললেন, "আসলে আমি তো ত্রিলোক দিনরাত যাতে ঠিকঠাক চলে সেদিকটা দেখি, তুমি আমাকে মারলে ত্রিলোক ওলোটপালোট হয়ে যেতে পারে। তার থেকে তুমি বরং কৈলাশে দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে যাও। তিনি ক্ষমতায় তোমার সমকক্ষ হবেন। তুমিও নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পারবে।"

কথাটা সিন্দুরের মনে ধরল। সে কৈলাসে গিয়ে দেখল যে বনের মধ্যে মহাদেব ধ্যানমগ্ন। এর থেকে তার ধারণা হলো যে এ ধ্যানীযোগীর সঙ্গে যুদ্ধ করা নিরর্থক; বরং মা পার্বতীর রূপ দেখে তার মনে হলো দেবীকে ধরে নিয়ে যাওয়াটাই বীরত্ব। ফলে মহাদেবের যতো ভূতপ্রেত ছিল তাদের সবার সাথে ভীষণ যুদ্ধ হলো সিন্দুরের। সেই সব যুদ্ধের হল্লাহাটিতে মহাদেবের ধ্যান গেল ভেঙে। তিনি তো রেগে আগুন হয়ে গেলেন। তখন নিরুপায় মা পার্বতী ভাবছিলেন, "যদি ময়ূরেশ থাকত এখানে..." ব্যস অমনি ময়ূরেশ এসে উদয় হলেন। আর ভীষণ মেরে সিন্দুরকে পাঠিয়ে দিলেন পাতালে। তারপর মা পার্বতীকে বললেন, "আমি শিগিগিরই তোমার সন্তান হয়ে জন্মাব সিন্দুরকে মারার ক্ষমতা নিয়ে।" মা পার্বতী সে কথা শুনে আশ্বস্ত হতে তিনি ফিরে গেলেন নিজের জগতে।

এদিকে সিন্দুর তো তার মোটা বুদ্ধি আর মারপিট করার ওস্তাদি নিয়ে দত্যিদানোদের নেতা হয়ে বসল সহজেই। যতো সাধুসন্ত পালিয়ে গিয়ে পাহাড়ের গুহায় বাস করতে লাগলেন। শুধু কি তাই? সিন্দুরের দলের হাত থেকে দেবতাদেরও রেহাই ছিল না। ত্রিলোক জুড়ো সবাই তখন "ত্রাহি, ত্রাহি" ডাকছিলেন আর গণেশের বন্দনা করছিলেন।

কিছু সময় কেটে যেতে বন ঘেরা এক সরোবরের তীরে মা পার্বতীর সন্তান হয়ে জন্ম নিলেন গণেশ। যথারীতি তাকে স্নেহ আর সেবা দিতে চাইলেন মা পার্বতী আর প্রার্থনা করলেন গণেশ যেন ছোটো শিশুর আকার নেন। গণেশ ছোটো শিশুর আকার নিলেন বটে কিন্তু তাঁর

নাকের বদলে ইয়া বড়ো শুঁড় দেখা দিল, কানদুটো হলো বিশাল বড়ো কুলোর মতো। এই চেহারা দেখে মা পার্বতীও খুব দুঃখ পেলেন। সে কথা তিনি মহাদেবকে জানাতে মহাদেব বললেন, "চেহারা দেখে ঘাবড়ালে হবে? তোমার মনে নেই, গণেশ বলেছিলেন সিন্দুর বধের জন্য গজানন রূপ নেবেন?"

মহাদেব ও মা পার্বতীকে একসাথে কাছে পেয়ে গজানন বললেন, "আমাকে এক্ষুণি নর্মদা নদীর তীরে মাহিষ্মতী নগরে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। সেখানে রাজা বরেণ্য আর রানি পুষ্পিকা আমার ভক্ত; তাঁদেরও কথা দিয়েছিলাম যে তাঁদের সন্তান হয়ে জন্মাব। এদিকে রানি পুষ্পিকা একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়ে অচৈতন্য আর ওদিকে এক রাক্ষুসি এসে তাঁর নবজাতককে চুরি করে পালিয়েছে। জ্ঞান ফিরে সন্তান না পেলে রানি খুবই দুঃখ পাবেন। তাঁর জ্ঞান ফেরার আগে আমাকে তার পাশে সন্তান হয়ে শুতে হবে। আমাকে সেখানে পৌঁছে দিন।" মহাদেবের ভূতপ্রেতেরা অমনি গণেশকে পৌঁছে দিলেন রানি পুষ্পিকার পাশে।

এদিকে জ্ঞান ফেরার পর রানি পুষ্পিকা হাতির মতো মাথাওয়ালা, চার হাতওয়ালা, লাল রঙের গজাননকে দেখে এতো অবাক হলেন যে তাঁর বুদ্ধিনাশ হলো। রাজজ্যোতিষী নতুন রাজশিশুকে দেখে নিদান দিলেন, "এ শিশু এ রাজবংশে ধ্বংস ডেকে আনবে।" তৎক্ষণাৎ রাজার পাইক বরকন্দাজ শিশুকে রেখে এলো এক গভীর জঙ্গলে, যাতে কোনো হিংস্র জন্তু তাকে খেয়ে ফেলে।

কিন্তু জঙ্গলের কাছেই ছিল পরাশর মুনির আশ্রম। শিশু গজাননের হাসির শব্দে তিনি জঙ্গলে এসে গজাননকে তুলে নিয়ে যান নিজের আশ্রমে। তিনি গজাননের শরীরে দৈবী লক্ষণ দেখেছিলেন। তাই তিনি ও তাঁর স্ত্রী বৎসলা পরম যত্নে গজাননকে বড়ো করতে লাগলেন। এদিকে গজানন যারপরনাই আদরযত্নে বড়ো হচ্ছেন জানতে পেরে শিবপার্বতীও কৈলাসে ফিরে গেলেন।

পরাশরের তত্ত্বাবধানে নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে বেড়ে উঠতে লাগলেন গজানন। যখন তাঁর ন বছর বয়স তখন একটা অদ্ভূত ঘটনা ঘটল। একটা বিশাল ইঁদুর এসে পরাশরের আশ্রম তছনছ করে দিতে লাগল। সমস্ত আশ্রমিক অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। কিন্তু ইঁদুরের বিশালতার সামনে ভয়ে কুঁকড়ে গেল। সমস্ত জানোয়ারও ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। গজানন সে সময় বাইরে খেলছিলেন। হুলস্থূল দেখে তিনি দৌড়ে এলেন আশ্রমে। তিনি আসা মাত্রই ইঁদুর গর্ত দিয়ে গলে মাটির নিচে নিজের বাসায় পালালো। তখন গজানন একটা বিশাল দড়ির আগায় একটা ফাঁস বানিয়ে সেটা মাটির নিচে ইঁদুরের গর্তে গলিয়ে দিলেন। ফাঁস গিয়ে বাঁধল ইঁদুরকে। সে যতই ঝটপট করে ছাড়াবার চেষ্টা করে ততই ফাঁস এঁটে তার গায়ে বসে যায়। তাকে সহজেই গর্ত থেকে উপরে তুলে আনলেন গজানন। বশে এলো ইঁদুর। তখন সে গজাননকে বলল, "আমি এক অভিশপ্ত গন্ধর্ব। দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় তাড়াহুড়ো করে যাচ্ছিলাম একদিন। দেখতে না পেয়ে সেদিন বামন মুনির গায়ে পা লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলাম। মুনি রেগে গিয়ে শাপ দিয়েছিলেন

যে আমি ইঁদুর হয়ে জন্মাব। অনেক কাকুতি মিনতি করে তাঁকে বুঝিয়েছিলাম যে আমি ইচ্ছে করে তাঁকে মাড়িয়ে যাই নি। সব শুনে তিনি বলেছিলেন যে আমি পরাশর ঋষির আশ্রমে গজাননের হাতে বশ হব। তারপর গজানন আমাকে বাহন করবেন। ফলে আমি মানুষের থেকে দেবতার মতো প্রণামও পাব। আমাকে তাহলে বাহন করুন আপনার।" ইঁদুরের কথা শুনে গজানন তার পিঠে চড়ে বসলেন আর ইঁদুর তাঁর বাহন হয়ে গেল।

তখন গজানন তাঁর পালক বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন যে কাজ করতে পৃথিবীতে জন্মেছিলেন সে কাজ সারতে। চার হাত সাজল তাঁর অঙ্কুশ, পাশ, পরশু আর পদ্মে। তারপর ইঁদুরে চড়ে তিনি পৌঁছোলেন সিন্দুরের শহরে। সিন্দুরকে পিছমোড়া করে ধরে দুহাতের

মধ্যে তাকে পিষে মেরে ফেললেন গজানন। দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করলেন, গজাননের স্তব গাইতে লাগলেন। সব দেখে শুনে বরেণ্য রাজা অনুতাপে দগ্ধ হতে লাগলেন আর সাষ্টাঙ্গে গজাননের পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। সে সময় রাজা বরেণ্যকে গজানন যে নীতিকথা শুনিয়েছিলেন তাই গণেশ গীতা নামে খ্যাত। তারপর গজানন মরলোক ছেড়ে চলে যান, ধূম্রকেতু অবতারে কলিযুগে আবার আসবেন বলে।

ছবিঃ মৌসুমী

রামধনু বই

লেখাঃ স্যামুয়েল মারশাক
ছবিঃ মাই মিতুরিচ

অনুবাদঃ দেবজ্যোতি

সবুজ পাতা

এই পাতাটা সবুজ রঙে ছাওয়া,
ঠিক যেন সে ছাওয়া সবুজ গাছে।
ইচ্ছে হলে যেতেই পারে যাওয়া
ঘাস ভরা এক খেলার মাঠও আছে।

ঘাসের ওপর পোকার আসা যাওয়া,
লাল, সাদা, নীল, সবুজ ডানা খুলে
উড়ছে ফড়িং, উড়ছে প্রজাপতি;
বসছে গিয়ে শিশিরভেজা ফুলে।
লাল-কালো রঙ একটা সোনাপোকা
ওই দেখা যায়, একটুখানি দূরে
ছড়িয়ে দিয়ে লাল কালো তার ডানা
হাওয়ায় ভেসে ঘুরছে উড়ে উড়ে।

সফেদ ফ্রকে যমজ দুটি বোন
আসছে নেমে ঘাসের মাথার ফুলে
ঠিক যেন দুই সফেদ বইয়ের পাতা
বন্ধ এখন, যাচ্ছে আবার খুলে

নীল পাতা

এই পাতাটা সাগর রঙের পাতা
জল শুধু জল, নেই কিনারা তার
ছুটছে জাহাজ চষে জলের জমি
বিঁধিয়ে জলে কঠিন প্রপেলার

ছায়ার মত ঘুরছে প্রপেলার
জেলিফিশের ঝাঁকের আসা যাওয়া
নাড়ছে মাথা সমুদ্র শৈবাল
জলের নিচে বইছে বুঝি হাওয়া?

আরও নিচে গভীর অন্ধকার
মাছগুলো সব জ্বালিয়ে গায়ের আলো
দেখাচ্ছে পথ , তাদের সাথে গেলে
অন্ধকারেও দেখতে পাবে ভালো

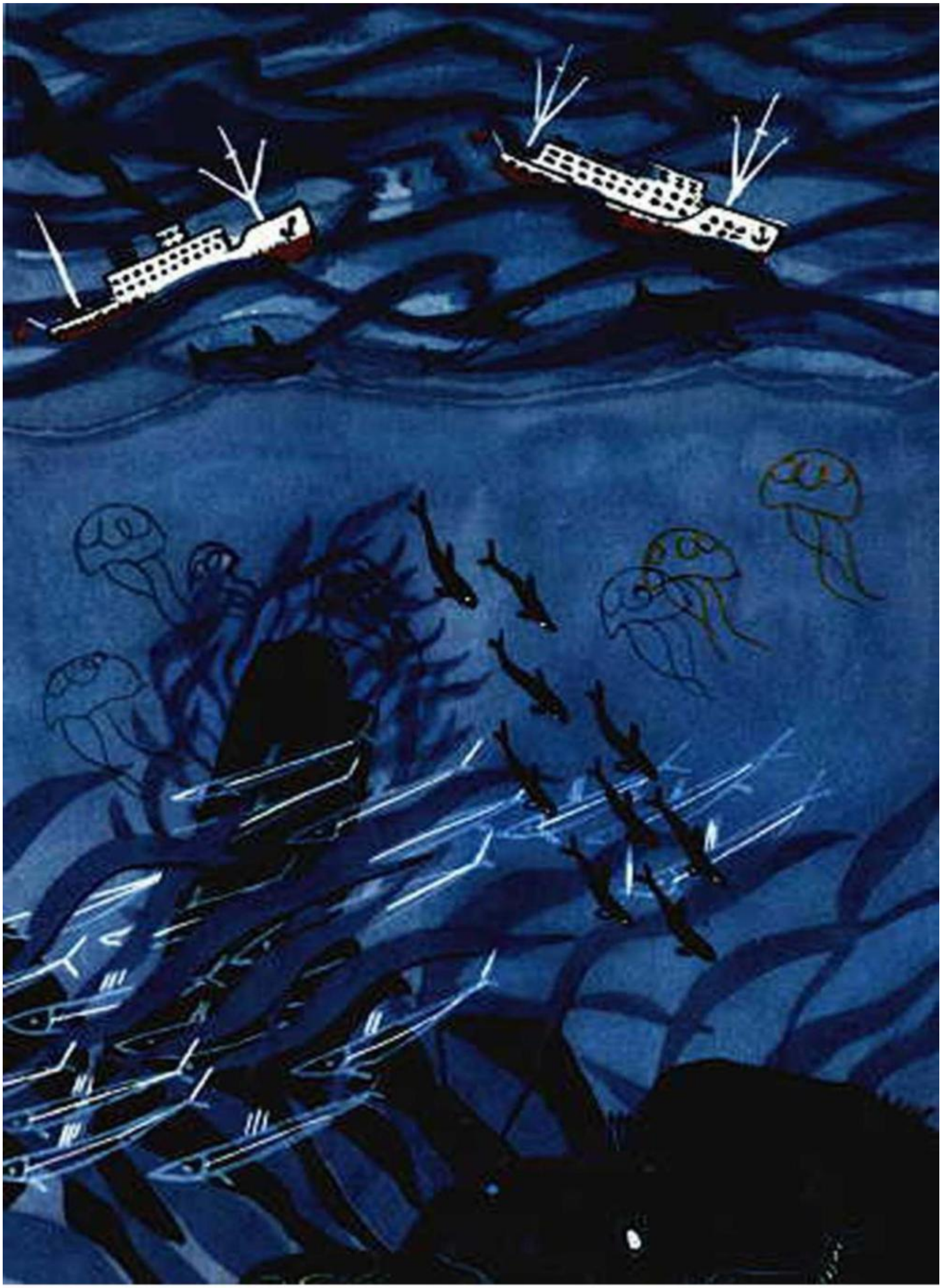

হলুদ পাতা

বালির সঙ্গে খেলতে ভারি মজা
জলের মতই আঙুল বেয়ে ঝরে
বেলচা এনো, বালতি এনো খুঁজে
জমিয়ে বালি প্রাসাদ দেবো গড়ে

ফুলবাগানের গাছগাছালির ফাঁকে
সবুজ ঘাসে ছড়িয়ে হলুদ আলো
এগিয়ে যাওয়া হলদে বালির পথ
হাঁটতে তাতে লাগবে ভারি ভালো।
কিন্তু বালির জন্মভূমির দেশে
(সবাই তাকে বলেন মরুভূমি)
প্রাসাদ, বাগান, গাছগাছালি ফুল
কিছুই খুঁজে পাবেনা আর তুমি

এই পাতা সেই হলুদ মরুভূমি
যেদিকে চাও দেখতে পাবে খালি

হাওয়ার ঝোঁকে শুকনো মাটির বুকে
ঢেউ তুলেছে অন্তবিহীন বালি

বাজিয়ে গলার ঘন্টা রুনুঝুনু
বালির সাগর দিচ্ছে দেখো পাড়ি
রোদঝরানো শুকনো, কঠিন পথে
মরুভূমির জাহাজ উটের সারি

যেদিকে চাই নেইতো প্রাণের সাড়া
পুড়ছে আকাশ উড়ছে বালির ঝড়
বালির ঢিবির বিরাট সৈন্যদল
সার বেঁধে সব ছুটছে নিরন্তর

কিন্তু মানুষ খাল কেটে জল এনে
ভরিয়ে দেবে ঠিক দেখো চার দিক
হঠিয়ে বালি বাগান দেবে গড়ে
হলুদ মাটি সবুজ হবে ঠিক।

সাদা পাতা

এই পাতাটা বরফ দিয়ে ঢাকা
তুষারচিতার নিত্য আনাগোণা
যায়না দেখা পায়ের চিহ্ন তার
চলার আওয়াজ যায়নাকো তার শোনা
সাদার বুকে রঙিন ছবির মতো
উড়ে আসে হরেক রঙের পাখি
পায়ের চাপে জালের মত ছাপ
সাদার গায়ে, দেখতে পেলে নাকি?

হুশহুশিয়ে স্লেজ ছুটে যায় কতো
হারিয়ে যায় বরফ ঢিবির পিছে
খানিক বাদে মিলবে আবার দেখা
অনেক দূরে, অনেক অনেক নিচে।
বরফ জুড়ে হাজার আঁকিবুকি,
স্লেজের চলা, পায়ের চিহ্ন সবই,
ঠিক যেন এই বইয়ের পাতায় আঁকা
মনমাতানো নীল-সাদা এক ছবি।

লাল পাতা

এই পাতাটা টুকটুকে লাল রঙ
ভোর আকাশে সূর্য যেমন ওঠে
তোমার স্কুলে টাইয়ের মতই রাঙা
তোমার শিরায় এ রঙ জেনো ছোটে।

স্বয়ংকন্যা

বীরু চট্টোপাধ্যায়

এবারে তোমাদের আমেরিকার একটি রূপকথা। অনেক অনেক কাল আগে সেখানে বাস করতেন একজন মহামান্য রাজা। সেই রাজার ছিল সবেধণ নীলমণি একটি ছেলে। অপরূপ সুন্দর এক রাজকুমার। বলা বাহুল্য রাজা তাঁর নয়নের মণি এই কুমারকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসতেন।

শিশু বালক হল, বালক হল কিশোর। তারপর একদিন সে রূপবান যুবকে পরিণত হল। রাজা স্থির করলেন এবার ছেলেকে বিয়ে দেবেন। বয়স হয়েছে তাঁর। বৃদ্ধ রাজা ঠিক করলেন এবার নিজে সরে গিয়ে কুমারকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে ধর্মেকর্মে মন দিয়ে অবসরজীবন যাপন করবেন।

একদা রাজা রাজকুমারকে ডেকে পাশে বসিয়ে সস্নেহে গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "বাবা আমি বৃদ্ধ হয়েছি। আর কদিনই বা বাঁচব। এবার তোমার রাজ্য তুমি নাও। আমার মনোবাসনা এবার তোমাকে রাজ্যাভিষেক করে সিংহাসনে বসিয়ে স্বস্তি লাভ করা, নিশ্চিন্ত হওয়া। তাই বলছি, এবার তোমার বিয়ে দেব। অতঃপর সিংহাসনে আরোহণ করে প্রজা শাসন কর।"

বিনীত কুমার মাথা নীচু করে মৃদুকণ্ঠে বললে, "আপনার যা অভিরুচি মহারাজ। আমি সর্বদাই আপনার আজ্ঞাবহ।"

এরপর রাজা যে প্রস্তাব করলেন, শুনে কুমারের চোখ বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে গেল। বলেন কি মহারাজ?

রাজা মৃদু হেসে বললেন, "কিন্তু বৎস, তোমার বিয়ে আমি নিজে দেব না। বিয়ের পাত্রী তোমাকে নিজেই খুঁজে নিতে হবে। যাও অবিলম্বে বেরিয়ে পড়। তারপর উপযুক্ত পছন্দমত এক পাত্রী নির্বাচন করে নিয়ে এস আমার কাছে। তখন আমি তাকেই তোমার বউ করে জাঁকজমক সহকারে ঘরে তুলব। যাও, আর বিলম্ব করো না।"

শুনে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রাজকুমার। কোন মতে ফিসফিসিয়ে বলতে পারল, "আমি আমি মানে আমি পাত্রী কোথায় পাব মহারাজ?"

"এ বিষয়ে আমি কিছু জানি না। জানলেও বলব না। তোমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। তুমি সাবালক যুবা। আজ থেকে তিনটি দিন মাত্র সময় দিলাম তোমাকে। এরই মধ্যে তোমাকে খুঁজে খুঁজে পাত্রী নির্বাচন করে আনতে হবে। আর কোন কথা না। জয়যাত্রায় বেরিয়ে পড়। আমি তোমার শুভকামনা করি সর্বান্তঃকরণে।"

"যথা আজ্ঞা মহারাজ। বলে কুমার কম্পিত দেহে ভীতসন্ত্রস্ত মনে পিতার কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল। সাংঘাতিক চিন্তায় পড়ল সে। এ দুনিয়ার হালচাল সে কিছু জানে না। রাজপ্রাসাদের বাইরে কোন কিছু তার চেনাও নেই। কোথায় যাবে এখন? কী করবে? পাত্রীরা কোথায় থাকে, কোথায় তাদের পাওয়া যায় সে বিষয়ে কুমারের ঘুণাক্ষরেও কোন জ্ঞান নেই। উঃ, ভাবতে ভাবতে প্রায় কান্না এসে গেল কুমারের।

শান্তশিষ্ট লাজুক প্রকৃতির কুমার সর্বাঙ্গে ঘেমে উঠলো। অপরিচিতা মেয়েদের সঙ্গে সে কথা বলবে কী করে? কি মহাবিপদেই না পড়ল সে!

গভীর চিন্তায় যখন সে ব্যাকুল এমন সময় তার ঘরে এল তার ব্যক্তিগত ভৃত্য।

জলে পড়লে যেমন খড়কুটোকে আশ্রয় করবার চেষ্টা করে মানুষ, রাজকুমারও তেমনি জিজ্ঞেস করল চাকরকে, "এই শোন? আচ্ছা, এ রকম ব্যাপার হলে তুই কী করতিস রে? "

"কোন রকম ব্যাপার হুজুর?"

"মানে—এই যদি মনে কর, তোকে বিয়ে করবার জন্যে যদি নিজেকেই পাত্রী খুঁজে নিতে হত, তাহলে তুই কী করতিস, তাই বল!"

চাকর লজ্জায় প্রথমটা নীল হলো। বারতিনেক ঢোক গিলে আমতা আমতা করে বলল, "বিয়ে? আমি হুজুর তো বিয়েই করিনি। তাই বলতে পারব না এ ব্যাপারে। তবে একটা কাজ করলে ভাল হয় না?"

"কাজ, জলদি বল।"

"ঐ ব্যাপারে আমাদের রাজসভার জাদুকরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে হয়না? সে বিজ্ঞ লোক, তার পরামর্শ কাজে লাগতে পারে।"

"ঠিক বলেছিস তো?" কুমার যেন অকূলে কূল পেল। বেশ তো জাদুকরকেই ডেকে নিয়ে আয়।

রাজসভা-জাদুকর এসে বললে, "বলুন, কী আজ্ঞা রাজকুমার?"

"জাদুকরমশাই, বড়ই বিপদে পড়েছি। এই বলে সবিস্তারে বিয়ের ব্যাপারটি জানালো কুমার। বললে, হাতে মাত্র তিনটি দিন সময়। এ ক'দিনের মধ্যে আমার জন্য সুপাত্রী খুঁজে বের করে বিয়ে করতে হবে। কী ঝামেলা বলুন তো? একটা কিছু হদিশ বাতলান।"

রাজ-জাদুকর ঝোলা থেকে স্ফটিক বের করে তার পানে তাকিয়ে রইল বহুক্ষণ, কী যেন বিচার আচার করলো, তারপর তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো হাসিতে। বললে, "রাজকুমার, ভয়ের কোন কারণ নেই। মাভৈঃ। অচিরেই পাত্রী পেয়ে যাবেন। যে মেয়ের গলায় দেখবেন মহামূল্য হার রয়েছে সেই হলো আপনার উপযুক্ত পাত্রী। তাঁকেই বিয়ে করবেন, তিনিই হবেন আপনার যথাযোগ্য রানি।"

"জাদুকরমশাই, তা তো হলো, কিন্তু সে পাত্রীর সন্ধান পেলে তাঁকে সর্বপ্রথম কী বলবো বলে দিন।"

"বলবেন, হে কন্যা, তুমি কি আমায় বিয়ে করে আমার রানি হতে রাজি আছো? আর জিজ্ঞেস করবেন, সে মেয়ে আপনার প্রজাদের ভালোবাসবে কিনা, তাদের হিতকামনা করবে কিনা।

এততেও বুঝি রাজকুমারের মানসিক ভীতি গেল না। খুব বেশি যে ভরসা পেল তাও মনে হল না। বললে, জাদুকরমশাই, সবই তো বুঝলাম। এবার বলুন এখন কোথায় কোনদিকে রওনা হব? রাস্তা-ঘাট কিছুই তো জানি না। আমাদের রাজ্যের সীমানা চৌহদ্দি পর্যন্ত আমার জানা নেই।"

জাদুকর হাসল, "কোন ভয় নেই রাজকুমার নির্ভয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ুন।"

অগত্যা রাজকুমার বেরিয়ে পড়ল ঈশ্বরের নাম করে। সঙ্গে কিছুদূর এগিয়ে দিতে গিয়েছিল রাজ-জাদুকর।

সেইখানে রাস্তা দিয়ে একটি গয়লাদের মেয়ে দুধ বিক্রি করতে যাচ্ছিল। জাদুকর তাকে কাছে ডেকে এনে রাজকুমারকে বললে, এই গয়লানী মেয়ে আপনাদের রাজ্যের সব জায়গাই চেনে জানে। ওকে সঙ্গে নিয়ে ঘরতে থাকুন। আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

গয়লাদের মেয়েকে জাদুকর সব কিছু বলে প্রশ্ন করে, "তুমি রাজকুমারকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে রাজি আছো?"

শান্তশিষ্ট গয়লানী মেয়ে মিষ্টি হেসে মাথা নেড়ে বললে, "কেন যাব না? সানন্দে আমি রাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে চারদিকে যাব।"

শুরু হল রাজকুমারের পাত্রী খোঁজার অভিযান। দুজনে মিলে এদিক সেদিক যত্রতত্র ঘুরতে থাকল। কিন্তু কারুর কণ্ঠেই সেই জাদুকরের বলা মহামূল্য হার দেখতে পেল না।

তা হোক। থামলে তো চলবে না। তিন তিনটে দিন চেষ্টা তো করতেই হবে। পথ চলতে থাকে রাজকুমার ও গয়লা মেয়ে।

এরপর এক সময় দেখা মিলল পরম রূপবতী একমাথা সোনালী চুল সমন্বিত একটি মেয়ের। ঐ তো গলায় তার দেখা যাচ্ছে অমূল্য এক হার।

"রাজকুমার, এই আপনার পাত্রী। এর সঙ্গে কথা বলুন।" গয়লা মেয়ে বলে ওঠে।

কিছুটা লজ্জা লজ্জা ভাব নিয়ে রাজকুমার সুন্দরী মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেল, বললে, "আমি বিয়ের জন্যে পাত্রী খুঁজতে বেরিয়েছি। তুমি কি আমার রানি হবে কন্যা?"

"হ্যাঁ। নিশ্চয়ই হব। তবে আমি কিন্তু সোনার মুকুট মাথায় পরবো, সোনার সিংহাসনে বসবো।"

“আমার তো সোনার মুকুট থাকলেও সোনার সিংহাসন তো নেই কন্যা। তবে হ্যাঁ, সোনার টুকরোসম তুমি আমার প্রজাদের পাবে। তাদের ভালোবাসবে, স্নেহ করবে, পালন করবে, প্রয়োজনমত করুণাও প্রদর্শন করবে।”

“সে কি!” সোনালী চুল মেয়েটি যেন হতাশায় চমকে উঠল, “সেকি? সোনার সিংহাসন নেই? তাহলে সোনা পাব না? তবে আমি চাই না বাপু তোমায় বিয়ে করতে।” একথা বলে সেই মেয়ে দ্রুত সেখান থেকে চলে গেল।

দুজনে ফের পথ চলতে থাকলো। মিনিট ঘন্টা করে সময় কেটে দিন গেল, রাত এল। রাত শেষ হয়ে আবার দিন হল। দুদিন যায় যায়। হায়, হায় হায়, হাতে মাত্র একটি দিন বাকি।

ঘুরতে ঘুরতে পুনরায় আরেকটি অতীব রূপবতী কন্যার দেখা পেল ওরা।

গয়লা মেয়ে আনন্দে ঝকমক করে উঠে বললে, “রাজকুমার, এবার পেয়ে গেছে আপনার বিয়ের কনে। কথাবার্তা বলুন এবার।”

এই রূপবতীর কণ্ঠে দেখা গেল রূপোর তৈরি এক বহুমূল্য হার। এ মেয়ে প্রথমার চেয়েও আরো সুন্দরী।

রাজকুমার এগিয়ে যায় মেয়েটির কাছে। বলে, “আমায় বিয়ে করে আমার রানি হবে?”

কন্যা মুখ তুলে চাইল, অপরূপ হেসে মাথা নেড়ে বললে, “হ্যাঁ হব। তবে আমায় কিন্তু অনেক অনেক রূপোর টাকা দিতে হবে রাজকুমার। আমি সেই টাকা দিয়ে অনেক অনেক জিনিসপত্র কিনবো। পোশাক আশাক, গয়নাগাঁটি, মণিমুক্তা। আমি কিনতে খুব ভালোবাসি।”

“এ তো ভাল কথা। বেশ, তাই তোমায় দেব কন্যা। তবে আমারও একটা শর্ত আছে। আমার প্রজারা আমার খুব প্রিয়। সেই প্রজাদের প্রতি তোমাকে সদয় হতে হবে। তাদের ভালোবাসবে, তাদের স্নেহ করবে, তাদের পালন করবে। বিপদে আপদে তাদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করবে, কেমন?”

“কী করতে হবে? টাকা দিয়ে সাহায্য করতে হবে? সুন্দরী মেয়ে যেন দারুণ চমকে ওঠে। বলে, উঁহু তা হবে না। টাকাপয়সা আমি কাউকে দিতে পারব না। টাকাপয়সা আমার নিজেরই সব লাগবে।”

“বলো কি! তাহলে আমিও তোমাকে বিয়ে করতে পারব না মেয়ে।”

বলে ওরা দুজনে স্থান ত্যাগ করে পথ চলতে শুরু করলো পুণরায় চলতে লাগল। মিনিট ঘন্টা শেষ হয়ে সে দিনটিও একসময় শেষ হয়ে রাত এল। রাত শেষ হয়ে এল তৃতীয় বা শেষ দিন। আর পারে না ওরা হাঁটতে। খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আজ শেষ দিন। ঘুরতে ঘুরতে ওরা এসে পড়েছিল সমুদ্রবেলায়।

গয়লা মেয়ে ক্লান্ত হয়ে সাগরবেলার বালির মধ্যে ধপ করে বসে পড়ে। বলে, “আর পারছি না, উঃ। রাজপুত্র, আপনার বিয়ে হোক আর নাই হোক, আমি আর পারছি না হাঁটতে।”

সহসা ওদের দুজনের নজরে পড়ল সামনের নীল সমুদ্রজল থেকে উঠে আসছে চোখ ঝলসানো রূপবতী এক মেয়ে। গলায় দুলছে মহামূল্য বিরাট আকারের মুক্তো-গাঁথা মালা।

গয়লা মেয়ে সোল্লাসে উঠে দাঁড়িয়ে, “আরে ঐ তো আসছে সমুদ্ররাজ নেপচুনের সুন্দরী মেয়ে। আর ভাবনা নেই রাজকুমার। এ-ই আপনার উপযুক্ত পাত্রী, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যান, এগিয়ে গিয়ে কথাবার্তা বলুন।”

“জলকন্যা শোন,” রাজকুমার সামনে গিয়ে মিষ্টি হেসে বলে, “তুমি আমার রানি হবে?”

“রানি? নিশ্চয়ই হব। তবে একটা কথা, আমি খুব মুক্তো ভালোবাসি। আমায় অনেক মুক্তো দিতে হবে।”

“মুক্তো তো আমার নেই। সব মুক্তোই তো তোমার বাবা সমুদ্ররাজ নেপচুনের আওতায়। নাইবা দিলাম মুক্তো। তুমিই বরং তোমার মুক্তোর মত দয়ামায়া স্নেহ কিছু দিয়ে আমার প্রজাদের বাধিত করতে পার, অনুগৃহীত করতে পার।”

“মুক্তো যখন দেবে না তখন সাফ কথা আমার, তোমায় আমার বিয়ে করতে বয়ে গেছে। ওসব দয়া-ফয়া আমার দ্বারা হবে না বাপু।”

এই বলে সমুদ্ররাজকন্যা ফের ঝুপ করে জলে ঝাঁপ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল অতলে।

“গয়লা মেয়ে, ওঠো। বসলে চলবে না। চলো দেখি, আর কোথাও পাত্রী পাই কিনা। সময় তো আর নেই।”

“আমি আর পারবো না। না না না! আমার পা আর বইছে না। উঃ! ”

"ও কথা বলো না গয়লা মেয়ে। আজ যে শেষ দিন। আজ তো যে করেই হোক পাত্রী খুঁজে পেতেই হবে। ওঠো লক্ষীটি চল!"

প্রবল ভাবে মাথা নেড়ে গয়লা মেয়ে বলে, "আর কোন পাত্রী আমার জানা নেই বাপু।"

মুখ কালো হয়ে যায় রাজকুমারের। হতাশা এসে তাকেও গ্রাস করেছে। সেও শ্রান্ত, ক্লান্ত। হাঁটতে সে নিজেও আর পারছে না। তার পর বসে পড়ে নিজের কথা বলবার মত করে বলে, জানো গয়লা মেয়ে, এ জ্বালাতন আর ভালো লাগে না। "তুমি নিজে যদি পাত্রী হতে তাহলে খুব ভালো হত। তোমার দয়া আছে, মায়া আছে। তুমি প্রজাদের ভালোবাসতে পারতে, এ আমি জানি।"

লজ্জায় রাঙা হয়ে যায় গয়লা মেয়ে। মাথা নীচু হয়ে যায়। মাটির পানে তাকিয়ে বলে, "ধন্যবাদ তোমায় রাজকুমার। আমার রানী হয়ে কাজ নেই। আমি এমনিতেই বেশ আছি। মাঠ-ঘাট বন পাহাড় নদী ঝরনা নিয়ে আমার দিনগুলি সুখে কেটে যাচ্ছে।"

সহসা রাজকুমারের নজর পড়লো গয়লা মেয়ের কণ্ঠের দিকে।

"আরে কি সুন্দর ফুলের মালা ঝুলছে গয়লা মেয়ের গলায়। তাই তো। এই হারের কি তুলনা আছে? জাদুকর না বলেছিল তোমার পাত্রীর কণ্ঠে থাকবে মহামূল্যবান হার! ঠিকই তো, প্রকৃতির ফুল তো মহামূল্যবানই বটে। অতএব এই গয়লা মেয়েই হল আমার সঠিক আর উপযুক্ত পাত্রী। হায় হায়, কি নির্বোধ আমি, এতক্ষন আমার চোখে পড়েনি একে। শুধু শুধু তিন তিনটে দিন বৃথাই হাঁটাহাঁটি করে মরলাম।

"গয়লা মেয়ে?"

"বলুন রাজকুমার।"

"আমার রানি তোমাকে হতেই হবে।"

"কিন্তু রাজকুমার, আমি অতি সাধারণ গয়লা ঘরের এক মেয়ে। আমি তো কোন রাজকুমারী নই!"

"মিথ্যে কথা কে বলে তুমি সাধারণ। তুমিই রাজকন্যা। তুমি প্রকৃতির রাজকুমারী। আমার তুমিই হলে যোগ্য পাত্রী। আমার উপযুক্ত রানী। চল, এবার মহারাজের কাছে যাই।"

"চলুন," আনন্দে ডগমগ, লজ্জায় রাঙা গয়লা মেয়ে বলে ওঠে, "আমি সোনা চাই না রূপো চাই না, চাই না মণি-মুক্তো! শুধু চাই যাতে আপনি রাজা হয়ে সুশাসক হয়ে, সুনামের সঙ্গে প্রজাপালন করতে পারেন। তাহলেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।"

এরপর ওরা ফিরে গেল রাজপ্রাসাদে রাজার কাছে।

তারপর? তারপর মহা ধুমধামে ওদের দুজনের বিয়ে হয়ে গেল।

ছবিঃ সংগৃহীত

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ইমন চ্যাটার্জি

এবারে তোমাদের একজন বিখ্যাত সঙ্গীতবিশারদ, গীতিকার এবং সাহিত্যে সুপরিচিত একজন ব্যক্তির কথা বলব যাঁর জন্মদিনের সার্ধশতবার্ষিকী উপলক্ষে এ বছর নানা অনুষ্ঠান হচ্ছে। তিনি ডি.এল.রায় নামেই বেশিরভাগের কাছে পরিচিত- "ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা" নামক দেশাত্মবোধক গানটির রচয়িতা শ্রী দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম হয়েছিল নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে ১৮৬৩ সালের ১৯ শে জুলাই। তাঁর বাবা ছিলেন কৃষ্ণনগর রাজবংশের দেওয়ান শ্রী কীর্তিকেয়চন্দ্র রায়। মা, বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অদ্বৈত আচার্যের বংশের মেয়ে। তাঁর ছোটবেলা কেটেছিল কৃষ্ণনগরেই। ছোটবেলায় অনেকদিন ম্যালেরিয়ায় ভুগেছিলেন তিনি, কিন্তু এত শরীর খারাপের পরও দমে যাননি। নিয়মিত পড়াশোনা করে ১৮৭৮ সালে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা (মাধ্যমিক পরীক্ষার সেসময়কার নাম), তারপর হুগলি কলেজ থেকে বিএ ও ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে ইংরেজীতে এম.এ পাশ করেন।

ছাত্র অবস্থায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সাহিত্য প্রতিভা একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আর্যগাথা' বের হয় ১৮৮২ সালে। তিনি কিছুদিন ছাপরা জেলার রেভেলগঞ্জ সেমিনারিতে হেডমাস্টারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তারপর তিনি বিলেতে যান কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য। তাঁর বিলেত ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত হত সাপ্তাহিক 'পতাকা' নামক

পত্রিকায়। বিলেতে থাকার সময় তিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীত শেখেন এবং ‘‘লিরিকস অব ইন্ড’’ নামের ইংরিজি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন।

প্রায় তিন বছর পর তিনি দেশে ফিরলে তাঁকে নানা অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছিল কারণ সেই সময়কার সমাজের মানুষরা মনে করতেন বিলেত যাওয়া খুব খারাপ কাজ এবং সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে বলা হয়ে তাঁকে এবং তিনি তা অস্বীকার করায় নানা সামাজিক উৎপীড়নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই সব কাহিনী তাঁর ‘একঘরে’ নামের বইতে তোমরা পাবে। এরপর তিনি সরকারের সেটলমেন্ট অফিসারের কাজে যোগ দেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে যান। এর পরের বছরই তিনি সুরবালা দেবীকে বিবাহ করেন। চাকরিজীবনে তিনি আবগারি বিভাগের ফার্স্ট ইন্সপেক্টর এবং পরে ল্যান্ড রেকডর্স অ্যান্ড এগ্রিকালচার বিভাগের সহকারী নির্দেশক হন। কাজ করেছেন মুর্শিদাবাদ, গয়া, জাহানাবাদ, বাঁকুড়া এমনি অনেক জায়গাতে।

সাহিত্যপ্রতিভা তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব হলেও, সঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করার পেছনে তাঁর পরিবারের অনেকটাই প্রয়াস আছে। তিনি তাঁর সঙ্গীত রচনার মধ্যে অন্যতম হাসির গানগুলিতে পাশ্চাত্য সুর দিয়েছেন, তা তোমরা শুনে থাকবে। তাঁর দেশাত্মবোধক গানগুলিও বাঙালির মনে সাড়া জাগায়। তাঁর রচিত ‘আমার জন্মভূমি’, ‘আমার দেশ’, ‘বঙ্গভাষা’, ‘ভারতবর্ষ’, প্রভৃতি গানগুলো চিরকাল বাঙালির হৃদয়ে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

দ্বিজেন্দ্রলাল মাত্র ৫০ বছর বেঁচেছিলেন। তিনি বহু সামাজিক, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটক এবং অজস্র স্বদেশপ্রীতির গান রচনা করে গেছেন। তাঁর তৈরি করা প্রায় পাঁচশতাধিক গান বাঙলা গানের জগতে দ্বিজেন্দ্রগীতি নামে একটা

বিশিষ্ট সংগীতধারার জন্ম দিয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল, এককালের সুবিখ্যাত সচিত্র মাসিক পত্রিকা "ভারতবর্ষ"-র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে পত্রিকাটির জন্ম হয়েছিল।

এই অসাধারণ গল্পকার,নাট্যকার, গীতিকার তথা সঙ্গীতশিল্পী **১৯১৩** সালের **১৭** ই মে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি পরলোকগমন করলেও তাঁর রচিত 'চন্দ্রগুপ্ত', 'সাজাহান', 'মেবার পতন' এবং 'প্রতাপসিংহ' প্রভৃতি নাটকগুলো আজও বাঙালির মনে দোলা লাগায়।

ছবিঃ সংগৃহীত

নিরালায় রহস্য

অদিতি ভট্টাচার্য

বড়দিনের রোদ ঝলমলে সকাল। গিরিডির বাগান ঘেরা বাংলো 'বাগানবিলাস'-এর লনে দুই ভাইবোন তিতির আর তমাল ব্যাডমিন্টন খেলছে। বাগানবিলাস তৈরি করেন তিতিরের ঠাকুরদা। তিনি ছুটি কাটাতে সপরিবারে এখানে আসতেন। কিন্তু উনি মারা যাবার পর বাড়িটা বেশির ভাগ সময়েই ফাঁকা পড়ে থাকে। দেখাশোনা করার জন্যে আছে কেয়ার টেকার শিউচরণ।

তিতিরের বাবা বা জেঠু বছরে একবার এসে এখানে কয়েকদিন থেকে যান। বেশির ভাগ সময় তিতিরের জেঠুই আসেন। এবার বড়দিনের ছুটিতে ত্রিদিব রায় ও তাঁর স্ত্রী ছন্দা রায় তাঁদের দুই ছেলেমেয়ে তিতির আর তমালকে নিয়ে এসেছেন। তিতির, তমাল অনেক ছোটবেলায় একবার এসেছিল, কিছুই প্রায় মনে নেই। এবার তাই ইচ্ছে গিরিডি, দেওঘর সব বেরিয়ে ফিরবে।

খেলতে খেলতেও দুই ভাইবোনের খুনসুটি সমান তালে চলছে। তিতির একটা গাছ দেখিয়ে ভাইকে বলল, "তুই যে বলিস অনেক গাছ চিনিস, বল তো ওটা কী গাছ?"

তমাল একটু ভেবে বলল, "জামরুল।"

কাছেই শিউচরণ গাছে জল দিচ্ছিল, সে হেসে বলল, "এটা আতা গাছ।"

এই সময়েই মিস্টার রায় বাজার করে ফিরছিলেন। তিনি রিক্সা থেকে বাজার নামিয়ে ভেতরে ঢুকলেন, সঙ্গে তিতির ও তমাল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিসেস রায় জানালেন যে জলখাবার রেডি। খাবার টেবিলে নানা রকম কথা হচ্ছে মিস্টার রায় ছেলেমেয়েকে গিরিডির প্রবাসী বাঙালীদের কথা বলছিলেন। বলতে বলতেই হঠাৎ স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, "ও ছন্দা তোমাকে বলতেই ভুলে গেছি, আজ বাজারে মিস্টার গুপ্তর সঙ্গে দেখা হল, অশোক গুপ্ত, ওই নিরালা বাড়ির, বুঝতে পারছ?"

"নিরালা? বাড়ির নাম নিরালা?" বলে উঠল তমাল।

"হ্যাঁ," বললেন মিস্টার রায়, "আমাদের বাড়ি থেকে সোজা এগিয়ে গেলে যে মোড়টা পড়ে তার বাঁ দিক দিয়ে একটা রাস্তা গেছে, সেটা ধরে কিছুটা এগোলেই একটা দোতলা বাড়ি আছে তার নাম নিরালা। বাড়িটা অনেক পুরোনো, যখন তৈরি হয়েছিল তখন এইদিকে বাড়িঘর, দোকানপাট বিশেষ ছিল না। তাই নাম নিরালা। হ্যাঁ যা বলছিলাম, বাজারে মিস্টার গুপ্তর সঙ্গে দেখা হল। ওঁরাও এখন এখানে আছেন। আমরা এসেছি শুনে বিকালবেলায় ওদের বাড়িতে চা খেতে যেতে বললেন।"

"ঠিক আছে, সবাই মিলে যাওয়া যাবে," বললেন মিসেস রায়।

বিকাল চারটে নাগাদ সবাই মিলে হাঁটতে হাঁটতে রওনা দিলেন "নিরালা"র উদ্দেশ্যে। নিরালা ঠিক বাগান বাড়ি বা বাংলো ধরনের নয়, সাধারণ দোতলা বাড়ি, যদিও অনেকটা জায়গা নিয়ে আর বাড়ির সঙ্গে বড় বাগানও আছে। বাগানে অযত্নের ছাপ সর্বত্র। বাড়িটাও যথেষ্ট পুরোনো, জায়গায় জায়গায় প্লাস্টারের অবস্থা খারাপ।

অশোক গুপ্ত আর তাঁর স্ত্রী পূর্ণিমা বাড়ির সামনেই ছিলেন। অভ্যর্থনা করে সবাইকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। সবাই মিলে গল্পগুজব জমে উঠল, চা-এর সঙ্গে নানারকম টা-ও এসে গেল।

"জানেন তো আপনার বাড়ির নাম শুনে আমার ছেলে খুব অবাক হয়েছে," টেবিলের ওপর থেকে চা-এর কাপ তুলে নিতে নিতে বললেন মিস্টার রায়।

"আসলে এই বাড়ি আমার ঠাকুরদার ছোট ভাই ঈশ্বর অবনীমোহন গুপ্তর তৈরি," জানালেন মিস্টার গুপ্ত, "তিনি খুব অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন, কিছুটা খামখেয়ালিও বটে। অল্পবয়সে একবার এখানে বেড়াতে এসে গিরিডি এতই ভালো লেগে যায় যে এখানেই থেকে যান। পেশায় কবিরাজ ছিলেন। এককালে অবনী কবিরাজ বলতে লোকে একডাকে চিনত। বিয়ে থা করেননি, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই বাড়িতেই ছিলেন। নিরালা নাম ওনারই দেওয়া। তখন নাকি এদিকটা একেবারেই ফাঁকা ছিল।"

"একা থাকতেন অথচ এত বড় দোতলা বাড়ি তৈরি করেছিলেন?" তিতির প্রশ্ন করল।

"ওই যে বললাম খামখেয়ালি মানুষ ছিলেন," হেসে বললেন মিস্টার গুপ্ত, "অবশ্য ওনার মা-বাবা দু-একবার এসে থেকেছেন। অনেক রকম শখ ছিল ওনার জানো তো? প্রচুর বই কিনেছিলেন, কিছু পুরোনো পাণ্ডুলিপি ছিল ওনার সংগ্রহে যেগুলো নাকি উনি অনেক কষ্টে সংগ্রহ করেছিলেন। উনি মারা যাবার পর পাণ্ডুলিপিগুলো আর কিছু দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত বই এশিয়াটিক সোসাইটিতে দিয়ে দেওয়া হয়। অবশ্য বাকি আরও অনেক বই এই বাড়িতে এখনও আছে। আবার ভ্রমণের নেশাও ছিল। হিমালয়ের নানান অঞ্চলে যে কতবার গেছেন ঠিক নেই।"

"বাবা ওনার সম্পর্কে এত কিছু তো জানতাম না," বলে উঠলেন মিসেস রায়।

"হেঁয়ালিতে কথা বলতে ভালবাসতেন, যদিও এমনিতে নাকি কথা কমই বলতেন। এসবই অবশ্য আমার বাবার কাছ থেকে শোনা। আমি ওনাকে কখনো দেখিনি। উনি কলকাতায় যেতেন না। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে খুব একটা যোগাযোগও ছিল না। আমাদের কলকাতার বাড়ির সঙ্গে চিঠির মাধ্যমে যা যোগাযোগ ছিল আর আমার জ্যাঠামশাই আর বাবা মাঝে মাঝে আসতেন," বললেন মিস্টার গুপ্ত।

"তাহলে তো এই বাড়ির সঙ্গে ওনার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে," মন্তব্য করলেন মিস্টার রায়।

"হ্যাঁ সেই জন্যেই তো বাড়িটা আমরা বিক্রি করার কথা ভাবতেও পারি না," মিসেস গুপ্ত বললেন, "এখনো এখানে অনেক জিনিস আছে, যদিও মূল্যবান কিছুই নেই, চোর যে কেন এসেছিল কে জানে!"

"চোর এসেছিল?" মিস্টার রায় অবাক।

"আর বলেন কেন, গত বাইশ তারিখ রাতে আমাদের কেয়ারটেকার মথুরাপ্রসাদ আওয়াজ পেয়ে উঠে পড়ে। আলো জ্বালিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে যে দুজন লোক পাঁচিল টপকে পালাচ্ছে। পরের দিন ও আমাদের ফোন করে ও থানাতেও জানায়। তবে আমার মনে হয় ছিঁচকে চোর। খালি বাড়ি তো, দেখতে এসেছিল কিছু পায় কি না। পুলিশেরও তাই সন্দেহ।"

এসব কিছু শুনে-টুনে তিতির ও তমালের কৌতূহল চরমে উঠছিল। শেষে আর থাকতে না পেরে তমাল বলেই ফেলল, "জেঠু, ওনার জিনিসপত্র দেখা যায় না?"

“কেন দেখা যাবে না? এসো আমার সঙ্গে, আসুন, সবাই আসুন,” মিস্টার গুপ্ত বললেন।

একতলার দক্ষিণ দিকে একটা বড় ঘর ছিল অবনীমোহন গুপ্তর স্টাডি রুম। ঘর থেকে বেরিয়ে রেলিং ঘেরা বড় বারান্দা, তার পরেই বাগান, যদিও বাগানে নামা যায় না, পুরোটাই

রেলিং ঘেরা। রুগী দেখার সময়টুকু ছাড়া অবনীমোহন বেশির ভাগ সময়ই এই ঘরে কাটাতেন। এই ঘর ওঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। বাইরের লোক কাউকে বিশেষ এই ঘরে ঢুকতে দিতেন না। ঘর জুড়ে আলমারি আর ঘরের মাঝখানে একটা বড়, গোল কাঠের টেবিল, তাকে ঘিরে দুটো চেয়ার।

“এই দ্যাখো ওনার ব্যবহৃত খাতা, কলম, দোয়াত,” একটা আলমারি খুলতে খুলতে মিস্টার গুপ্ত বললেন তিতির আর তমালকে।

আলমারির ভেতর কয়েকটা বাঁধানো জাবদা খাতা রয়েছে আর রয়েছে কয়েকটা দোয়াত কলম।

“আমরা ওঁর জিনিসপত্র একই রকম ভাবে রেখে দিয়েছি। মথুরা ঝাড়পোঁছ করে পরিষ্কার রাখে। তাছাড়া এত সব বইপত্র কলকাতার বাড়িতে রাখার জায়গা কোথায়?” বললেন মিস্টার গুপ্ত।

দু ভাই বোন একটা খাতা তুলে নিয়ে দেখছিল। পুরোনো খাতা, হলুদ হয়ে যাওয়া পাতা, সাবধানে না ওল্টালে ছিঁড়ে যাবার সম্ভাবনা।

"এ তো হিসেবের খাতা," একটা খাতা দেখতে দেখতে বলল তিতির।

"না, না মাঝে মাঝে অন্য লেখাও আছে, এই দ্যাখ," তমাল দেখাল, 'গ্রীষ্মে পঞ্চকেদার দর্শন,' 'হিমালয়ে ভেষজ সন্ধান'-কিন্তু কোনো তারিখ নেই, সব এলোমেলো করে লেখা।"

"বললাম না খুব খামখেয়ালি লোক ছিলেন," মিস্টার গুপ্ত বললেন, "কিন্তু কবিরাজ হিসেবে খুব নাম ছিল। নানান জায়গায় যেতেন গাছ-গাছড়ার সন্ধানে।"

আরো কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে তিতিররা ফিরে এল বাগানবিলাসে।

পরের দিন ভোর সাতটা নাগাদ মিস্টার গুপ্তর ফোন এল বাগানবিলাসে। নাকি আগের দিন রাতে চোর এসে অবনীমোহনের স্টাডি রুম তছনছ করে দিয়ে গেছে।

"আমি এখনই গিয়ে একবার দেখে আসি," বললেন হতভম্ব মিস্টার রায়।

তিতির ও তমাল ছাড়ল না, তারাও সঙ্গে গেল। নিরালায় গিয়ে দেখা গেল পুলিশের জিপ বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, মিস্টার গুপ্ত কয়েকজন প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বলছেন। মিস্টার রায়দের আসতে দেখে এগিয়ে এলেন, "দেখুন তো কী ব্যাপার! কালই আমি আপনাদের বলছিলাম যে ছিঁচকে চোর হবে আর দেখুন কাল রাতে এসে স্টাডি রুম একদম লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে। এমনকি দেওয়ালও ভাঙার চেষ্টা করেছে।"

"কী বলছেন! দেওয়াল ভাঙতে চেষ্টা করেছে?" মিস্টার রায় অবাক।

"তাহলে আর বলছি কি? আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কাল রাত দুটোর সময় আমি জল খেতে উঠি। জল খেয়ে ঘরে ফিরে আসছি এমন সময় মনে হল একতলা থেকে আওয়াজ আসছে। আমি সিঁড়ির আলো জ্বালিয়ে কে কে বলে চেঁচিয়ে উঠি, তাতে আমার স্ত্রীও উঠে পড়েন। তারপরেই মনে হল বাগান দিয়ে কেউ পালাচ্ছে। মথুরাও ততক্ষণে জেগে গেছে, ও বেরিয়ে এসে আমাদের ডাকতে শুরু করে। আমরা নিচে নেমে এসে দেখি স্টাডি রুমের এই অবস্থা। আশ্চর্য, অন্য কোনো ঘরে ঢোকে নি। আসুন, দেখবেন আসুন ঘরের কি দশা করেছে।"

স্টাডি রুমে তখন গিরিডি থানার ইনস্পেক্টর ওমপ্রকাশ তিওয়ারি তিন জন কনস্টেবলকে নিয়ে সব কিছু ভাল করে দেখছেন। আলমারিগুলোও বাদ যাচ্ছে না।

"ওই যে দেখুন, ওই জানলা ভেঙে চোর ঢুকেছে," দেখালেন অশোক গুপ্ত। স্টাডি রুম আর বারান্দার মাঝের জানলার কপাট খুলে শিক উপড়ে ফেলে চোর ঘরে ঢুকেছে। সারা ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে বইপত্র, খাতা ও কলম ইত্যাদি। আলমারিগুলোতে তালা ছিল না তাই অনায়াসে খোলা গেছে। দেওয়ালের কয়েক জায়গায় ঠুকে ঠুকে প্লাস্টার খসিয়ে ফেলা হয়েছে।

"আলমারিগুলোতে আপনারা তালা দেন না কেন?" ইনস্পেক্টর তিওয়ারি প্রশ্ন করলেন।

ইনস্পেক্টর তিওয়ারির স্কুল আর কলেজ জীবন কলকাতাতেই কেটেছে তাই বাংলাতে তেমন হিন্দি টান নেই। পড়তেও পারেন বাংলা।

"এমনিতে সব সময় তালা বন্ধই থাকে। কাল আমিই খুলেছিলাম," বললেন মিস্টার গুপ্ত, "মথুরাকে দিয়ে সব ঝাড়পোঁছ করালাম। বিকেলে এঁরা এসেছিলেন, এঁদের সব দেখিয়েছিলাম।"

"এঁরা?" ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ইনস্পেক্টর তিওয়ারি মিস্টার রায়দের দিকে তাকালেন।

"আমি ত্রিদিব রায়, সি ই এস সি তে কাজ করি, সল্টলেকে থাকি। এরা আমার ছেলেমেয়ে তমাল আর তিতির। মেয়ে বি এস সি থার্ড ইয়ারে পড়ে, ছেলে ছোট। ক্লাস নাইনে উঠেছে। এখানে আমাদের একটা বাড়ি আছে, বাগানবিলাস। বিকেলবেলা মিস্টার গুপ্ত আমাদের এই ঘর দেখান। আমার ছেলে মেয়ে হাতে নিয়ে শুধু একটা খাতাই দেখেছে। কিন্তু আপনি আমাদের এরকম সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছেন কেন?" প্রশ্ন করলেন মিস্টার রায়।

"মিস্টার রায়, সবাইকে সন্দেহ করাটাই আমার কাজ যতক্ষণ না চোর ধরা পড়ছে," মুচকি হেসে বললেন ইনস্পেক্টর তিওয়ারি, "যাই হোক মিস্টার গুপ্ত এই ঘর থেকে কিছু মিসিং কিনা দেখেছেন?"

"দেখুন বইপত্র কী কী ছিল আমি সব জানি না, কাজেই বলতেও পারব না। বাঁধানো বড় খাতা গোটা পাঁচেক ছিল, দোয়াত দুটো আর কলম তিনটে।"

"না, না সেসব ঠিক আছে। অন্য কোনো মূল্যবান জিনিস ছিল যার লোভে চোর আসতে পারে? এর আগেও তো একবার কম্পাউণ্ডে চোর ঢুকেছিল।"

"সত্যি কথা বলতে কি সারা বাড়িতেই কোনো মূল্যবান জিনিস নেই। আমি তো বুঝতেই পারছি না চোর এলো কেন হঠাৎ, তাও ছোট ঠাকুরদা মারা যাবার এতো বছর পরে, আবার দেওয়ালও ভাঙার চেষ্টা করেছে।"

"কিন্তু কিছু তো আছে যার লোভে চোর এসেছিল। দেওয়ালে বোধহয় ঠুকে ঠুকে কিছু খোঁজার চেষ্টা করেছিল। খুব একটা পাকা চোরের কাজ বলে মনে হয় না। তাড়াহুড়োয় পালাতে গিয়ে সব জিনিসপত্র ফেলে গেছে ছেনি, হাতুড়ি আর ওই নাইলনের বাজারের ব্যাগটা। মনে হয় দুজন এসেছিল। বাগান দিয়ে এসে রেলিং টপকে বারান্দায় ঢুকেছে। বারান্দার সামনে বাগানে যেখানে ফুলগাছ লাগানো আছে সেখানে ভিজে মাটিতে দু'রকম জুতোর ছাপ পড়েছে। আপনি কাউকে সন্দেহ করেন?"

"না সন্দেহ করার মত কেউ নেই। মথুরা খুব বিশ্বাসী লোক, অনেক বছর আছে।"

"আমার ধারণা চোর যা খুঁজতে এসেছিল তা পায় নি, তাই আবার আসতে পারে। রাতে পাহারার ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। আপনি পারবেন অ্যারেঞ্জ করতে?"

"আমি তো এখানে কাউকে বিশেষ চিনি না।"

“ঠিক আছে সন্ধ্যেবেলায় আমি দুজনকে পাঠিয়ে দেব, দুবে, নাইলনের ব্যাগটা নিয়ে চলো।”

“একটা কথা বলব?” হঠাৎ বলে উঠল তিতির।

ইনস্পেক্টর তিওয়ারি ঘুরলেন ওর দিকে, “হ্যাঁ বলো।”

“আমরা ওই খাতাগুলো নিয়ে যেতে পারি? ভালো করে দেখব।”

“ওগুলো তো হিসেবের খাতা, মিস্টার গুপ্তও তাই বললেন। ওর মধ্যে আর কিছুই নেই। তোমরা ওগুলো কি দেখবে?”

“না, না শুধু হিসেব নয়, মাঝে মাঝে অন্য কথাও লেখা আছে,” বলে উঠল তমাল।

“অন্য কথা?” ইনস্পেক্টর তিওয়ারি টেবিল থেকে একটা খাতা তুলে নিয়ে দেখতে লাগলেন। বেশ কয়েকটা পাতা ওল্টানোর পর এক জায়গায় এসে থেমে গেলেন। বললেন, “ও এই যে লেখা রয়েছে, ‘প্রবল বর্ষণে পূজার আনন্দ বিঘ্নিত’—এইগুলোর কথা বলছ?” ইনস্পেক্টর তিওয়ারি হেসে খাতাটা আবার টেবিলের ওপর রেখে দিলেন।

তিতির ও তমাল দমে গেলেও হাল ছাড়ল না। তমাল বলল, “তাহলে নিয়ে যাই খাতাগুলো?”

“তোমাদের কি মনে হয় এগুলো থেকে তোমরা কিছু বুঝতে পারবে? খুব গোয়েন্দা গল্প পড়ো তাই না?” ইনস্পেক্টর তিওয়ারির পাল্টা প্রশ্ন।

মিস্টার রায় অপ্রস্তুতে পড়ে গেলেন। কি ভেবে ভদ্রলোক বললেন, “ঠিক আছে নিয়ে যাও যদি মিস্টার গুপ্তর কোনো আপত্তি না থাকে আর কোনো সাহায্যের দরকার হলে বোলো,” ইনস্পেক্টর তিওয়ারি চলে গেলেন।

মিস্টার গুপ্তর কোনো আপত্তি নেই, তাই দুই ভাই বোন সবকটা খাতা নিয়ে বাগানবিলাসে ফিরে এলো।

•

দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পর তিতির আর তমাল সামনের বারান্দায় রোদ্দুরে বসে খাতাগুলো দেখছিল।

“হিসেব লেখার কি অদ্ভুত কায়দা রে বাবা, তারিখও লেখে নি,” বলল তমাল।

“তার মধ্যে আবার কবিরাজি ওষুধের নাম আছে, গাছের ছবি আছে,” তিতির বলল দেখতে দেখতে।

“ইনস্পেক্টর ঠিকই বলেছেন, এই সব খাতা থেকে কিছু পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।”

“প্রতিটা খাতার প্রতিটা পাতা ভালো করে দেখতে হবে। তুই এতো অধৈর্য কেন?”

“আরে এইখানে কী লেখা?” দেখতে দেখতে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল তমাল।

তিতির তমালের হাতে ধরা খাতাটার ওপর ঝুঁকে পড়ল। বাজার-খরচের হিসেবের মাঝে লেখা রয়েছে, "গজপতি সিং-এর আরোগ্য লাভ,

আমার হইল পালকি লাভ।"

"তার মানে গজপতি সিং বলে কাউকে উনি সারিয়ে তুলেছিলেন," উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল তমাল, "আর ওনার একটা পালকি লাভ হয়েছিল মানে উনি একটা পালকি পেয়েছিলেন?"

তিতির ভাবতে লাগল, "এটা অশোক জেঠুকে ফোন করলে জানা যেতে পারে। দাঁড়া বাবাকে বলি ফোন করতে।"

তিতির উঠে ভেতরে চলে গেল।

ফোন করে জানা গেল মধুপুরের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী গজপতি সিংকে এক দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে অবনীমোহন সুস্থ করে তোলেন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ উনি অবনীমোহনকে একটা হাতির দাঁতের পালকি উপহার দেন। পালকির সঙ্গে গজপতি সিং-এর লেখা একটা চিঠিও ছিল। দুটোই এখন মিস্টার গুপ্তদের উত্তর কলকাতার বাড়িতে রয়েছে।

"তার মানে কিছু কিছু কথা উনি এরকম ভাবে খাতায় লিখে রাখতেন," তিতির বলল।

"দ্যাখ ভালো করে দ্যাখ, আর কিছু পাস কি না," মিসেস রায়ও উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন।

"না, এই খাতাটায় আর কিছুই নেই," হতাশ হয়ে বলল তমাল।

"এতো দেখছি কোন খাতাটা কবেকার, কোনটা আগের, কোনটা পরের কিছুই বোঝার উপায় নেই। কোনো তারিখ নেই। থাকলেও শুধু দিন, মাস বা সালের কোনো উল্লেখ নেই। সত্যিই খুব অদ্ভুত মানুষ ছিলেন," একটা খাতা দেখতে দেখতে বললেন মিস্টার রায়।

দেখতে দেখতে বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে রাত হয়ে গেল। দুই ভাই বোন খাতা নিয়েই পড়ে আছে। মাঝে মাঝে তাদের মা বাবাও যোগ দিচ্ছেন। নতুন এমন কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না যা গুরুত্বপূর্ণ। হঠাৎ তিতিরের নজর গেল একটা পাতায় যেখানে লেখা বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর এই বক্তব্য-

"ইহা সংরক্ষণ করা কর্তব্য।
তাহা হইলে বাড়িবে পসার,
মিলিবে সম্মান, মিলিবে কদর।"

তিতির জোরে জোরে ছড়াটা পড়ল, "তার মানে কোনো বুড়ো সন্ন্যাসী অবনীমোহনকে কিছু সংরক্ষণ করতে বলেছিলেন যাতে ওনার পসার বাড়ে।"

"কিন্তু কী দিতে পারেন সন্ন্যাসী?" তমালের প্রশ্ন।

"কোনো ঠাকুরের মূর্তি-টুর্তি হতে পারে," বললেন মিসেস রায়।

"তা যদি মূল্যবান হয়, ওই বাড়িতেই থেকে থাকে আর সে কথা যদি বাইরের লোক জানে তাহলে তার জন্যে চোর আসতেই পারে," মন্তব্য করলেন মিস্টার রায়।

"অশোক জেঠু নিশ্চয়ই জানবেন," তমাল বলল।

"হ্যাঁ, আর সেটা কোথায় রাখা আছে সেটাও বলতে পারবেন। বাবা, তুমি ফোন করো না, সবে তো সাড়ে দশটা বাজে," তিতির উত্তেজিত হয়ে পড়েছে।

মিস্টার রায় ফোন করে জানলেন যে এরকম কোনো জিনিসের কথা ওঁরা জানেনই না। মিস্টার গুপ্ত বরং অবাক হয়ে গেছেন এই কথা শুনে।

"যাঃ, তাহলে কিছুই জানা গেল না। সন্ন্যাসী কী দিয়েছিলেন, সেটা কোথায় রাখা আছে," তমাল হতাশ।

“বাকি খাতাগুলো ভালো করে দেখি,” আরেকটা খাতা হাতে তুলে নিয়ে বলল তিতির। এই খাতার তিন নম্বর পাতায় লেখা আছে, “নব সংস্কার।”

“তার মানে?” তিতির ভুরু কুঁচকে লেখাটার দিকে তাকিয়ে রইল।

“সংস্কার শব্দটার একটা অর্থ সারানো,” মিসেস রায় বললেন।

“তার মানে কি কোনো কিছু সারানো হয়েছিল? কী সারানো হয়েছিল?” তিতির ভাবতে লাগল।

“কালকে মিস্টার গুপ্তকে আবার ফোন করলেই হবে। যাও তোমরা এবার শুয়ে পড়ো, রাত হয়ে গেছে,” বললেন মিসেস রায়।

তাঁরা শুতে চলে গেলেও তিতির আর তমাল খাতা নিয়েই পড়ে রইল। তমাল আগের খাতাটাই মানে যে খাতাটাতে সন্ন্যাসীর ছড়াটা লেখা ছিল সেটাই আবার ভালো করে দেখছিল।

হঠাৎ সে তিতিরকে বলল, “দ্যাখ, দিদি যে পাতায় ছড়াটা লেখা আছে তার ঠিক দুটো পাতা পরে এটা আঁকা আছে।”

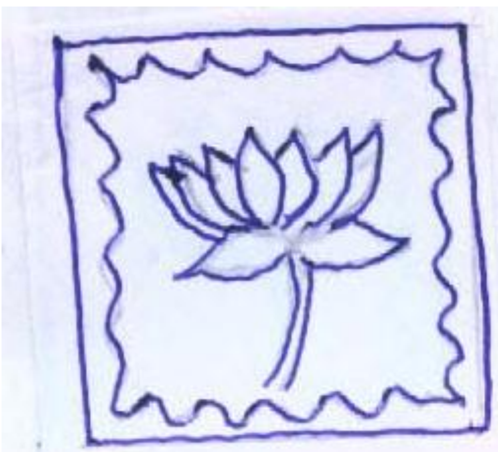

তিতির ঝুঁকে পড়ে দেখল পাতার শেষের দিকে একটা নক্সা আঁকা আছে।

“কি হতে পারে এটা?” তিতির চিন্তা করতে লাগল।

“আর তো মাত্র দুটো খাতাই দেখা বাকি আছে, তাই না?” জানতে চাইল তমাল।

বাকি দুটো খাতার একটাতে উল্লেখযোগ্য কিছুই পাওয়া গেল না। আরেকটা খাতায় দেখা গেল শেষের কয়েকটা পাতা ফাঁকা।

“এটাই কি তবে শেষ খাতা?” তিতিরের জিজ্ঞাসা।

এই খাতাটার একটা পাতায় লেখা আছে, “অমূল্য সম্পদ রক্ষিত যথাস্থানে, পবিত্র স্থানে, অতি সংগোপনে।”

“তার মানে, তার মানে, সত্যিই কিছু লুকোনো আছে ওই বাড়িতে যার লোভে চোর এসেছিল,” তমাল উত্তেজিত।

“হ্যাঁ, তা তো ঠিকই, কিন্তু কী হতে পারে সেটা? আর কোথায়ই বা সেটা লুকোনো আছে?”

“যেটা সন্ন্যাসী দিয়েছিলেন সেটা?”

"হতে পারে। এবার বোঝা যাচ্ছে চোর কেন দেওয়াল ঠুকে ঠুকে দেখেছিল। দেওয়ালের মধ্যে কোথাও কিছু লুকোনো আছে ভেবেছিল।"

"এটার কথা বাইরের লোক জানে অথচ বাড়ির কেউ জানে না। আশ্চর্য তাই না?"

"কী হতে পারে এই অমূল্য সম্পদ?"

"গুপ্তধন? চোরা কুঠরিতে লুকোনো আছে?"

"কে জানে? সন্ন্যাসীই বা কী দিয়েছিল? পবিত্র স্থানই বা কোনটা? না, মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। চল্ শুয়ে পড়ি।"

"ইনস্পেক্টর তিওয়ারি চোর ধরতে পারলেন কি না কে জানে?" শুয়ে পড়তে পড়তে তমাল বলল, "দিদি, তুই কি ভেবেছিলি যে গিরিডিতে বেড়াতে এসে গুপ্তধনের খবর পাওয়া যাবে?"

তিতির শুধু হাসল, কিছু বলল না।

পরের দিন ভোরবেলাতেই ছেলে-মেয়ের বায়নায় মিস্টার রায়কে নিরালায় ফোন করতে হল। "অমূল্য সম্পদ"-র কথা শুনে তো মিস্টার গুপ্ত স্তম্ভিত। ফোনেই জানালেন যে, লেখাটা দেখতে তিনি এখনই আসছেন। মিনিট কুড়ির মধ্যেই মিস্টার গুপ্ত সস্ত্রীক বাগানবিলাসে পৌঁছে গেলেন।

"তোমরা দুজনে খাতাগুলো এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছো বলেই এসব জানা গেল," বললেন মিসেস গুপ্ত।

"আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না যে ছোট ঠাকুরদা এসব কীর্তি করে গেছেন," মিস্টার গুপ্ত তখনও অবাক, "এটা বোঝা যাচ্ছে যে চোর কেন এসেছিল, কিন্তু একথা জানত কে? যাই হোক, আমার মনে হয় তিওয়ারিজিকে এসব কথা জানানো উচিত।"

ওনারা উঠে পড়লেন আর তার কিছুক্ষণ পরেই ইনস্পেক্টর তিওয়ারির জিপ এসে দাঁড়াল বাগানবিলাসের সামনে।

"তোমরা দুজনে খুব কাজের কাজ করেছ," তিওয়ারি তমালের পিঠ চাপড়ে দিলেন, "চুরির মোটিভটা অন্তত বোঝা গেল। দেখো আরো কিছু বার করতে পারো কি না।"

"চোরের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল?" মিস্টার রায় জিজ্ঞেস করলেন।

"সন্ধান তো পাওয়া গেছে, শুধু ধরার অপেক্ষা," রহস্যময় হাসি হাসলেন ইনস্পেক্টর তিওয়ারি।

"কে এসেছিল, চুরি করতে, বলুন না," অধীর আগ্রহে তমালের প্রশ্ন।

"ওসব এখন বলা যাবে না। আমি এখন যাচ্ছি, তোমরা নতুন কিছু বুঝতে পারলে জানিও," জিপে উঠে চলে গেলেন ইনস্পেক্টর তিওয়ারি।

"এ কী সাসপেন্সে রেখে গেল রে বাবা," তমাল বিরক্ত।

তিতির চুপ। “অমূল্য সম্পদ” এখন ওর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

বিকেলবেলায় মিস্টার রায় সপরিবারে নিরালায় উপস্থিত হলেন। তিতিরের মা বাবা বেশ অপ্রস্তুত। ইনস্পেক্টর তিওয়ারি ইতিমধ্যে জানিয়েছেন, যে চোর ধরা পড়েছে। মিস্টার রায়ের অনুরোধ মত তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই নিরালায় আসছেন। সবাই তাঁর জন্যেই অপেক্ষা করছেন। ইনস্পেক্টর তিওয়ারি আসতেই মিস্টার গুপ্ত চোরের কথা জানতে চাইলেন।

“বলছি পরে, তার আগে শুনি এরা কী রহস্য ভেদ করল?” তিনি ওদের দিকে তাকালেন।

“আমাদের মনে হয় অবনীমোহন পবিত্র স্থান বলতে বাড়ির ঠাকুরঘরকে বুঝিয়েছেন,” তিতির বলল।

“হঠাৎ তোমার ঠাকুরঘরের কথা মনে এল কেন?” জানতে চাইলেন ইনস্পেক্টর তিওয়ারি।

“আজকে দুপুরে খেতে বসে মা বলছিলেন যে দেওঘরে বৈদ্যনাথ মন্দিরে পুজো দিতে হবে, খুব পবিত্র জায়গা, এত কাছে এসে মন্দিরে যেতে না পারলে খুব আপশোস থেকে যাবে। তখনই আমার মাথায় আসে “পবিত্র স্থান” মানে মন্দির নয় তো? খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, এই বাড়ির কাছাকাছি কোনো মন্দির নেই, কিন্তু দোতলায় বড় ঠাকুরঘর আছে যেখানে অবনীমোহন নিয়মিত পুজো করতেন।”

“এক্সলেন্ট,” বলে উঠলেন ইনস্পেক্টর তিওয়ারি।

“আপনারা এখন ঠাকুরঘরের দেওয়াল, মেঝে সব খুঁড়ে দেখবেন নাকি?” মিসেস গুপ্ত আঁতকে উঠলেন।

“কিন্তু সত্যিই কিছু আছে কি না সেটা তো দেখতে হবে, তাই না? চলুন যাওয়া যাক,” ইনস্পেক্টর তিওয়ারি সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

দোতলায় ঠাকুরঘরে গিয়ে দেখা গেল ঘরের মাঝখানে একটা কিছু বড় জিনিস কাপড় দিয়ে ঢাকা রয়েছে। কাপড়টা তুলতে দেখা গেল ওটা একটা উঁচু পায়াযুক্ত শ্বেতপাথরের বড়, ফাঁকা সিংহাসন।

“ছোট ঠাকুরদা মারা যাওয়ার পর যেহেতু এখানে কেউ থাকার ছিল না তাই ঠাকুরের মূর্তি, ছবি ইত্যাদি সব বাবা আমাদের কলকাতার বাড়িতে নিয়ে আসেন। কিছু বাসনপত্রও নিয়ে আসেন আর ওনার সব জামাকাপড় এখানকার গরীব লোকেদের দিয়ে দেওয়া হয়,” জানালেন মিস্টার গুপ্ত, “শুধু ওনার ব্যবহৃত জিনিসপত্র যেমন খাতা, কলম, চশমা, চিরুনি, ব্যাগ ইত্যাদি সব এখানেই রেখে দেওয়া হয়। আসবাবপত্রও একই রকম ভাবে রাখা রয়েছে।”

“ঠাকুরের কোনো মূর্তি কি খুব দামি ছিল?” ইনস্পেক্টর তিওয়ারি জানতে চাইলেন।

“দুটো মাটির মূর্তি ছিল, তাও অনেক বছর আগে বিসর্জন দেওয়া হয়ে গেছে,” হাসলেন মিস্টার গুপ্ত।

"এই ঘরটাই ভালো করে দেখতে হবে," ইনস্পেক্টর তিওয়ারি একটা ছোট লাঠি দিয়ে দেওয়াল ঠুকে ঠুকে দেখতে লাগলেন কোথাও ফাঁপা আছে কি না। হঠাৎ তাঁর চোখ গেল সিংহাসনের দিকে।

"আগে এটাকেই ভালো করে চেক করা যাক," তিনি সিংহাসনের দিকে এগিয়ে গেলেন। দেখাদেখি তিতির, তমালও এগিয়ে গেল। সবাই মিলে সিংহাসনটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। ইনস্পেক্টর তিওয়ারি মাটিতে শুয়ে সিংহাসনের নিচটা দেখতে লাগলেন। দেখতে দেখতে খেয়াল করলেন একটা পাথরের টুকরো যেন আলগা ঢাকনার মতো লাগানো আছে। হাত দিয়ে অনুভব করে বুঝতে পারলেন যে তাঁর অনুমান নির্ভুল।

"এই যে এইখানেই কিছু আছে, পাথরটা খুলতে হবে," মাটিতে শুয়ে শুয়েই ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন।

কিন্তু হাত দিয়ে অনেক চেষ্টা করেও খোলা গেল না, বহু বছর না খোলার কারণে একদম আটকে গেছে।

"এটাকে কাত করতে হবে, না হলে পাথরটাকে খোলা যাবে না। আমি নিচ থেকে দুজনকে আসতে বলি," সিংহাসনের তলা থেকে বেরিয়ে এসে বললেন ইনস্পেক্টর তিওয়ারি।

নিচ থেকে দুজন কনস্টেবল এল। সবাই মিলে অনেক চেষ্টা করে ওই অসম্ভব ভারী সিংহাসনটাকে পেছনের দেওয়ালে হেলান দিয়ে কাত করলেন। ইনস্পেক্টর তিওয়ারি একটা শাবল দিয়ে পাথরের খাঁজে চাড় দিতেই আস্ত পাথরের টুকরোটা ঢাকনার মতো খুলে বেরিয়ে এল আর তার সঙ্গে বেরিয়ে এল একটা আয়তাকার কাশ্মীরি কাজ করা কাঠের বাক্স। ইনস্পেক্টর তিওয়ারি আর কনস্টেবল দুজন খুব সতর্ক ছিলেন বলে কোনটাই মেঝেতে পড়ল না।

কাঠের বাক্সতে কোনো তালা নেই, সহজেই খোলা গেল। ওপরেই রাখা রয়েছে একটা সোনার ছোট তাবিজ যার ওপরে পদ্মফুলের নক্সা করা।

"আরে এটা তো অবিকল খাতার আঁকাটার মতো দেখতে," ভাই-বোন একসঙ্গে বলে উঠল।

তাবিজটা ১ ইঞ্চি X ১ ইঞ্চি X ১/২ ইঞ্চি সোনার একটা ছোট বাক্স, তাবিজের নিচে রয়েছে লাল শালুতে সযত্নে মোড়া একটা বাঁধানো খাতা।

মিস্টার গুপ্ত খাতাটা খুললেন, "এ তো সব কবিরাজি ওষুধ-বিষুধের কথা লেখা।"

দেখা গেল খাতাটার পাতায় পাতায় নানা দুরারোগ্য অসুখের কবিরাজি ওষুধের নাম ও তাদের প্রস্তুত প্রণালী লেখা রয়েছে। অবনীমোহনের সারা জীবনের অভিজ্ঞতা ও গবেষণার ফল।

"এটাকেই কি উনি "অমূল্য সম্পদ" বলে গেছেন?" তিতিরের জিজ্ঞাসা।

“সত্যিই তো এটা অমূল্য সম্পদ। এর কী দাম হবে, বুঝতে পারছেন মিস্টার গুপ্ত? যে কোনো ওষুধ কোম্পানি এ জিনিস পেলে লুফে নেবে,” বললেন মিস্টার রায়।

“এই তাবিজটার কী ব্যাপার, এটার মধ্যে কী আছে?” ইনস্পেক্টর তিওয়ারি বললেন।

উনি ওটাকে কানের কাছে এনে নাড়িয়ে বললেন, “গুঁড়ো গুঁড়ো কিছু আছে মনে হচ্ছে। তবে পাথর-টাথর কিছু বা বড় কিছু নেই, থাকলে নাড়লে জোরে আওয়াজ হত।”

“নিশ্চয়ই ওই গুঁড়ো গুঁড়ো জিনিস কোনো সন্ন্যাসী ওনাকে দিয়াছিলেন আর উনি ওটা তাবিজে ভরে রেখে দিয়েছিলেন। এতক্ষণে ওই ছড়াটার মানে বোঝা গেল,” তিতির বলল।

“তাহলে তাবিজটা আর খোলার দরকার নেই, যেরকম আছে সেরকমই থাক। হয়তো শুকনো ফুল-টুল কিছু আছে,” বললেন মিসেস গুপ্ত।

“এই সিংহাসনটাতে ওই খোপটা উনি পরে তৈরি করান নিশ্চয়ই এবং সেটাকেই উনি নব-সংস্কার বলে খাতায় লিখে গেছেন। পরে যখন কাঠের বাক্সটা এর মধ্যে ঢোকান, তাবিজটাও পুরে দেন ভেতরে,” সংকেতের সমাধানে তমাল উল্লাসিত।

“তোমরা দুজনে সত্যিই দারুণ কাজ করেছ,” বললেন মিস্টার গুপ্ত, “কিন্তু সবই তো হল, চুরি করতে কে এসেছিল তা তো জানা গেল না।”

ইনস্পেক্টর তিওয়ারি হাসলেন, “চোরও ধরা পড়েছে মিস্টার গুপ্ত। সব বলছি, চলুন নিচে আপনার ড্রয়িং রুমে।”

“পূর্ণিমা একটু চা-টা-এর ব্যবস্থা করো,” মিস্টার গুপ্ত স্ত্রীর দিকে তাকালেন।

সবাই ড্রয়িং রুমে এসে বসেছে, অধীর আগ্রহে সবাই অপেক্ষা করছে চোর কে জানবার জন্যে।

ইনস্পেক্টর তিওয়ারি বলতে শুরু করলেন, "চোরেরা স্টাডি রুমে তাদের একটা ব্যাগ ফেলে যায়। তার মধ্যে স্ক্রু ড্রাইভার ভরা একটা ছোট ব্যাগও ছিল যাতে লেখা ছিল-- সুজাতা ইলেক্ট্রিকালস। এই দোকানটা স্টেশন রোডের মোড়ে যে বাজারটা আছে সেখানে বছর খানেক হল খুলেছে। এই রকম ব্যাগ সাধারণত দোকান থেকে কাস্টমারদের গিফট করা হয়। তাই শুধুমাত্র এই ব্যাগ দেখে কাউকে সন্দেহ করা যায় না। তবু আমি একবার সুজাতা ইলেক্ট্রিকালসের মালিকের বাড়িতে যাই, সেইদিনই দুপুরবেলা। বাড়িতে গেলে চাকর বলল যে, মালিকের শরীর খারাপ, সে ঘুমোচ্ছে। আমি বেরিয়ে চলে আসছিলাম, হঠাৎ আমার চোখে পড়ল বাগানের ভিজে মাটিতে জুতোর ছাপ, যে রকম ছাপ আমি আপনার বাড়িতে ফুলগাছের পাশে দেখেছিলাম।

আমি আবার ফিরে গিয়ে চাকরটার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করি। ও কোথায় থাকে জানতে চাই। ও বলল যে বাড়ির পেছনে একটা ছোট ঘরে ও থাকে। আমি সেই ঘর দেখতে যাই, দেখি ঘরের সামনে একজোড়া হাওয়াই চটি পড়ে আছে যাতে অল্প হলেও বালি, সিমেন্টের গুঁড়ো লেগে ছিল। অথচ চাকরের বক্তব্য গত দুদিন সে বাড়ি ছেড়ে কোথাও যায় নি আর বাড়িতেও কোথাও বালি, সিমেন্টের কাজ হচ্ছে না। আমার সন্দেহ জোরদার হল। একপাটি চটি তুলে নিয়ে দেখে বুঝলাম এর ছাপও এ বাড়িতে পাওয়া দ্বিতীয় ছাপের সঙ্গে মিলবে। আমি আর কিছু না বলে দুজন কনস্টেবলকে আড়াল থেকে বাড়ির ওপর নজর রাখতে বলে থানায় ফিরে এলাম।"

"কিন্তু ইলেক্ট্রিক দোকানের মালিক আমাদের বাড়ির সব খবর জানল কী করে?" কথার মাঝখানেই বলে উঠলেন মিস্টার গুপ্ত।

“বলছি, বলছি সব বলছি,” ইনস্পেক্টর তিওয়ারি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, “আপনার মনে আছে মিস্টার গুপ্ত আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে এখানে আপনার কোনো পরিচিত বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজন থাকে কি না। আপনি প্রথমে বলেছিলেন যে কেউ থাকে না, পরে মনে করে বলেছিলেন যে আপনার এক দূর সম্পর্কের পিসী, পিসেমশায়ের বাড়ি ছিল গিরিডিতেই। তাঁরা অনেক দিন মারা গেছেন, তাঁদের ছেলে আগে সপরিবারে এখানে থাকতেন কিন্তু তাঁরাও বাড়ি বিক্রি করে বছর দশেক আগেই তাঁদের বর্ধমানের বাড়িতে চলে গেছেন। আমি আপনার কাছ থেকে সব ডিটেলস্ নিয়ে নিই। ইতিমধ্যে আমি সুজাতা ইলেক্ট্রিকালসের মালিক চন্দন সম্পর্কেও খোঁজ খবর নিতে শুরু করি। এই চন্দন কে অনুমান করতে পারেন মিস্টার গুপ্ত?”

“কে?” মিস্টার গুপ্ত হতভম্ব।

“আপনার দূর সম্পর্কের পিসতুতো ভাই রজত দাশগুপ্তর ছেলে। সুজাতা হচ্ছে চন্দনের মার নাম।”

“কিন্তু ওঁরা তো এখান থেকে অনেক বছর আগেই চলে গেছেন, ওঁদের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগও নেই।”

“না, তা নেই। তাই আপনি জানেন না যে চন্দন বছরখানেক আগে এখানে ফিরে এসে দোকান খুলেছে, বর্তমানে ওর ব্যবসা ভালো চলছিল না। ওর বাবা আপনার ঠাকুরদার শেষ বয়সে খুব দেখাশোনা করেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে উনি রজত দাশগুপ্তকে বলেছিলেন যে এই বাড়িতে উনি কোনো অমূল্য সম্পদ রেখেছেন। চন্দন ছোটবেলায় এটা ওর বাবার কাছ থেকে শোনে। এখানে আসার পর ও যখন দেখে, যে বাড়িটা এখনও ঠিকঠাক আছে আর বিক্রিও হয়ে যায় নি, ও লোভে পড়ে ওর চাকরকে সঙ্গে নিয়ে চুরির চেষ্টা করে।

প্রথম বার মথুরা জেগে যাওয়ায় পালাতে হয়। এরপরই আপনারা এসে গেলেন আর বাড়ির অবস্থা খারাপ দেখে সারানোর কথাও ভাবছিলেন। তাই ও আর দেরি না করে আপনারা থাকাকালীনই রিস্ক নেয়। ও জানত যে স্টাডি রুম অবনীমোহনের খুব প্রিয় ছিল, তাই ও স্টাডি রুমেই হানা দেয়। এসব কথাই চন্দন জেরায় স্বীকার করেছে।”

“কিন্তু চন্দন এত সব জানল কী করে? এমন কি আমরা যে বাড়ি সারানোর কথা ভাবছি সেটা পর্যন্ত? ও কি সব সময় নজর রাখত?”

“নজর রাখার কী দরকার মিস্টার গুপ্ত, যদি খবর দেওয়ার ভালো লোক থাকে?”

“খবর দেওয়ার লোক?” মিস্টার গুপ্ত আরও হতভম্ব।

“হ্যাঁ, খবর দেওয়ার লোক মিস্টার গুপ্ত, আপনার বাড়ির কেয়ার টেকার মথুরা। বাড়ি সারানোর জন্য ভালো মিস্ত্রীর খোঁজ তো আপনি মথুরাকেই করতে বলেছিলেন তাই না? চন্দনের দোকান ওর একটা আড্ডার জায়গা ছিল। বাজারে গেলেই ও ওখানে যেত আর চন্দন কায়দা

করে ওর কাছ থেকে সব খবর জেনে নিত। তা আপনি একবার আপনার ভাইপোর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন না? সে তো এখন আমাদের অতিথি। ”

“কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এই খাতাটা নিয়ে চন্দন কি করত? কোনো কোম্পানিকে টাকার লোভে বিক্রি করে দিত?”

“আরে চন্দন তো ভেবেছিল এখানে টাকা-কড়ি কি সোনা-দানা লুকোনো আছে। জ্ঞানও যে অমূল্য সম্পদ হতে পারে তা কি আর ভেবেছিল!”

“অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে তিওয়ারিজি আর তোমাদের দুজনকেও। তোমরা খাতাগুলো অত ভালো করে না দেখলে এ রহস্য ভেদ হত না। মথুরার ব্যবস্থা আমি আজই করছি,” বললেন মিস্টার গুপ্ত।

রহস্যের সমাধান হয়ে যাওয়ার পর তিতিররা নিরালা থেকে নিজেদের বাড়ি ফিরছে। সবাই চুপচাপ হাঁটছে। মনের মধ্যে তখনও গত তিনদিনে ঘটে যাওয়া সব ঘটনা ঘুরপাক খাচ্ছে।

“কলকাতায় ফিরে গিয়ে বন্ধুদের আমাদের কীর্তির কথা বেশ জমিয়ে বলা যাবে,” হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ বলল তমাল।

“হুঁ, গুপ্তধন উদ্ধার করল তিতির তমাল। আমিই বলব সবাইকে, এখনই ফোন করে,” বললেন মিস্টার রায়।

তিতির, তমাল চমকে উঠে বাবার মুখের দিকে তাকাল।

ছবিঃ মৌসুমী

অনুবাদ

জজসাহেবের বাড়ি

ব্রাম স্টোকার
অনুবাদ: অমিত দেবনাথ

পরীক্ষার দিন ঘনিয়ে আসছে, কিন্তু পড়াশোনা একদম তৈরি হয়নি। আর এই নিয়েই ম্যালকম ম্যালকমসন পড়েছিল মহা মুশকিলে। নিরিবিলি কোথাও গিয়ে পড়তে পারলে ভালো হত, কিন্তু সেরকম জায়গা পাওয়া যাবে কোথায়। সমুদ্রের ধারের কোথাও গেলেও পড়া হবে না, কারণ সেক্ষেত্রে সমুদ্রের শোভা দেখতে দেখতেই সময় চলে যাবে, আবার একেবারে নির্জন গ্রাম্য পরিবেশও পছন্দ না, কারণ গ্রাম্য পরিবেশও মনের মধ্যে কবি কবি ভাবের জন্ম দিতে পারে, আর তাহলেই পড়াশোনা মাটি। কাজেই এমন কোথাও যাওয়া দরকার, যে জায়গাটায় এসবের কোনটাই নেই, আর যে জায়গার নাম কেউ জানবে না। জায়গাটা ছোট শহর টাইপের হলেই ভাল হয়। এ ব্যাপারে সে কোন বন্ধুর সাথে পরামর্শ করাও ঠিক মনে করল না, কারণ বন্ধুদের জিজ্ঞেস করলেই একেকজন একেকরকম পরামর্শ দেবে, আর প্রত্যেকেই বলবে তার সাজেশনটাই সেরা। কাজেই ম্যালকম ম্যালকমসন একদিন তার কিছু জামাকাপড় আর সমস্ত দরকারী বইপত্র একটা বড় ট্রাঙ্কে ভরে স্টেশনে গিয়ে টাইমটেবিলে প্রথম যে নামটা অচেনা ঠেকল, তারই একখানা টিকিট কেটে ট্রেনে চড়ে বসল।

ঘন্টা তিনেক বাদে সে যে স্টেশনটায় গিয়ে নামল, তার নাম বেনচার্চ। জায়গাটা দেখেই বেশ ভক্তি হয়। কোনরকম ঝুটঝামেলা নেই, কাজেই পড়াশোনা করার পক্ষে এটাই সঠিক জায়গা।

নেমেই সে সোজা চলে গেল একখানা সরাইখানায়, রাত্তিরটা কাটাবে বলে। সেখানে গিয়ে কথাবার্তা বলে বুঝতে পারল, বেনচার্চ হচ্ছে একটা টাউন মার্কেট, তিন হপ্তা বাদে বাদে এখানে একটা জমজমাট বাজার বসে বটে, কিন্তু বাকি সময়টায় এখানে কেউ আসে-টাসে না, জায়গাটা একেবারে মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করে। পরের দিনটা সে খুঁজতে লাগল এমন একটা বাড়ি, যেটা এই নিরিবিলি সরাইখানার চেয়েও বেশি নিরিবিলি হবে। পেয়েও গেল একটা সেরকম নিরিবিলি বাড়ি। অবশ্য বাড়িটা যেরকম জায়গায়, তাতে নিরিবিলি কথাটার চেয়ে বিজন কথাটাই খাটে বেশি। বাড়িটা জ্যাকোবিয়ান স্টাইলের, পুরোন, খুব শক্তপোক্ত, জানালা আছে, তবে সেগুলো অস্বাভাবিক রকমের ছোট আর সাধারণত যে উচ্চতায় জানালা থাকে, তার চেয়ে অনেক উঁচুতে অবস্থিত এবং সারা বাড়িটাই খুব পোক্ত ইঁটের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এক ঝলক দেখেই মনে হয় এ বাড়িতে কেউ থাকেটাকে না। কিন্তু ম্যালকসন বাড়িটা দেখে খুশি হল। "এ বাড়িটায় থাকতে পারলে নিশ্চিন্তে পড়াশুনা করা যাবে, আর যদ্দুর মনে হচ্ছে, এ বাড়িতে কোন বাসিন্দা নেই," ভাবল সে।

স্থানীয় পোস্টফিস থেকে বাড়িটার এজেন্টের নামধাম জানা গেল। ভদ্রলোকের নাম মিঃ কার্নফোর্ড। বয়স্ক ভদ্রলোক, পেশায় উকিল, আবার দালালিও করেন। এ বাড়িটা কেউ ভাড়া নিতে চায়, এই মর্মের আবেদনপত্রটি পেয়ে তিনি বেশ চমকেই গেলেন।

"সত্যি কথাটা বলেই ফেলি মশাই," বললেন তিনি, "বাড়ির মালিকের পক্ষ থেকেই বলছি, এ বাড়িটা যদি আপনি নেন, তবে একবছর আপনাকে কোন ভাড়া দিতে হবে না। লোকজন দেখুক যে এখানেও লোক আসে, ভাড়া করে। আসলে এ বাড়িটা এত বছর ধরে ফাঁকা পড়ে আছে যে স্থানীয় লোকের মনে নানা কুসংস্কার----" তিনি ম্যালকসনের দিকে এক ঝলক তাকালেন, "মানে আপনার মত একজন শিক্ষিত ছেলে যদি এ বাড়িটা ভাড়া নেয়, তবে ওদের কুসংস্কারটা কেটে যাবে আরকি।"

ম্যালকমসন অবশ্য কুসংস্কার নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাল না, কারণ ওসব খবর সে দরকার হলে অন্য জায়গা থেকেও জোগাড় করতে পারবে। সে আপাতত তিনমাসের ভাড়া দিয়ে রসিদ নিয়ে নিল, সেই সঙ্গে এক মহিলার নামও, যে কিনা ও বাড়িতে তার সব কাজকম্মো করে দেবে। সব কথাবার্তা শেষ করে বাড়ির চাবিটা নিয়ে নিল সে। সরাইখানায় ফিরে দেখা করল সরাইখানার মালকিনের সঙ্গে, ঐ বাড়িটা সম্বন্ধে একটু জেনেশুনে নেওয়ার জন্য, যতই হোক, ওখানেই যখন আগামী কয়েকমাস থাকতে হবে। মালকিন ভদ্রমহিলা খুবই ভাল এবং দয়ালু, কিন্তু তিনি যখন শুনলেন ম্যালকমসন কোন বাড়িটা ভাড়া নিয়েছে, তিনি স্রেফ হাত তুলে দিলেন।

"মাগো! ও যে জজসাহেবের বাড়ি!" ম্যালকমসন লক্ষ্য করল মহিলার মুখ ফ্যাকাশে মেরে গেছে। ম্যলকমসন বলল সে বাড়িটার নাম জানে না, তবে কোন জায়াগায় বাড়িটা, সেটা বলতে পারবে। তার কথা শেষ হতে না হতে মহিলা বলে উঠলেন,"আর বলতে হবে না, বুঝে নিয়েছি। ও বাড়ি সেই জজসাহেবের বাড়ি ছাড়া আর কিছুই না।" ম্যালকমসন মহিলাকে জিজ্ঞেস করল জজসাহেবের বাড়ি ব্যাপারটা কী, আর তাতে এত ভয় পাওয়ারই বা কী আছে। মহিলা বললেন যে তিনিও ব্যাপারটা ঠিক জানেন না, তবে শুনেছেন যে বহুদিন আগে, সেটা শ'খানেক বছরও হতে পারে, ও বাড়িতে থাকতেন এক জজসাহেব। সেই জজসাহেব নাকি ভয়ংকর লোক ছিলেন, বিচার করে রায় দেওয়ার সময় কথায় কথায় আসামীদের ফাঁসির হুকুম দিতেন। ম্যালকমসন জিজ্ঞেস করল তার সঙ্গে বাড়িটার কি সম্পর্ক। মহিলা বললেন যে তিনিও অনেককে জিজ্ঞেস করেছেন, কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারেনি। কিন্তু এটা ঠিক যে ও বাড়িতে কিছু একটা আছে এবং মহিলাকে যদি কেউ এক ব্যাঙ্ক টাকাও দেয়, তাহলেও তিনি ও বাড়িতে এক ঘন্টাও থাকবেন না। তারপর বললেন, "আমাকে ক্ষমা করবেন স্যার, এত কথা বলছি বলে। আপনার বয়স তো বেশি নয়, ও বাড়িতে একা থাকতে যাচ্ছেন। তবে স্যার, আপনি যদি আমার ছেলে হতেন, তবে আমি আপনাকে ও বাড়িতে এক রাত্তিরও থাকতে দিতাম না, আর তার জন্য দরকার হলে ও বাড়ির ছাদের বড় ঘন্টাটা জোরসে বাজিয়ে দিতাম।" যদিও কথাগুলো শুনে ম্যলকমসনের মজাই লাগছিল, তবুও মহিলার কথায় এমন একটা ব্যাপার ছিল যে ম্যলকমসন অভিভূত না হয়ে পারল না। সে বলল, "মিসেস উইদাম, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, কথাগুলো বলার জন্য। তবে কিনা, যে লোক অঙ্কের নানারকম রহস্য নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, তার কাছে অন্য কোন রহস্যের সমাধান করার মত সময় থাকবে বলে মনে হয় না। হার্মোনিকাল প্রগ্রেশন, ইলিপটিক ফাংশন, পারমুটেশন কম্বিনেশন---- এসব রহস্যের কায়দা করাই এখন আমার প্রধান কাজ।"

মিসেস উইদামকে পয়সাকড়ি মিটিয়ে ম্যলকমসন সেই মহিলার খোঁজে বেরোল, যে নাকি ও বাড়িতে তার সব কাজকম্মো করে দেবে। তাকে নিয়ে সে যখন ঘন্টাকয়েক বাদে জজসাহেবের বাড়িতে গেল, দেখল সেখানে মিসেস উইদাম দাঁড়িয়ে আছেন লোকজন নিয়ে, সঙ্গে অনেক জিনিসপত্র, আরেকটা গাড়িতে একটা বিছানা। কারণ হিসেবে বললেন, ভেতরের চেয়ার-টেবিলগুলো নিশ্চয়ই খুব ভাল অবস্থাতেই আছে, কিন্তু একটা বিছানা অবশ্যই দরকার, ও বাড়ির বিছানা, যেটা গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যেও ব্যবহার হয়নি, তাতে নিশ্চয়ই শোওয়া যাবে না। বাড়ির ভেতরে কি আছে, সেটা দেখার জন্য মহিলা খুবই আগ্রহী ছিলেন, কাজেই তারা যখন ভেতরে ঢুকল, কোথাও সামান্যতম আওয়াজ হলেও মহিলা চমকে চমকে উঠে ম্যালকমসনের হাত খামচে ধরছিলেন।

বাড়িটা ভাল করে ঘুরে ফিরে দেখে, ম্যালকমসন বিরাট ডাইনিংরুমটাতে থাকাই ঠিক করল। যে মহিলা তার কাজ করবে, তার নাম মিসেস ডেম্পস্টার। মিসেস উইদামও মিসেস ডেম্পস্টারের সঙ্গে হাতে হাতে জিনিসপত্র গুলো সাজিয়ে গুছিয়ে দিলেন এবং ম্যালকমসন খেয়াল করল তিনি কয়েকদিন চলার মত খাবারদাবারও দিয়ে দিয়েছেন। চলে যাওয়ার আগে তিনি বারবার তাকে সাবধানে থাকতে বললেন, তারপর বললেন, "স্যার, আমার মনে হয় রাত্তিরে আপনি মশারি টাঙিয়ে শুলে ভাল করবেন, নাহলে ওরা কিন্তু উঁকিঝুঁকি মারতে পারে, ওপর থেকে বা আশপাশ থেকে। ওরে বাবা, আমি তো আপনার এখানে থাকলে ভয়েই মরে যেতাম!"

মিসেস উইদাম চলে যাওয়ার পর মুখ খুলল মিসেস ডেম্পস্টার, মুখ বেঁকিয়ে বলল, ওসব ভূতপ্রেতে সে ভয় পায় না।

"আসল ব্যাপারটা আমি আপনাকে বলছি স্যার," বলল সে, "ইঁদুর, গুবরেপোকা, জ্যাম হয়ে যাওয়া দরজা, ছাদের আলগা টালি, ভাঙা গোবরাট, শক্ত ড্রয়ারের হাতল, যেগুলো আপনি টানলে খুলবে না, কিন্তু মাঝরাত্তিরে খুলে পড়ে যাবে, এগুলোই হচ্ছে আসল ভয়ের জিনিস। দেয়ালের কাঠগুলো দেখুন স্যার, কম করেও একশো বছরের পুরোন। আপনি কি ভাবছেন, এগুলোর মধ্যে ইঁদুরের বাসা নেই? চিন্তা নেই স্যার, আপনি ওদের দেখতে পাবেন। ওরাই হচ্ছে ভয়ংকর, ওরাই আসল ভূত।

"মিসেস ডেম্পস্টার," ম্যালকমসন বলল, "আপনি যে কথাগুলো বললেন, তার জন্য ধন্যবাদ। আমার পড়াশুনা শেষ করতে মাসখানেকের বেশি লাগবে না। কাজেই, আমার যেহেতু তিন মাসের ভাড়া মেটানো আছে, আমি পরের দুমাসের জন্য বাড়িটা আপনার হাতেই ছেড়ে দিয়ে যাব, আপনি এখানে আরামসে থাকবেন।"

"ধন্যবাদ স্যার," বলল মিসেস ডেম্পস্টার। "কিন্তু নিজের বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় গিয়ে রাত্রিবাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি যে প্রতিষ্ঠানের অধীনে কাজ করি, তাদের এদিকে কড়া নজর। একটু এদিক ওদিক করলেই আমার চাকরি নট। কাজেই, আপনি ঠিক যে কদিন থাকবেন, সে কদিনই আমি আসব আপনার কাজকর্ম করার জন্য।"

"ঠিক আছে, আপনি যা চাইছেন, তাই হবে।" বলল ম্যালকমসন, "আসলে আমি একদম নির্জনতা খুঁজছি, মন দিয়ে পড়ার জন্য, বুঝতেই পারছেন, কাজেই গ্রিনহাউ না কী প্রতিষ্ঠান বললেন, তারা যে এত সুন্দর একটা ব্যবস্থা রেখেছে, তার জন্য আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামানোর মত সময় আমার নেই।"

মিসেস ডেম্পস্টার মুখ বেঁকিয়ে হাসল। "তার মানে আপনি এখানকার ব্যাপারগুলো পাত্তা দিচ্ছেন না। ঠিক আছে, আপনি যেরকম নির্জনতা খুঁজছেন, সবই এখানে পাবেন।" তারপর সে

তার ঘরদোর মোছামুছির কাজ শুরু করল। সন্ধ্যের দিকে ম্যালকমসন যখন বেড়িয়ে ফিরল --- তার একটা স্বভাব হল, যখনই বেরোক, হাতে একটা বই থাকে — দেখল ঘরদোর একদম ঝকঝকে, ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে, বাতিগুলো জ্বালানো আর খাবার টেবিলে মিসেস উইদামের দেওয়া খাবারগুলো সুন্দরকরে সাজানো। "বাঃ, চমৎকার," হাত ঘষতে ঘষতে বলল সে।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে, এঁটো প্লেট-টেটগুলো ডাইনিং টেবিলের অন্য পাশটায় রেখে , ফায়ারপ্লেসে নতুন করে কাঠ দিয়ে, বাতিটা ঠিকঠাক করে, বইগুলো সাজিয়ে পড়ায় গভীরভাবে ডুবে গেল। একটানা পড়ল এগারোটা অবধি। তারপর মনে হল একটু চা খেলে মন্দ হয় না। ফায়ারপ্লেসে নতুন করে কাঠ গুঁজে, আলোটা বাড়িয়ে, চা তৈরি করে আরাম করে একটা চুমুক দিল সে। সেই কলেজ লাইফ থেকেই তার একটু ঘন ঘন চা খাওয়ার নেশা। চমৎকার লাগছিল তার চা খেতে। ফায়ারপ্লেসের আগুন থেকে ফুলকি ছড়াচ্ছিল, অদ্ভুত সব ছায়া সৃষ্টি করছিল দেয়ালে। কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছিল তার। কোন কিছুর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না? তারপর বুঝতে পারল, এগুলো সব ইঁদুরের নড়াচড়ার শব্দ।

"আশ্চর্য! পড়ার সময় তো এগুলোর আওয়াজ শুনিনি," ভাবল সে, "তাহলে তো আমি আওয়াজ পেতাম।" আওয়াজটা ক্রমশ বাড়ছিল। হুঁ, ওরা তাহলে এখনই বেরিয়েছে। এতক্ষণ চুপচাপ ছিল, কারণ বাড়িতে একটা লোক আছে, আলো আছে, ফায়ারপ্লেসের আগুন আছে, কিন্তু ওগুলোতে আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ায় ওরা বেরিয়ে পড়েছে।

ওরা দেখছি সাংঘাতিক ব্যস্ত! কাঠের দেয়াল বেয়ে উঠছে নামছে, সিলিং-এর ওপরে উঠে যাচ্ছে, মেঝেতে রেস দিচ্ছে, আর সামনে কিচকিচ আওয়াজ করে যাচ্ছে। মিসেস ডেম্পস্টারের কথাগুলো মনে পড়ে যাওয়ায় ম্যলকমসন হেসেই ফেলল, "দেখবেন স্যার, ইঁদুর আর ইঁদুর, আর ওগুলোই হচ্ছে আসল ভূত।" যাই হোক, চা-টা খেয়ে শরীরটা বেশ চাঙ্গা লাগছিল বলে ম্যালকমসন ঠিক করল ঘরটা একটু ঘুরে ফিরে দেখবে। হাতে বাতিটা নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে সে ভাবছিল এরকম একখানা চমৎকার বাড়ি এতদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে কি করে। ওককাঠের দেয়ালগুলো চমৎকার অবস্থায় আছে, দরজা-জানালাগুলোও তাই। দেয়ালে বেশ কিছু ছবিও ঝোলানো আছে, ত্রবে সেগুলো ধুলোয় এত পুরু হয়ে আছে যে ছবির বিষয়বস্তুগুলো ভালো বোঝা যাচ্ছে না। তবুও সে যতটা পারল বাতিটা উঁচু করে মাথা তুলে সেগুলো দেখতে লাগল। হঠাৎ হঠাৎই নজরে পড়ছিল দেয়াল বা মেঝের কোন গর্ত দিয়ে বেরিয়ে আসা ইঁদুরের মুখ, আলো লেগে চকচক করছিল সেগুলোর চোখ, পরমুহূর্তেই তারা মিলিয়ে যাচ্ছিল কিচকিচ আওয়াজ করতে করতে।

যে জিনিসটা তাকে সবচেয়ে অবাক করল, তা হল ছাদের ওপর যে পাগলা ঘন্টিটা আছে, তার দড়িটা। দড়িটা ফায়ারপ্লেসের ডানদিক থেকে ঝুলে রয়েছে। কাছেই ছিল একটা উঁচু পিঠওয়ালা ওককাঠের চেয়ার, সেটা টেনে নিয়ে বসল সে, আরাম করে শেষ কাপ চা-টা খাওয়ার জন্য। চা খাওয়া হয়ে গেলে, সে ফায়ারপ্লেসে কাঠ দিয়ে, পড়ার টেবিলে চলে গেল পড়া শেষ করার জন্য। প্রথম প্রথম ইঁদুরগুলোর নাচানাচির জন্য একটু অসুবিধা হচ্ছিল ঠিকই, তারপর গভীর মনসংযোগের জন্য সেদিকে তার কোন খেয়ালই রইল না। একটা জটিল অঙ্কের সমাধান করার চেষ্টা করছিল সে।

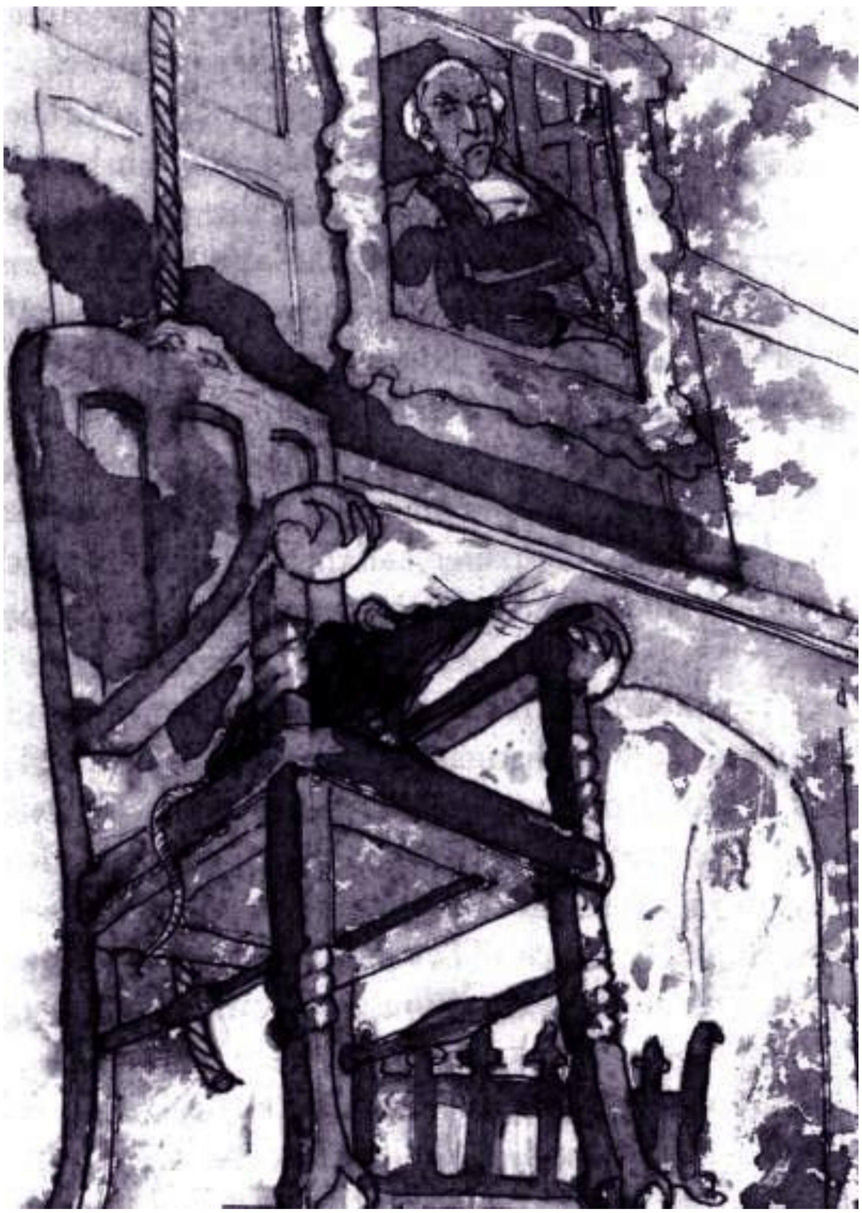

হঠাৎ তার চমক ভাঙল। অঙ্কটা সে এখনও করে উঠতে পারেনি। ভোর হতে আর খুব বেশি বাকি নেই। ইঁদুরগুলোর আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে। এবং সে বুঝতে পারল আওয়াজটা আচমকা বন্ধ হয়ে গেছে বলেই তার চমক লেগেছে, কারণ ঐ আওয়াজগুলোর সঙ্গে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছিল। ফায়ারপ্লেসের আগুন নিভে এলেও এখনও সেখানে রক্তিমাভা রয়েছে। সে সামনে তাকিয়েই চমকে উঠল।

ফায়ারপ্লেসের ডানদিকে যে বড় ওককাঠের চেয়ারটা রয়েছে, সেখানে বসে আছে বিশাল বড় একটা ইঁদুর, ভয়ংকর চোখে তাকিয়ে রয়েছে সোজা তার দিকেই। সে ওটার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়াল, কিন্তু ওটা একফোঁটাও নড়ল না। এবার সে

কিছু একটা ছোঁড়ার ভান করল, ওটা নড়ল না, কিন্তু বিশাল সাদা দাঁত বার করল, যেন ওটা খুব রেগে গেছে, জ্বলজ্বল করে উঠল চোখদুটো।

ম্যালকমসন একটু হকচকিয়ে গেছিল, তারপর আগুন খোঁচানোর ডান্ডাটা নিয়ে তেড়ে গেল সেদিকে, কিন্তু তার আগেই ইঁদুরটা একটা আওয়াজ করে --- সেটা এমন, যেন ওকে ঠাট্টা করছে --- লাফিয়ে পড়ল মেঝের ওপর, তারপর পাগলা ঘন্টির দড়িটা বেয়ে উঠে কোথায় হারিয়ে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য ইঁদুরগুলো আবার কিচকিচ আওয়াজ করতে শুরু করল।

ব্যাপার-স্যাপার দেখে অঙ্ক-টঙ্ক মাথা থেকে বেরিয়ে গেছিল ম্যালকমসনের, বাইরে মোরগের ডাক শুনে সে বুঝতে পারল ভোর হয়ে গেছে। সে সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল ঘুমোনোর জন্য।

এত গভীর ঘুমোচ্ছিল সে, যে কখন মিসেস ডেম্পস্টার এসেছে, ঘরদোর ঝাঁটপাট দিয়েছে, সে কিছুই টের পায়নি। ঘুম ভাঙল, যখন মিসেস ডেম্পস্টার তার ব্রেকফাস্ট রেডি করে তাকে ডাকল, তখন। তখনও তার ক্লান্ত লাগছিল সারা রাতের ধকলের জন্য। তবে কড়া এক কাপ চা শিগগিরই তাকে চাঙ্গা করে তুলল। ব্রেকফাস্ট করে বই নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল হাঁটতে, সঙ্গে নিল কিছু স্যান্ডউইচ, কারণ যদি সেরকম জায়গা পায়, তবে সে সারাদিনটা সেখানেই কাটিয়ে দেবে, ফিরবে একেবারে ডিনারের সময়। হলও তাই, শহরের বাইরে হাঁটতে হাঁটতে চমৎকার এলম গাছে ছাওয়া একটা জায়গা পেয়ে গেল সে, সারাদিনটা সে সেখানেই কাটিয়ে দিল অঙ্কের সমাধান নিয়ে। ফেরার পথে সে মিসেস উইদামের সঙ্গে দেখা করে এল। তাকে আসতে দেখে মিসেস উইদাম বেরিয়ে এলেন বাইরে, ভাল করে তাকে দেখলেন, তারপরে বললেন, "বেশি খাটাখাটি করেছেন স্যার, আপনাকে কিন্তু শুকনো শুকনো লাগছে। শরীর খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু। আর ইয়ে --- রাতটা কিরকম কাটল? ভাল তো? মিসেস ডেম্পস্টার অবশ্য আমাকে সকালেই বলে গেছে ও যখন গেছিল, তখন আপনি ঘুমোচ্ছিলেন। গভীর ঘুম।"

"না না, রাতটা ঠিকঠাকই কেটেছে," হেসে বলল ম্যালকমসন, "তেনারা কোন ভয়টয় দেখান নি। তবে ওখানে বড় ইঁদুরের উৎপাত। ব্যাটারা যেন একেবারে সার্কাস বসিয়ে দিয়েছিল। এর একটা বিশাল ইঁদুর, আমার চেয়ারের ওপর বসেছিল, আমি ডান্ডা নিয়ে তাড়া করতেই সেটা পাগলা ঘন্টির দড়ি বেয়ে কোথায় যে পালাল, হদিশই করতে পারলাম না। ওপরটা খুব অন্ধকার তো।"

"অ্যাঁ? ফায়ারপ্লেসের পাশের চেয়ারে বসেছিল? বড় ইঁদুর?" বললেন মিসেস উইদাম, "ওটাই শয়তান! ওটাই সেই শয়তান! সাবধান স্যার, সাবধানে থাকবেন! অনেক কথা কিন্তু স্যার বাতাসে ভাসে!"

"মানেটা তো ঠিক বুঝলাম না, মিসেস উইদাম," ম্যালকমসন মিসেস উইদামের বলার ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলেছিল, সেটা দেখে মিসেস উইদাম বললেন, "হাসবেন না স্যার! ওটাই সেটা! ঈশ্বর আপনার সহায় হোন!"

"কিছু মনে করবেন না, মিসেস উইদাম," বলল ম্যালকমসন, "তবে শয়তান নিজে এসে কাল রাত্তিরে আমার চেয়ারে বসেছিল, এটা আমার কাছে একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হচ্ছে!" আবার একটু হেসে বিদায় নিল সে, চলল বাড়ির পথে, ডিনারের জন্য।

সেই রাত্তিরে ইঁদুরের উৎপাতটা একটু আগেই শুরু হল। মানে তার বাড়িতে ঢোকার আগেই শুরু হয়ে গেছিল, সে ঢোকার ওরা একটু থমকে গেছিল মাত্র। যাই হোক, ডিনার সেরে সে ফায়ারপ্লেসের পাশে বসল, একটু ধুমপান করল, তারপর টেবিল পরিষ্কার করে পড়তে বসে গেল। ইঁদুরগুলো আগের রাতের থেকেও বেশি জ্বালাচ্ছিল আজ, সে কি দৌড়োদৌড়ি ওদের, মেঝের ওপর দিয়ে, কাঠের দেয়াল বেয়ে, সে কি কিচকিচ আওয়াজ! গর্তের ভেতর থেকে যখন মুখ বাড়াচ্ছিল ওরা, আলো লেগে ওদের চোখগুলো চকচক করছিল। কিন্তু, ম্যালকমসনের মনে হচ্ছিল, সে চোখে কোন হিংস্রতার ছাপ নেই। যখন ওরা খুব বেশি বাড়াবাড়ি করছিল, তখন ম্যালকমসন টেবিল নাড়িয়ে 'হুশ হুশ' শব্দ করছিল, আর তখনই ওরা সোজা ঢুকে পড়ছিল গর্তে। তবে এত কিছু সত্ত্বেও, ম্যলকমসনের পড়ায় কোন ব্যাঘাত ঘটছিল না। কিন্তু আচমকাই, ঠিক গত রাতের মতোই, সে সচকিত হয়ে উঠল। ঘরের সমস্ত শব্দ থেমে গেছে, সারা ঘরে নেমে এসেছে কবরের স্তব্ধতা। আগের রাত্তিরের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় সে তাকাল ফায়ারপ্লেসের দিকে। সেখানে, সেই ওককাঠের চেয়ারটায়, আগের রাতের মতোই বসে আছে সেই বিশাল ইঁদুরটা, অশুভ চোখে চেয়ে আছে তার দিকেই।

হাতের কাছে ছিল লগারিদমের বইটা, সে ছুঁড়ে মারল সেটাকে ইঁদুরটার দিকে তাক করে, কিন্তু তাকটা এতই বাজে যে বইটা গিয়ে পড়ল অন্য জায়গায়, আর ইঁদুরটা গ্যাঁট হয়ে বসে রইল একইভাবে। অগত্যা সেই আগুন খোঁচানোর ডান্ডাটা নিয়েই তেড়ে গেল সে, আগের দিনের মতোই ইঁদুরটা পাগলাঘন্টির দড়ি বেয়ে সিলিং-এর দিকে কোথায় উধাও হয়ে গেল, সে বুঝতেই পারল না, কারণ ওপরটা বড় অন্ধকার, বাতির আলোটা অতদূর পৌঁছোয় না, আর ফায়ারপ্লেসের আগুনও ততক্ষণে নিভুনিভু হয়ে এসেছে, এবং আশ্চর্য, বড় ইঁদুরটা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য ইঁদুরগুলো আবার চেঁচামেচি জুড়ে দিল।

ঘড়ি দেখে ম্যালকমসন বুঝতে পারল এখন প্রায় মাঝরাত। এককাপ চা খাওয়া যেতেই পারে, সঙ্গে একটা সিগারেট। এখনো অনেকক্ষণ পড়াশোনা চালাতে হবে। ফায়ারপ্লেসের আগুনটা উসকে দিয়ে ওককাঠের চেয়ারটায় আরাম করে বসে সিগারেট টানতে টানতে তার মাথায় একটা প্ল্যান এল। কিন্তু তার আগে ঐ ধাড়ি ইঁদুরটা কোথায় পালায় রোজ, সেটা জানা দরকার। কাল

একটা ইঁদুরকলের ব্যবস্থা করতে হবে। সে আরেকটা বাতি জ্বালিয়ে এমনভাবে রাখল যাতে ফায়ারপ্লেসের ডানদিকের দেয়াল পর্যন্ত পুরো জায়গাটায় আলো পড়ে। তারপর তার সবকটা বই টেবিলে এমনভাবে রাখল যাতে প্রয়োজন হলেই সেগুলো ছুঁড়ে মারা যায়। তারপর সেই পাগলাঘন্টির দড়িটা ধরে টেনে সেটার শেষ অংশটা বাতি দিয়ে চাপা দিয়ে রাখল। দড়িটা কি সাংঘাতিক শক্ত! "এ তো ফাঁসি দেওয়ার দড়ি!" নিজের মনেই বলল সে। "এ বার দেখা যাক বাছাধন, তোমার জন্য কি করা যায়।" কিছুক্ষণের মধ্যেই সে আবার ডুবে গেল অঙ্কের জগতে, ইঁদুরদের কিচকিচ তাকে আর বিরক্ত করতে পারল না।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তার মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটল। এবার যে শুধু আচমকা চারিদিকের নিস্তব্ধতার জন্য, তা নয়, দড়িটা যেন সামান্য নড়ে উঠল, তার সঙ্গে বাতিটাও। একটুও না নড়ে সে দেখে নিল বইগুলো তার হাতের নাগালে আছে কিনা, তারপর তাকাল দড়িটার দিকে। তাকিয়েই দেখল ধাড়ি ইঁদুরটা দড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে সেই চেয়ারটাতে বসল, নজর সোজা তার দিকেই। ডানহাতে একটা বই তুলে নিয়ে ঠিকমতো তাক করে ছুঁড়ে মারল ইঁদুরটার দিকে। কিন্তু ইঁদুরটা একটা ছোট্ট লাফ মেরে তাকটা এড়িয়ে গেল। আর একটা বই ছুঁড়ে মারল সে, তারপর আরো একটা, আরো একটা --- কিন্তু প্রত্যেকবারই ইঁদুরটা সেগুলোর সবকটাই এড়িয়ে গেল। তারপর যখন আর একটা বই হাতে করে উঠে দাঁড়াল সে ছুঁড়ে মারবে বলে, ইঁদুরটা আওয়াজ করে উঠল, মনে হল যেন ভয় পেয়েছে। কোনরকম দেরি না করে বিশাল বইটা ছুঁড়ে মারল ম্যালকমসন, সোজা গিয়ে বইটা দড়াম করে পড়ল ইঁদুরটার গায়ে। জোরসে একটা আওয়াজ করে, তার দিকে জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে, চেয়ার বেয়ে উঠে, দড়ির দিকে একটা লাফ মেরে সেটাকে ধরে বেয়ে বিদ্যুৎগতিতে চলে গেল নাগালের বাইরে। টানাটানিতে দড়িটা নড়ে উঠেছিল, সেই সঙ্গে বাতিটাও, কিন্তু বাতিটা খুব ভারি বলে নড়ে উঠলেও পড়ে গেল না। ম্যালকমসন লক্ষ্য রাখছিল ইঁদুরটা কোথায় যায়। বাতির আলোয় এখন সবকিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। সে দেখল ইঁদুরটা দড়ি বেয়ে দেয়ালের গায়ে টাঙানো এক বড় ছবির পেছনের গর্ত দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। ছবিটা অবশ্য কিসের, কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না, কারণ ছবির গায়ে পুরু ধুলো জমে সেটাকে অদৃশ্য করে রেখেছে।

"কাল সকালে বাবুর বাসাটা দেখতে হবে," ছুঁড়ে মারা বইগুলো কুড়িয়ে নিতে নিতে বলল সে, "ফায়ারপ্লেসের দিক থেকে তিন নম্বর ছবি, মনে থাকবে আমার।" একটা একটা করে বইগুলো কুড়িয়ে নিতে নিতে নামগুলো বিড়বিড় করছিল সে, "কনিক, সেকসন, অসিলেশন, প্রিন্সিপিয়া, কোয়াটারনিয়নস, থার্মোডাইনামিকস --- হুম, এগুলো কোনটাই ওর গায়ে লাগেনি। তাহলে পড়ে আছে শুধু ঐ বইটাই! তার মানে ওটাই লেগেছে ওর গায়ে।" বইটা কুড়িয়ে নিতেই

আচমকা থেমে গেল সে, ক্ষণিকের জন্য গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। বিস্ময়ের চোখে বইটার দিকে তাকিয়ে কাঁপাকাঁপা গলায় নামটা বিড়বিড় করল, "বাইবেল! মায়ের দেওয়া বইটা! কি আশ্চর্য!"

সে আবার শুরু করল অঙ্ক কষা, ইঁদুরেরা খেলা শুরু করল আবার। কেন কে জানে, এবার তো ম্যলকমসনের আর বিরক্ত লাগছিলই না, উল্টে মনে হচ্ছিল ঘরে তার কিছু সঙ্গীসাথী রয়েছে। কিন্তু কিছুতেই সে আর পড়ায় মনোসংযোগ করতে পারল না, বহুক্ষণ চেষ্টা করে করে শেষপর্যন্ত সে যখন শুতে গেল, তখন জানালা দিয়ে ভোরের আকাশের প্রথম আভা দেখা যাচ্ছে।

সে ঘুমোল বটে, তবে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখল অজস্র, যখন মিসেস ডেম্পস্টার এসে তার ঘুম ভাঙাল, তখন সে উঠে বসল বটে, কিন্তু প্রথমে বুঝতেই পারছিল না, সে কোথায় আছে। শরীরটা ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল। তারপর জড়তা কাটিয়ে সে মিসেস ডেম্পস্টারকে যেটা বলল, সেটা বেশ অবাক করার মত কথা।

"মিসেস ডেম্পস্টার, আমি যখন বেরোব, সে সময় আপনি দেয়ালের সবকটা ছবি – বিশেষ করে ঐ ফায়ারপ্লেসের পাশের তিন নম্বর ছবিটা মুছে রাখবেন তো --- আমি দেখতে চাই ছবিগুলো কিসের।"

সারাটা দিন বাইরে কাটিয়ে, গাছের ছায়ার পড়াশুনা করে বিকেলের দিকে সে যখন ফিরল, তখন তার হারানো প্রফুল্লতা অনেকটাই ফিরে এসেছে। ফেরার পথে সে একবার ঢুঁ মারল 'দি গুড ট্র্যাভেলার' নামের সেই সরাইখানায়, যেটাতে সে প্রথম উঠেছিল, যার মালিক মিসেস উইদাম। সেখানে গিয়ে দেখল বসার ঘরে এক ভদ্রলোক বসে আছেন, যাঁকে মিসেস উইদাম পরিচয় করিয়ে দিলেন ডঃ থর্নহিল বলে এবং ম্যালকমসনের মনে হল তাঁরা এমন একটা বিষয়ে আলোচনা করছেন, যাতে সে-ও প্রাসঙ্গিক, কাজেই ভনিতা না করে সে বলল, "ডঃ থর্নহিল, আমি আপনাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত, যদি আপনি তার আগে আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দেন।"

ডক্টর একটু অবাক হলেও হেসে বললেন, "বেশ তো। প্রশ্নটা বলুন।"

"মিসেস উইদাম কি আপনাকে এখানে আসতে বলেছেন, আমার সঙ্গে দেখা করে আমাকে বোঝানোর জন্য?"

ডঃ থর্নহিল প্রথমে একটু অবাক হলেও তিনি সপ্রতিভ মানুষ। তিনি প্রশ্নের জবাব দিলেন, যদিও মিসেস উইদামের মুখটা লাল হয়ে উঠল।

"হ্যাঁ, তিনি বলেছেন, তবে তিনি সেটা আপনাকে জানাতে না করেছেন। আসলে তাঁর বক্তব্য হল, আপনি সে ঐ বাড়িতে একা একেবারে থাকছেন, এটা তার পছন্দ নয় এবং একা থাকার জন্য, আপনি সম্ভবত ঘন ঘন চা খাচ্ছেন, কড়া চা, এটাও তাঁর পছন্দ নয়। তিনি আমাকে বলেছেন আপনাকে বোঝাতে যে আপনি ঘন ঘন চা খাওয়া আর অনেক রাত করে শোওয়াটা

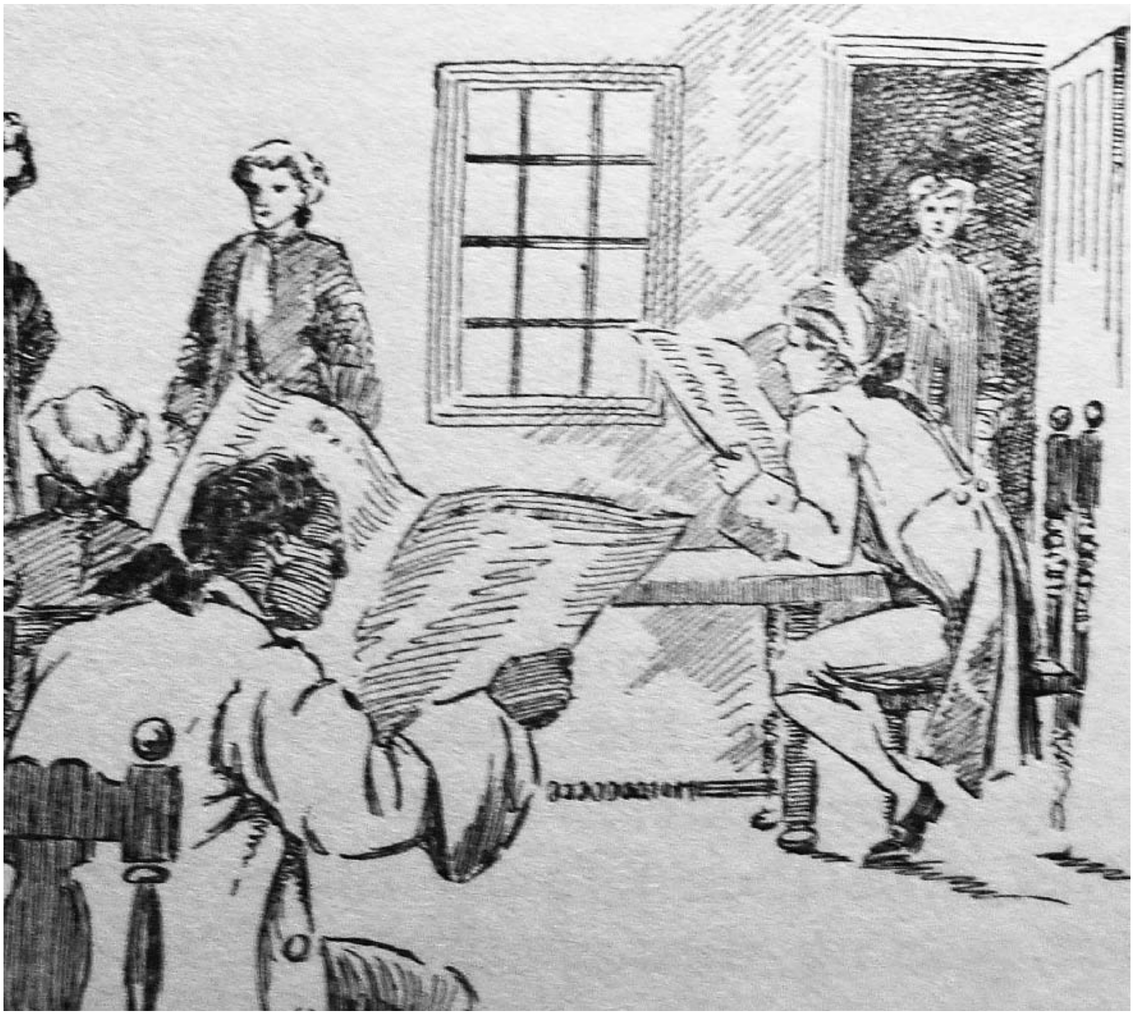

ছাড়ুন। আমারও তো ছাত্রজীবন ছিল একটা সময়ে, সে হিসেবে আমি এটুকু পরামর্শ তো আপনাকে দিতেই পারি, আশা করি আপনিও এতে কিছু মনে করবেন না।”

ম্যালকমসন এবার একগাল হাসল, দিলখোলা, দরাজ হাসি। “আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, একই সঙ্গে মিসেস উইদামকেও, আপনারা যে আমার জন্য এত ভেবেছেন, তার জন্য। কাজেই আমার তরফ থেকেও কিছু করা দরকার। আমি আজ থেকে আর কড়া চা খাব না --- চা-ই আর খাব না, আর রাত্তিরে একটার মধ্যেই শুতে যাব। ঠিক আছে?”

“পাক্কা,” বললেন ডক্টর, “এবার বলুন তো, ও বাড়িতে এ ক’দিন আপনি কী কী দেখলেন?” ম্যালকমসন একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিল গত দু রাত্তিরে ওখানে কী কী হয়েছে। বর্ণনা অবশ্য বারবার বাধা পাচ্ছিল থেকে থেকেই মিসেস উইদামের “অ্যাঁ, তাই নাকি, ওঃ ভগবান” ইত্যাদি অব্যয়সূচক শব্দে, তারপর যখন সে একেবারে সেই ধাড়ি ইঁদুরটাকে বাইবেল ছুঁড়ে মারার কথায় গিয়ে থামল, তখন মিসেস উইদাম একটা চিৎকার ছেড়ে এমন ফ্যাকাশে মেরে

গেলেন যে তাঁকে একগ্লাস জল মেশানো ব্যান্ডি খাইয়ে চাঙ্গা করে তুলতে হল। ডঃ থর্নহিল অবশ্য পুরো ঘটনাটাই মন দিয়ে শুনছিলেন, মিসেস উইদাম একটু সুস্থ হয়ে ওঠার পর বললেন, "ঐ ইঁদুরটা তাহলে সব সময়েই ঐ পাগলা ঘন্টির দড়ি বেয়েই ওঠানামা করে?"

"সবসময়।"

"ঐ দড়িটা কিসের, আশা করি আপনি জানেন?" ডঃ থর্নহিল একটু থেমে বললেন।

"না তো!"

"ওটা ফাঁসির দড়ি। জজসাহেব যাদের ফাঁসির হুকুম দিতেন, ঐ দড়ি দিয়ে তাদের ফাঁসি দেওয়া হত!" ডক্টরকে থেমে যেতে হল, কারণ আরেকটা চিৎকার ছেড়েছেন মিসেস উইদাম। এবার তাঁকে সুস্থ করতে অনেকটা সময় লাগল। ম্যালকমসন দেখল, আরো দেরি করলে তার ডিনারের দেরি হয়ে যাবে, তাই সে বেরিয়ে পড়ল, মিসেস উইদাম পুরো সুস্থ হয়ে ওঠার আগেই।

মিসেস উইদাম একটু সুস্থ হয়েই ডক্টরকে যাচ্ছেতাই বলতে লাগলেন এমন একটা ভয়ংকর কথা ম্যালকমসনের মাথায় ঢোকানোর জন্য। "ছেলেটা এমনিতেই ওখানে যথেষ্ট ফ্যাসাদের মধ্যে আছে" বললেন তিনি। ডঃ থর্নহিল বললেন, "শুনুন ম্যাডাম আমি কথাগুলো এমনি এমনি বলিনি, বিশেষ একটা উদ্দেশ্যেই বলেছি। আমি ওকে ঐ পাগলাঘন্টির দড়ির দিকে নজর দিতে বলেছিলাম। হতে পারে, অতিরিক্ত পড়াশুনা করে আর রাত জেগে ওর মনের ওপর চাপ পড়ছে বেশি, কিন্তু তাহলেও আমি বলব, আমার ওকে দেখে যতটা মনে হয়েছে, ও শরীর আর মনের দিক থেকে যথেষ্ট শক্তপোক্ত। কিন্তু ঐ ইঁদুরের ব্যাপারটাই ---" ডক্টর মাথা নেড়ে বললেন, "আমি অবশ্য ওকে বলতে পারতাম প্রথম রাত্তিরটায় ওর সঙ্গে ওখানে থাকার জন্য, কিন্তু সেটা ও মেনে নিত কিনা কে জানে। প্রথম রাত্তিরেই ও যদি ভয় পেত, বা আবোলতাবোল কিছু দেখত, তাহলে হয়ত পাগলাঘন্টির দড়িটা টানত। আমরা সেই ঘন্টার শব্দ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ওখানে ছুটে যেতে পারতাম। তা যখন হয়নি, তখন আমার একটাই কাজ আছে, আর তা হল আজ রাত্তিরটা আমায় জাগতে হবে কান খোলা রেখে। আজ রাত্তিরে কোন কান্ড ঘটা অস্বাভাবিক নয়।"

"কী বলছেন ডক্টর? কী বলতে চাইছেন আপনি?"

"আমি বলতে চাইছি --- বলতে চাইছি নয়, বলছি, যে আজ রাত্তিরে জজসাহেবের বাড়ির ঐ পাগলা ঘন্টিটা বেজে উঠবে," ডক্টর কথাগুলো বলে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

ম্যালকমসনের সেদিন সামান্য দেরি হয়ে গেল বাড়ি পোঁছতে, সে যে সময় বাড়ি পৌঁছোয়, তার থেকে। মিসেস ডেম্পস্টার চলে গেছে। ফায়ারপ্লেসে জ্বলছে গনগনে আগুন আর বাতিগুলোর পরিষ্কার আলোয় চারদিকটা ঝকঝকে লাগছে। বেশ ঠান্ডা পড়েছে। এপ্রিলের এ সময়টায় সাধারণত এত ঠান্ডা থাকে না। থেকে থেকে বইছিল দমকা হাওয়া, মনে হচ্ছিল রাত্তিরের

দিকে হয়ত ঝড় উঠতে পারে, সে ঘরে ঢোকার পরে ইঁদুরগুলো একটু চুপ করেছিল, এখন আবার কিচকিচ শুরু করেছে। ইঁদুরদের আওয়াজ ম্যালকমসনের ভালই লাগছিল, মনে হচ্ছিল এ বাড়িতে সে একা নয়, ওরাও তার সঙ্গী, আবার একই সঙ্গে মনে হচ্ছিল যে সেই ধাড়ি ইঁদুরটা এলেই ওরা কেমন যেন চুপ মেরে যায়। পড়ার বাতিটার সবুজ শেডে ঢাকা পড়ছিল আলো, ফলে অন্যান্য দিনের মতই সিলিংসহ ঘরের ওপরের অংশগুলো অন্ধকারেই রয়ে গেছিল, ফায়ারপ্লেসের আগুন থেকে আলো ছড়াচ্ছিল মেঝেসহ ঘরের অন্য কোণায়। বেশ খিদে পেয়েছিল। ম্যালকমসন ডিনার সেরে নিল। শেষ করল একটা সিগারেট। তারপর ডুবে গেল পড়াশুনায়, কারণ তার মনে ছিল সে ডক্টরের কাছে কথা দিয়েছে, বেশি রাত করবে না।

ঘন্টাখানেক পড়া চলল ভালই, কিন্তু তারপরেই তার মনোসংযোগটা কেটে গেল। তার পারিপার্শ্বিকতাই হয়ত এর জন্য দায়ী। সে সময় বাইরের দমকা হাওয়া ক্রমশ বাড়তে বাড়তে ঝড়ের রূপ নিয়েছে। বাড়িটা শক্তপোক্ত হলেও পুরোন তো বটেই, কাজেই ঝড়ের ধাক্কায় গোটা বাড়িটাই মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠছিল, বাড়ির ফাঁকা ঘর আর করিডোরে অদ্ভুত সব শব্দ তৈরি হচ্ছিল হাওয়ার চোটে। এমনকি ছাতের সেই বিশাল পাগলা ঘন্টিটাও বোধহয় সামান্য দুলছিল, সেটা বোঝা যাচ্ছিল দড়িটার থেকে নড়ে ওঠা দেখে। দড়িটার শেষের অংশটা মেঝের ওপর পড়েই গেল একটা ফাঁপা আওয়াজ করে।

দড়িটার মেঝেতে পড়ে যাওয়ার আওয়াজ পেয়েই ম্যালকমসনের মনে পড়ে গেল ডক্টরের কথাটা, "ওটা কিসের দড়ি জানেন? ফাঁসির দড়ি। জজসাহেবের ফাঁসির আসামীদের ঐ দড়িতে ঝোলানো হত।" সে ফায়ারপ্লেসের কোণায় গিয়ে দড়িটা তুলে নিয়ে দেখল ভাল করে, ভাবছিল কতগুলো লোককে ঐ দড়িতে ঝোলানো হয়েছিল, যখন সে ভাবছিল, তখনও কিন্তু দড়িটা সামান্য দুলছিল ছাদের ঘন্টার নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু হথাৎ মনে হল দড়ির কাঁপুনিটা যেন একটু অন্যরকম ঠেকছে।

ম্যালকমসন ওপরে তাকিয়ে দেখল দড়িটা বেয়ে নেমে আসছে সেই ধেড়ে ইঁদুরটা, একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে। দড়িটা হাত থেকে পড়ে গেল তার, বিড়বিড় করে কিছু একটা বলে উঠল সে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই দড়ি বেয়ে ইঁদুরটা আবার ওপরে উঠে কোথায় মিলিয়ে গেল। একইসঙ্গে ম্যালকমসন টের পেল, যে ইঁদুরগুলোর চেঁচামেচি থেমে গেছিল, সেগুলো আবার শুরু করেছে।

হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, সে যে ছবিগুলো পরিষ্কার করে রাখতে বলেছিল, সেগুলো তো দেখা হয়নি! আরেকটা বাতি জ্বালাল সে, যেটার শেড নেই, সেটা নিয়ে সোজা চলে গেল ফায়ারপ্লেসের ডানহাতের তিন নম্বর ছবিটার কাছে, যেখানে আগের রাত্তিরে ইঁদুরটা অদৃশ্য হয়েছিল।

ছবিটার দিকে প্রথম বার তাকিয়েই সে এমন চমকে উঠল, যে হাত থেকে বাতিটা প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখ, কপালে জমে উঠল ঘামের বিন্দু, কাঁপতে লাগল হাঁটু থরথর করে, তার সঙ্গে সারা শরীরটাই। তবুও সে বয়সে তরুণ, আর চেহারা বেশ শক্তপোক্ত বলে কোনওক্রমে নিজেকে সামলে শক্ত হাতে বাতিটা ধরে ছবিটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, যে ছবিটা ধুয়েমুছে সাফসুতরো করে রাখা হয়েছে।

ছবিটা একজন বিচারকের, কোর্টের পোশাকে। তাঁর মুখ শক্ত, কঠোর এবং দয়াহীন। একটা অশুভ ভাব ছড়িয়ে আছে সারা মুখ জুড়ে। বিশ্রী ঠোঁট, শিকারী বাজ বা ঈগলের মত বাঁকানো নাক, চোখদুটো ভীষণ উজ্জ্বল, বুদ্ধিদৃপ্ত এবং ভয়ংকর। চোখদুটো দেখেই ম্যালকমসনের হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল, কারণ চোখদুটোর সঙ্গে খুব, খু-ব মিল আছে একটা প্রাণীর। সেটা সেই ধাড়ি ইঁদুরটার। তার হাত ফসকে বাতিটা প্রায় পড়েই যাচ্ছিল, কারণ সে দেখল, সেই ইঁদুরটা ছবিটার পাশের গর্তটার থেকে আবার মুখ বাড়িয়েছে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই অন্য ইঁদুরগুলোর আওয়াজ থেমে গেছে। যা হোক, মনে সাহস এনে সে ছবিটা দেখে যেতে লাগল।

বিচারক বসে আছেন একটা বিরাট বাঁকানো ওক কাঠের চেয়ারে, যে চেয়ারটা রয়েছে ফায়ারপ্লেসের ডানদিকে। ওপরের সিলিং থেকে একটা দড়ি ঝুলছে, যেটার শেষ প্রান্তটা লুটিয়ে রয়েছে মেঝের ওপর। আতঙ্কের সঙ্গে ম্যালকমসন খেয়াল করল ছবিটার সঙ্গে এই ঘরটার দারুণ মিল আছে। সে চট করে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনটা দেখে নিল, যেন সেখানে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। তারপর তাকাল ফায়ারপ্লেসটার দিকে --- সঙ্গেই সঙ্গেই একটা চিৎকারের সঙ্গে তার হাত থেকে বাতিটা পড়ে গেল।

সেখানে, জজসাহেবের চেয়ারে, যেখানে দড়িটা ঝুলছে, বসে আছে সেই ধাড়ি ইঁদুরটা, ভয়ংকর দুটো চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। চারদিক নিস্তব্ধ, শুধু ঝড়ের শব্দ ছাড়া।

বাতিটা পড়ে যেতেই সম্বিৎ ফিরল ম্যালকমসনের। ধাতব আওয়াজটা তার নার্ভগুলোকে স্বাভাবিক করতে সাহায্য করল। বাতিটা তুলে, নিভিয়ে দিয়ে কপালের ঘাম মুছে সে ভাবল, তাহলে কি ডক্টরের কথাই ঠিক?" ঠিক তাই! না হলে আমি এই ছবির সঙ্গে সবকিছু গুলিয়ে ফেলছি কেন? নাঃ, এটা বন্ধ হওয়া দরকার!"

জল মিশিয়ে এক পাত্র কড়া ব্যান্ডি নিয়ে সে আবার পড়ার টেবিলে গিয়ে বসল। ঘন্টাখানেক বাদে বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুলল সে। ঘরে যেন মনে হচ্ছে আচমকা একটা স্তব্ধতা নেমে এসেছে। যদিও বাইরে তখন ঝড়ের তান্ডব চলছিল আগের চেয়েও জোরে, বৃষ্টির ফোঁটা আছড়ে পড়ছিল জানালার পাল্লায়, কাচে, ফায়ারপ্লেসের চিমনিতে --- সেই ঝড়ের আওয়াজ প্রতিধ্বনি তৈরি করছিল, দু এক ফোঁটা বৃষ্টি সেই চিমনির মধ্যে দিয়ে নীচে এসে পড়ছিল আগুনের

মধ্যে --- হিস হিস আওয়াজ হচ্ছিল তাতে। আগুন এখন অনেকটাই কমে এসেছে, যদিও তাতে একটা লাল আভা দেখা যাচ্ছিল। ম্যালকমসন কান খাড়া করল। খুব ক্ষীণ একটা কিচকিচ আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না? আওয়াজটা আসছে ঘরের কোনা থেকে, যেখানে দড়িটা ঝুলছে। অবশ্য আওয়াজটা ঘন্টাটা হাওয়ায় দুলছে বলে দড়িটাও নড়ছে, সেটাই মেঝেতে ঘষা খেয়েও হতে পারে। ম্যালকমসন কি মনে হওয়াতে ওপরে তাকিয়ে দেখল, সেই ইঁদুরটা দড়িটা ঘরে সেটা দাঁতে কাটছে। কাটছে মানে প্রায় কেটে ফেলেছে, আঁশ বেরিয়ে এসেছে সেটা থেকে। এবার দড়িটা ওককাঠের মেঝেতে খসে পড়ল, ধাড়ি ইঁদুরটা কিন্তু দড়ির ওপরের অংশটা ধরেই ঝুলতে লাগল, সেটা হাওয়ায় দুলছিল এধার ওধারে। মুহুর্তের জন্য ম্যালকমসনের মনে একটা আতঙ্ক দেখা দিল, কারণ দড়িটা কেটে দেওয়ার ফলে এখন সে ইচ্ছে করলেও দড়ি টেনে ঘন্টা বাজাতে পারবে না, ফলে তার কোন বিপদ হলেও বাইরের লোক কিছুই জানতে পারবে না, কিন্তু পরমুহুর্তেই আতঙ্ক পরিণত হল ক্রোধে, সে রাগের চোটে হাতের সামনে যে বইটা ছিল, সেটাই ছুঁড়ে মারল ইঁদুরটার দিকে। তাকটা একেবারে নিখুঁত হলেও ইঁদুরটা একটা লাফ মেরে মেঝেয় এসে পড়ল থপ করে। ম্যালকমসন তাড়া করে গেল সেটাকে, কিন্তু সেটা দৌড়ে অন্ধকার ঘরের কোনখানে যেন লুকিয়ে পড়ল। “পড়া মাথায় উঠল দেখছি আজকের মত। ঠিক হ্যায়, আজ আমি ওর শেষ দেখে ছাড়ব,” ভাবল ম্যালকমসন। বাতির ওপর থেকে সবুজ শেডটা খুলে নিল সে, যাতে বেশি আলো পাওয়া যায়। এখন ঘরের ওপরের অংশেও আলো ছড়াচ্ছে আগের তুলনায়, আর দেয়ালের ছবিগুলোও পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার ঠিক উল্টোদিকের দেয়ালেই রয়েছে ফায়ারপ্লেসের ডানদিক থেকে সেই তিন নম্বর ছবিটা। বারকয়েক চোখ কচলালো সে। সে চোখে ভুল দেখছে না তো? কি আশ্চর্য! তারপর একটা ভয়ের স্রোত বয়ে যেতে লাগল তার সারা শরীর জুড়ে।

ছবির মাঝখানটায় একটা বিরাট এলোমেলো ছাপ, ছাপটা একেবারে টাটকা। ছবির বাকি অংশগুলো ঠিকই আছে, সেই চেয়ার, সেই ফায়ারপ্লেস, সেই দড়ি--- কিন্তু ফ্রেমের মাঝখান থেকে বিচারকের ছবিটা উধাও হয়ে গেছে।

আতঙ্কগ্রস্ত ম্যালকমসন ধীরে ধীরে ঘুরে গেল, এবং থরথর করে কাঁপতে শুরু করল মৃগীরোগীর মত। তার সারা শরীরটা দুলছে, তার সারা শরীর থেকে সমস্ত শক্তি কে যেন শুষে নিয়েছে, এমনকি তার চিন্তা করার মত শক্তিও নেই, সে শুধুমাত্র দেখছে এবং শুনছে।

সেই বিরাট বাঁকানো ওককাঠের চেয়ারটায় বসে আছেব জজসাহেব, বিচারের পোশাকে, তাকিয়ে আছেন ক্রূর চোখে, নিষ্ঠুর মুখে একটা বাঁকা হাসি, এবং তার হাতে রয়েছে একটা কালো টুপি। ম্যালকমসনের সারা শরীরের রক্ত যেন জমাট বেঁধে গেল। তার কানে বাজছে একটা

গুনগুনানি। বাইরে চলছে ঝড়ের তান্ডবলীলা তার মধ্যেও সে শুনতে পেল মার্কেট প্লেসের বিরাট পেটা ঘড়িতে বারোটা বাজার ঘন্টাধ্বনি শুরু হয়েছে, সূচনা করছে মধ্যরাত্রির। সে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মতো, বিস্ফারিত চোখে, দম বন্ধ করে। ঘন্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই বিচারকের মুখের হাসিটা চওড়া হল, এবং শেষ ঘন্টাটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মাথায় পরে নিলেন কালো রঙের টুপিটা।

ধীরে ধীরে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন জজসাহেব, মেঝে থেকে তুলে নিলেন দড়িটা, ওটার স্পর্শ যেন তাকে খুব আরাম দিল। তারপর তিনি দড়িটার একপাশে গিঁট দিয়ে একটা ফাঁস তৈরি করলেন, যতটা সম্ভব চেপে এবং শক্ত করে, হাতে ধরে রাখলেন সেটা। তারপর ম্যালকমসনের দিকে তাকিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন। তারপর খুব দ্রুত তার পাশ কাটিয়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ম্যালকমসন বুঝতে পারল সে ফাঁদে পড়েছে। সে ভেবে পেল না এখন কি করা উচিত। জজসাহেবের কিছু একটা মতলব আছে। অতএব ঐ দিক থেকে কোনক্রমেই চোখ সরানো উচিত হবে না। সে দেখতে পেল, জজসাহেব, যিনি দরজা আটকে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি ফাঁসটা ছুঁড়ে দিলেন তাকে লক্ষ্য করে। চট করে একপাশে সরে গেল সে, ফাঁসটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ধপ করে পড়ল কাঠের মেঝেতে। ফাঁসটা তুলে নিলেন বিচারক, ছুঁড়ে মারলেন তার দিকে, এবারও ম্যালকমসন এড়িয়ে গেল সেটা। তারপর আবার, আবার। বিচারক কিন্তু একবারের জন্যও বিরক্ত হচ্ছিলেন না, বরং মনে হচ্ছিল তিনি ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করছেন, বেড়াল ইঁদুরকে নিয়ে যেরকম খেলা করে। কোন দিশা করতে না পেরে ম্যালকমসন চারিদিকে একবার তাকাল। বাতির আলোটা আচমকা বেড়ে সারা ঘর এখন আলোকিত। সেই আলোয় সে দেখতে পেল, কি আশর্য, মেঝের এবং দেয়ালের প্রতিটি গর্ত দিয়ে ইঁদুরের চোখ দেখা যাচ্ছে--- অজস্র, অজস্র ইঁদুর। ওরা যেন এই লড়াই দেখছে। কে জানে কেন, ওদের দেখে ম্যালকমসন একটু স্বস্তি পেল। তার মনে হল, সে একা নেই, এরাও তাকে সঙ্গ দিচ্ছে। ওপরে তাকিয়ে দেখল পাগলা ঘন্টির দড়িটা ধরে ঝুলছে অসংখ্য ইঁদুর, এক ইঞ্চি জায়গাও আর ফাঁকা নেই সেখানে, আর সিলিং-এর গোল গর্তটা দিয়ে বেরিয়ে আসছে আরো অনেক ইঁদুর, ওদের ভারে পাগলা ঘন্টিটা দুলতে শুরু করেছে।

দুলতে শুরু করেছে ঘন্টাটা। আরে ঘন্টাটা একবার বেজে উঠল না? যদিও আওয়াজটা খুবই ক্ষীণ, তবুও ওটা বেজেছে। যদি ওটার দুলুনি আরো বেড়ে যায়, তাহলে বোধহয় আওয়াজটাও বাড়তে থাকবে।

কিন্তু আওয়াজটা শুনেই জজসাহেব, যিনি একবারের জন্যও ম্যালকমসনের থেকে চোখ সরাননি, তাঁর চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। তাঁর চোখদুটো মনে হচ্ছে জ্বলন্ত কয়লার টুকরো, রাগে

মেঝেতে পা ঠুকলেন তিনি, সারা বাড়ি কেঁপে উঠল সেই পা ঠোকানিতে। মেঝে থেকে ফাঁসির দড়িটা কুড়িয়ে নিলেন। বাইরে প্রচন্ড জোরে শোনা গেল বজ্রনির্ঘোষ। ইঁদুরগুলো দড়ি ধরে সমানে ওঠানামা করছে, যেন তাদের হাতে আর সময় নেই, তারা যেন আর ধৈর্য রাখতে পারছে না। এবার জজসাহেব ফাঁসটা ছুঁড়ে দেওয়ার বদলে এগিয়ে গেলেন তাঁর শিকারের দিকে, হাতে ধরা ফাঁসের দড়িটা। ম্যালকমসনের যেন পক্ষাঘাত হয়েছে, সে যেন পরিণত হয়েছে একটা শক্ত হয়ে যাওয়া মৃতদেহে, যার নড়ার ক্ষমতা নেই। সে বুঝতে পারছে বিচারকের বরফের মত ঠান্ডা আঙুলগুলো তার গলা স্পর্শ করল, ফাঁসিটা পরিয়ে দিল তার গলায় --- সেটা ক্রমশ শক্ত হয়ে

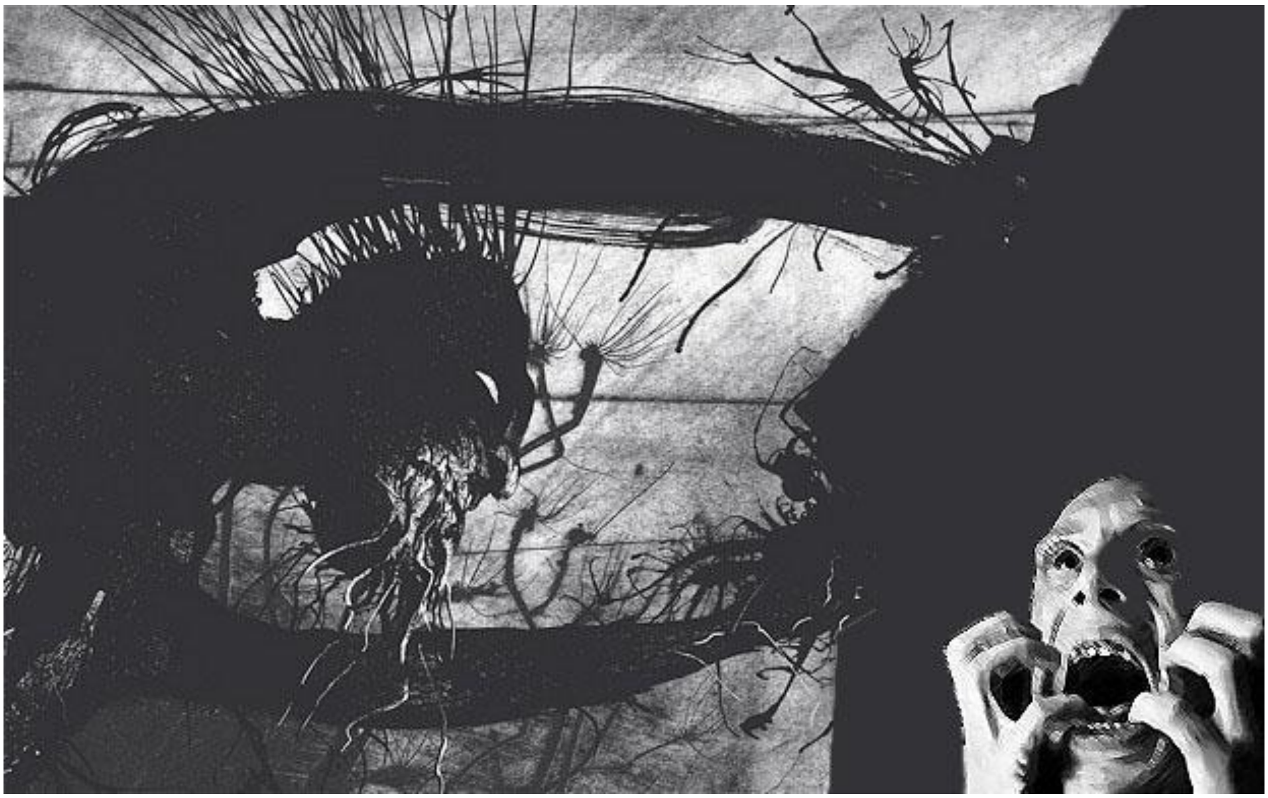

এঁটে গেল তার গলায়। তারপর জজসাহেব দুহাতে তুলে নিলেন জড়ভরত হয়ে যাওয়া তরুণ ছাত্র ম্যালকমসনকে, সোজা গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন সেই ওককাঠের চেয়ারটায়। তারপর তার পাশে দাঁড়িয়ে একটু উঁচু হয়ে হাত তুলে পাগলা ঘন্টি থেকে ঝুলতে থাকা কাটা দড়িটা ধরলেন। তিনি ওপর দিকে হাত তোলার সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য ইঁদুরগুলো আওয়াজ করতে করতে সিলিং-এর গর্ত দিয়ে উধাও হয়ে গেছিল। তারপর কাটা দড়িটার সঙ্গে ম্যালকমসনের গলার ফাঁসির দড়ির বাকি অংশটা বেঁধে দিলেন গিঁট দিয়ে। আর তারপর ঠেলে সরিয়ে দিলেন চেয়ারটা।

জজসাহেবের বাড়ির পাগলা ঘন্টিটা বাজতে শুরু করতেই আশেপাশের বাড়ি থেকে লোকজন বেরিয়ে পড়েছিল, বাতি আর টর্চ নিয়ে জড়ো হয়েছিল জজসাহেবের বাড়ির সামনে,

নিঃশব্দে, থমথমে মুখে। প্রথমে তারা দরজা ধাক্কাল, কোন সাড়া নেই। তারপর তারা ভেঙে ফেলল দরজাটা, ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতর, জড়ো হল ডাইনিং হলে, সবার আগে রয়েছেন ডক্টর।

সেখানে, সেই বিরাট পাগলা ঘন্টির থেকে নেমে আসা দড়িটা একপ্রান্তে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় দুলছিল ম্যলকমসনের দেহটা, আর দেয়ালে টাঙানো ছবিটায় জজসাহেবের মুখে ফুটে উঠেছিল একটা অদ্ভূত আনন্দের হাসি।

[ব্রাম স্টোকার রচিত ‘দি জাজেস হাউস’ অবলম্বনে]

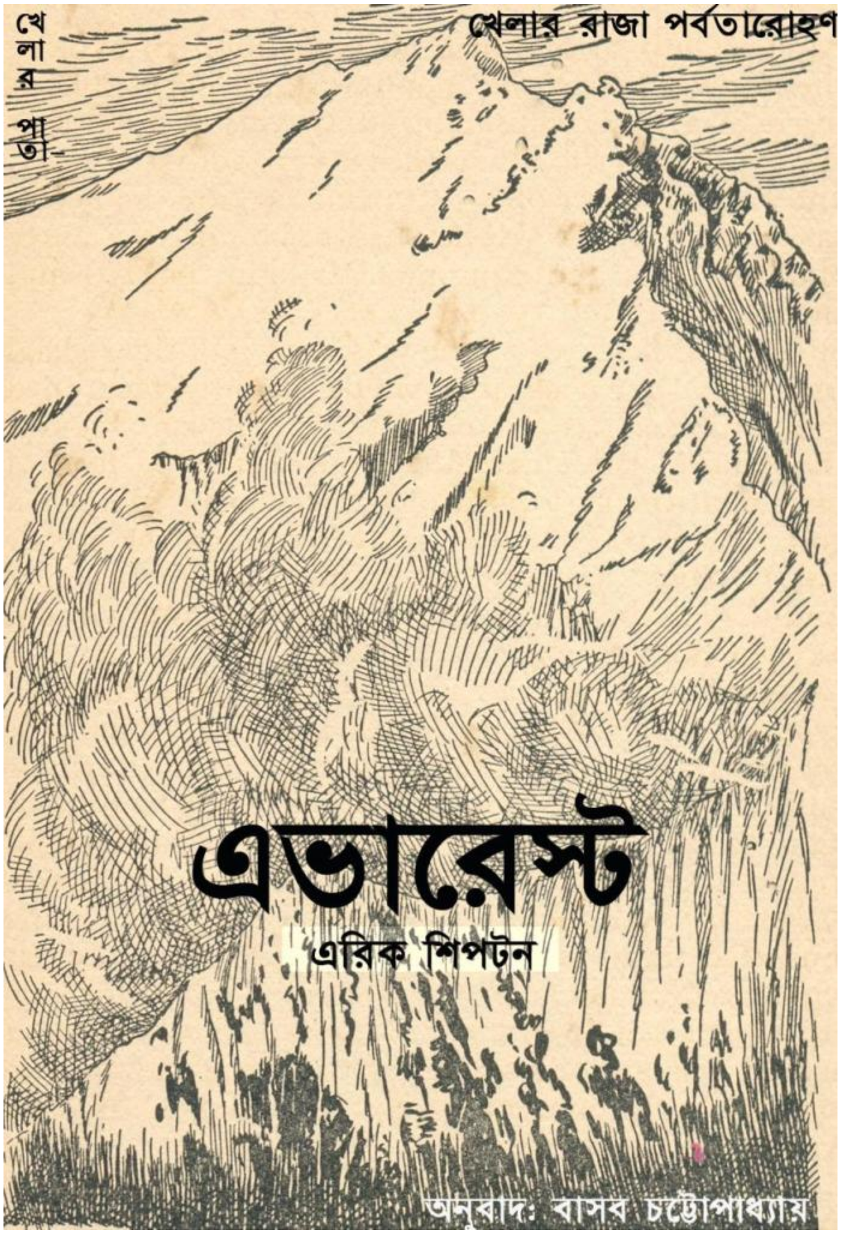

পরবর্তী সময়ে ম্যালরি লিখেছেন, “সেই মুহূর্তটায় দড়িটা কী করে সেটার পরীক্ষা যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ বিপর্যয় আটকাবার জন্য আমাদের আর কিছু করবার ছিল না। বন্দরে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা জাহাজের কাছির মতই টানটান হয়ে সেটা কুড়ুলের গায়ে টান লাগাল। কুড়ুল নড়ল না। তারপর দড়ি তার ভেলকি দেখাল।”

ভেলকি ম্যালরিও অবশ্য দেখিয়েছিলেন । দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে বিপদের মুখে নির্ভুল পদক্ষেপটা তিনি নিতে পারবার জন্যই গোটা দলটা সেবারে বেঁচে ফিরেছিল।

তবে পরীক্ষা তখনো শেষ হয়নি তাঁদের। সামলে ওঠবার পর দীর্ঘ সময় ধরে আস্তে আস্তে বরফের ঢালটায় ধাপ কেটে কেটে তাঁদের নামতে হচ্ছিল। মোরসেড তখন এতই অসুস্থ যে নিজে পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতাও তাঁর আর নেই। দীর্ঘ কসরতের পর নর্থ কল-এ পৌঁছবার পরও পরিশ্রম শেষ হল না। তখন শুরু হল বিপজ্জনক ক্রিভাস ও আইস ব্লকের জঙ্গলের মধ্যে পথ করে করে তাঁদের ক্যাম্পে পৌঁছোবার পথ বের করার পালা।

ক্যাম্পে পৌঁছোতে সাড়ে এগারোটা বাজল। তেষ্টায় তখন সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে পৌঁছে দেখা গেল, সেখান থেকে স্টোভ, জ্বালানি সবকিছু নামিইয়ে নেয়া হয়েছে তিন নম্বর ক্যাম্পে। ফলে বরফ গলিয়ে জল বানাবার কোন উপায় নেই। স্ট্রবেরি জ্যামের সঙ্গে কৌটোর দুধ আর বরফ মিশিয়ে কোনমতে খাওয়ার পালা সারা হল সেদিন।

পরদিন নর্থ কল-এর গা বেয়ে তাঁরা নেমে এলেন তিন নম্বর ক্যাম্পে। নামার পথে দেখা হল ফিঞ্চ, জিওফ্রে ব্রুস, ওয়েকফিল্ড, গুর্খা এন সি ও-র তেজবীর আর একদল শেরপার সঙ্গে। তারা চলেছে ওপরের দিকে। ফিঞ্চ তখন সেরে উঠেছেন। ঠিক করা হয়েছে ব্রুস ও তেজবীরকে নিয়ে তিনি আর একবার চূড়ায় ওঠবার চেষ্টা করে দেখবেন। এবার অবশ্য অক্সিজেন সঙ্গে নিয়ে চেষ্টাটা করা হবে। ২৫শে মে এই দলটা ২৫,৫০০ ফিট উচ্চতায় গিয়ে ফের পাঁচ নম্বর ক্যাম্প স্থাপন করল। অক্সিজেন সিলিণ্ডার ও অন্যান্য জিনিসপত্র সেখানে পৌঁছে দিয়ে শেরপারা নেমে এল নর্থ কল-এ।

আবহাওয়া তখন ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। অভিযাত্রীরা ক্যাম্পে ঠিকঠাক হয়ে থিতু হবার আগেই দেখা গেল বড়োসড়ো একটা ঝড় উঠছে। সারারাত ধরে সে ঝড়ের তাণ্ডব চলল। মাঝেমাঝেই তার দাপটে তাঁবুর দড়ি ছিঁড়ে যাচ্ছিল। ঝড়ের বিরতিতে ঝুঁকি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে সেই দড়ি লাগাবার কাজও করতে হচ্ছিল তাঁদের।

ভোর ভোর ঝড়ের তেজ খানিকক্ষণের জন্য কিছু কমলেও তারপর দ্বিগুণ তেজে ফের ফিরে এলো ঝড়। হাওয়ার ঠেলায় তাঁবুর কাপড়ের ফাঁক দিয়ে উড়ন্ত বরফ ঢুকে আসছিল ভেতরে। হাওয়ার ধাক্কায় স্টোভ জ্বালানোও অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। তাঁবুর ভেতরে শুয়ে শুয়ে ঝড়ের শব্দ শোনা আর তাঁবু যাতে ছিঁড়ে উড়ে না যায় সেই প্রার্থনা করা ছাড়া অভিযাত্রীদের তখন আর কিছু করবার নেই। মাঝে একবার উড়ন্ত এক পাথরের ঘায়ে তাঁবুর কাপড় ফেটে গেল বেশ খানিকটা।

দুপুর নাগাদ অবশেষে ঝড়ের দাপট কমল। অভিযাত্রীরা সঙ্গে একদিনের মত খাবারই নিয়ে এসেছিল। সেই একদিন সময় ঝড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, হার মেনে ফের নীচে নেমে যাবার কথা প্রথমে ভাবা হলেও পরে, সেই খাবার অল্প অল্প করে খেয়ে আবহাওয়ার উন্নতির জন্য অপেক্ষা করাই ঠিক হল। সন্ধে ছটা নাগাদ তাঁবুর বাইরে গলার

আওয়াজ পাওয়া যেতে অবাক হয়ে বাইরে বের হয়ে তাঁরা দেখেন শেরপাদের একটা ছোট দল নিচের ক্যাম্প থেকে ভীষণ বিপদ মাথায় করে থার্মস ফ্লাস্কে করে তাঁদের জন্য গরম স্যুপ আর চা নিয়ে এসেছে। সেই খেয়ে খানিক স্বস্তি হল সকলের। তারপর, সঙ্গে আনা অক্সিজেন সিলিন্ডার থেকে একটু একটু করে অক্সিজেন টেনে দ্বিতীয় রাতটা কোনমতে কাটালেন তাঁরা। পরদিন সকাল ছটা বাজতেই দলটা রওনা হল। তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ওজন টানছিল তেজবীর। কয়েক শো ফিট যাবার পর সে আর চলতে পারল না। তখন তার বোঝাটা ভাগাভাগি করে নিয়ে তাকে ক্যাম্পে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়ে ব্রুস আর ফিঞ্চ ওপরের দিকে উঠে চললেন।

খানিক বাদে ফের ঝড় উঠল। এইবারে পথ চলা আর তত সহজ রইল না। গতি কমে এলো। ঢালু পথে একবার কেউ পিছল খেলে তার পতন আটকানো মুশকিল হত কিন্তু তবু যতটুকু গতি বাড়ানো যায় সেই আশায় তাঁরা দুজন একে অন্যের মধ্যে দড়ির সংযোগটুকু না রেখেই উঠে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আশা ক্রমশই কমছিল। এ অবস্থায় পর্বতারোহীর সমস্যাটা হয় বিমান অভিযাত্রীর মত। ফেরবার মত জ্বালানি যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণই তিনি এগিয়ে যেতে পারেন। ফিঞ্চরাও তাই ততক্ষণই চূড়ার দিকে এগোতে পারবেন যতক্ষণ নিরাপদে ফেরবার মত সময় হাতে থাকবে।

দুপুরবেলায়, চূড়া থেকে মাত্র ১৭০০ ফুট দূরত্বে এসে ফিঞ্চ সিদ্ধান্ত নিলেন, আর দেরি করলে ফেরবার মত সময় হাতে থাকবে না। পরবর্তীকালে তিনি লিখেছেন, "আমি জানতাম আর ৫০০ ফুটও যদি সামনের দিকে এগোতাম আমরা, তাহলে আর ফিরে আসবার মত সময় থাকতো না আমাদের হাতে।"

এভারেস্টের চূড়া তখন একেবারে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সামনে। কিন্তু তবুও জয়ের আশা ছেড়ে দিয়ে তাঁদের ফেরার পথ ধরতে হল।

পাঁচ নম্বর ক্যাম্পে তাঁরা ফিরে এলেন বেলা আড়াইটের সময়। তারপর ধীরে ধীরে চার নম্বর ক্যাম্পে নেমে এসে গরম চা আর স্প্যাগেটি খেয়ে নিয়ে ফের নেমে চললেন। মাত্র চল্লিশ মিনিটের মধ্যে তাঁরা নেমে এলেন তিন নম্বর ক্যাম্পে। সেই এক বিকেলে তাঁরা ছ হাজার ফিট পথ নেমে এসেছিলেন। বেস ক্যাম্পে ফিরে তাঁরা সবাই মিলে আলোচনায় বসলেন তৃতীয়বার চেষ্টা করা যায় কিনা তাই নিয়ে। সে চেষ্টা করবার পথে প্রধান সমস্যা ছিল দলের লোকজনের অসুস্থতা। নর্টন, ব্রুস আর মোরসেড তখন তুষারক্ষতে আক্রান্ত। বাকিরাও বেজায় ক্লান্ত। অবশেষে ম্যালরি, সমারভেল, ফিঞ্চ, ওয়েকফিল্ড আর ক্রফোর্ড মিলে ফের একবার পূর্ব রোংবুক হিমবাহের পথে ওপরের ক্যাম্পের দিকে রওনা হলেন।

কিছুদূর গিয়ে ফিঞ্চ ক্লান্ত হয়ে সরে গেলেন। তিন নম্বর ক্যাম্পে ওয়েকফিল্ড রয়ে গেলেন।বাকি তিনজন, চোদ্দজন মালবাহককে নিয়ে উঠে চললেন চার নম্বর ক্যাম্পের দিকে। দ্বিতীয় চেষ্টার পর থেকে পাহাড়ে তখন অনেক তুষারপাত হয়ে গিয়েছে। নর্থ কল-এর ঢালের অন্তত দুটো জায়গায় ম্যালরি হিমানি সম্প্রপাতের সম্ভাবনা লক্ষ্য করে সাবধান হয়ে গেলেন। তার একটা ছিল নিচের দিকে। সেখানটা দিয়ে চারটে দড়িতে সকলের মিলে ভাগাভাগি করে সাবধানে উঠতে উঠতে যখন কল-এর চূড়া আর মাত্র ছশো ফিট দূরে তখন হঠাৎ বিপদ এল। ম্যালরি লিখছেন, "হঠাৎ করে পাহাড়ের নৈঃশব্দ ভেঙে গিয়ে একটা তীক্ষ্ণ, বারুদের স্তুপের বিস্ফোরণের মত শব্দ ভেসে এল।" প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পায়ের নিচের ঢালটা নড়ে উঠে আরোহীদের নিয়ে নিচের দিকে সরসর করে নেমে যেতে শুরু করল। সেইসঙ্গে তুষারের ঢেউ উঠে তাঁদের ঢেকে দিতে শুরু করল। তিনজন আরোহী আর একজন শেরপাসহ সবার ওপরের দড়িটা নিরাপদেই ছিল। হিমানী সম্প্রপাতের ধাক্কা তাদের বিশেষ লাগেনি। তাদের নিচের চারজন শেরপাকে নিয়ে দ্বিতীয় দড়িটাও নিরাপদে ছিল। কিন্তু বাকি দুটো দড়ির ন'জন মানুষের কোন হদিশ পাওয়া যাচ্ছিল না। সবকিছু ফের শান্ত হলে ওপরের দুটি দড়ির আটজন তাড়াতাড়ি করে নিচে নেমে এলেন। আশা ছিলো বাকি নজনকে বরফের আস্তরের তলা থেকে খুঁজে নিয়ে উদ্ধার করতে পারবেন। কিন্তু দেখা গেল, চলমান বরফের স্রোত তাদের নিয়ে পাশের চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ফুট উঁচু একটা বরফের ঢিবির ওপর দিয়ে গিয়ে নিচে পড়েছে। নিচে বরফের গায়ের বড় বড় ফাটলগুলো সম্প্রপাতের নতুন বরফে ভরে গিয়েছে ততক্ষণে। মানুষগুলোর কোন চিহ্ন অবশিষ্ট নেই আর। তাড়াতাড়ি করে সবাই মিলে সেই বরফের কবর খোঁড়বার কাজে হাত লাগালেও মাত্রই দুজন মানুষকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হল। বাকি সাতজনের দেহ যতক্ষণে উধার হল ততক্ষণে তাঁদের দেহে প্রাণ নেই।

পরবর্তী সময়ে আরো দুবার নর্থ কলের পূবের এই ঢালটাইয় প্রায় মরতে মরতে বেঁচে গিয়ে আমরা বুঝেছিলাম এ দিকটা কি ভীষণ বিপজ্জনক এলাকা।

ক্রমশ

এর পর থেকে নাগপুর অবধি আর বিশেষ কিছু ঘটলো না। নাগপুরে পৌঁছে শহরের বাইরে একটা ঝিলের পাশে দলের বেশির ভাগ লোক ঘাঁটি গাড়লো। বাবা আর দলের কয়েকজন মিলে , লুটপাট করে রাখা জিনিসপত্র বিক্রিবাট্টার জন্য শহরে গিয়ে বাসা নিলেন। নাগপুর শহরে স্যাকরা কিংবা সাহুকারের অভাব নেই। কাজেই ব্রিজলালের সোনাদানা বিক্রি করে দিতে সমস্যা হল না বিশেষ। এমনই এক সাহুকারের কাছে দরদস্তুর করবার সময় বাবা কথায় কথায় বললেন, গ্রামের লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চলেছেন হায়দরাবাদের সিকান্দার জা-র দরবারে। সেখানে তাঁর ভাই চাকরি করে। তাকে বলে গ্রামের লোকজনকে রাজার সেনাদলে চাকরি পাইয়ে দেবেন এই আশা।

সে সময় দেশের অবস্থা সুবিধের নয়। উত্তর দক্ষিণ সর্বত্র হাওয়া গরম। গ্রামের লোক দল বেঁধে গিয়ে পড়লে, সিন্ধিয়া,হোলকার, পেশোয়া যার দরবারেই হোক, সেপাইয়ের চাকরি তার বাঁধা। ফলে এমন লোকজনের দল তখন রাস্তাঘাটে প্রায়ই দেখা যেত। নাগপুরে আসতে আসতে আমরাও দেখেছি। ফলে বাবার কথায় অবিশ্বাস করবার মত কিছু ছিল না। তার ওপরে, বাবার সৈন্যের মত চেহারা, গুছিয়ে কথা বলার ঢঙ, দামি ঘোড়া এইসব দেখলেই লোকের মনে ভরসা আসত। সাহুকারেরও তাই হল। বলে, তারও হায়দরাবাদে যাবার কথা। কিন্তু সেথো মিলছেনা। বাবা যদি তাঁর দলের সঙ্গে তাকে নিয়ে গিয়ে নিরাপদে হায়দরাবাদে পৌঁছে দেন তাহলে সে তার জন্য অনেক টাকা দিতে রাজি।

বাবা তো সঙ্গে সঙ্গে রাজি। তখন সাহুকার তাঁকে ডেকে নিয়ে সারাদিন ধরে যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে অনেক শলাপরামর্শ করল। কথাবার্তায় জানা গেল সাহুকার হায়দরাবাদ যাবে বেশ কিছু দামি পাথর আর অন্যান্য দামি সওদা নিয়ে। সেসব জিনিসপত্র একবার দেখে নিয়ে ঝিলের ধারের তাঁবুতে ফিরলেন বাবা। তাঁর কাছে সব কথা শুনে তাঁবুতে আমাদের আনন্দ দেখে কে!

পরদিন থেকে প্রস্তুতি শুরু হল আমাদের। দলের লোকজনকে গাদা বন্দুক, ঢাল, তলোয়ার কিনে দিয়ে সৈন্য সাজানো হল। তারপর তাদের ভালো করে শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি করে নেয়া হল যাতে সাহুকারের কোনরকম সন্দেহ না হতে পারে।

তার পরের দিন সন্ধেবেলা সাহুকার একটা টাট্টুঘোড়ায় টানা জিনিসপত্রে বোঝাই গাড়ি নিয়ে আমাদের শিবিরে চলে এলো। গাড়ি ছাড়া তার সঙ্গে ছিলো সাতজন লোক আর দশটা বলদ। রওনা হবার পর অমরাবতী অবধি তার সঙ্গে আমাদের কারো বিশেষ দেখাসাক্ষাত হত না। আমার বাবা আর হুসেন মাঝেমাঝে সন্ধের দিকে তার তাঁবুতে যেত গল্প করতে। মধ্যে

একদিন আমাকেও নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দেয়া হয়েছিল তার সাথে। লোকটার শরীরটা বিরাট। ভাবলাম একে দিয়েই আমি আমার প্রথম হাত পরীক্ষা করে দেখি। বাবাকে গিয়ে সে কথা বলতে বাবা বেজায় খুশি হয়ে বলেন, "আমিও তাই ভাবছিলাম। লোকটা যা মোটা, তাতে বিশেষ বাধাটাধা দিতে পারবে না। এরকম শিকার দিয়ে শুরু করলে তোর সুবিধেই হবে।"

ব্যাপারটা নিয়ে কথাবার্তা আর বিশেষ হল না। আমি শুধু রোজ রূপ সিং-এর কাছে গিয়ে হাত মকশো করতে লাগলাম। কদিন বাদে অমরাবতী পৌঁছোলাম আমরা। শহরটা বেশ অবস্থাপন্ন। লোকজনের হাতে টাকাপয়সা আছে। উত্তর আর দক্ষিণ ভারতের মধ্যে সে সময় যতো বাণিজ্য হতো তার সব পণ্য এসে এই অমরাবতীতে প্রথমে জড়ো হয়ে তারপর ফের রওনা দিত নানান পথে। দক্ষিণ ভারতের থেকে আসা মশলা, ওষুধপত্র আর অন্যান্য জিনিসপত্র রওনা হত উত্তর ভারতের পথে, আর উত্তরের থেকে আসা পণ্য রওনা হতো দাক্ষিণাত্যের নানান এলাকায়।

শহরভর্তি হাজারো দোকানপাট আর বড়ো বড়ো বাজার। সেসব বাজারে নেই হেন বস্তু নেই। এমনকি বম্বের বাজারে যেসব বিলিতি জিনিস পাওয়া যায় সেসবও বিক্রি হচ্ছে দেখলাম। অমরাবতীতে আমাদের সাহুকারের কয়েকদিনের কাজ ছিল। সেই ক'দিন সেইসব বাজারে ঘুরে ঘুরেই কদিন কেটে গেল আমার।

অমরাবতী থেকে ম্যাঙ্গালোরের পথে আমরা যখন ফের রওনা হলাম তখন সাহুকারের দলে আরো চারটে লোক আর দামি বেনারসীর গাদা পিঠে বেশ কয়েকটা বলদ জুটেছে। বাবা ঠিক করলেন, আর দেরি না করে ম্যাঙ্গালোর ছাড়বার পরপরই কাজ সেরে ফেলতে হবে। সেইমতো প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল মাদের। দলের জনাতিনেক লোক রাস্তাটা ভালো করে চিনতো। তাদের নিয়ে বসে নানান জিজ্ঞাসাবাদ করে বাবা আর হুসেন মিলে, ম্যাঙ্গালোর ছাড়িয়ে কিছু দূরের একটা ঠিকঠাক জায়গা নির্বাচন করে নিলেন। আমার বুকের ভেতরটা একটু গুরগুর করছিল বটে, কিন্তু তখন তো আর ফেরবার উপায় নেই আমার।

ম্যাঙ্গালোর বেশ বড় শহর। এখানে অনেক মুসলমানের বাস। সন্ত মির হায়াত কালান্দরের মাজার রয়েছে এখানে। সেখানে পুজো দিতে গিয়ে মাজারের দুই পুরুতের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার সময় বাবা তাদের সামনে ঠগিদের কিছু গোপন সংকেত করতে দেখা গেল তারাও সেই সংকেতে উত্তর দিচ্ছে। তার মানে তারাও ঠগি! আমরা কেন দল বেধে এই এলাকায় ঘুরছি সে বিষয়ে দেখা গেল তাদের খুব কৌতুহল। মাজার ছেড়ে বেরোবার সময় বাবা অতএব সবাইকে সাবধান করে দিলেন, আমাদের সঙ্গে যে শিকার রয়েছে তার কথা যেন কেউ ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না করে। নইলে এই স্থানীয় ঠগির দল জানতে পারলে আমাদের ধরিয়ে দিতে

পারে অথবা অনেক চড়া হিস্যা চেয়ে বসতে পারে। অতএব সেইমতো সমস্ত সাবধানতা নেয়া হল।

মাজার ছেড়ে আস্তানায় ফিরে দেখি, সাহুকার সেদিনের মতো শহরে তার এক বন্ধুর আস্তানায় গিয়েছে। ফিরতে দেরি হবে। অতএব একটা দলকে পাঠিয়ে দেয়া হল আগে আগে গিয়ে আক্রমণের জায়গাটা দেখে ঠিকঠাক করে রাখবার জন্য। তাদের সঙ্গে শিকারদের কবর খুঁরে রাখবার জন্য লুগাইরাও বেরিয়ে গেল। আমরা বাকিরা পুরো পরিকল্পনাটা ফের বারবার ঝালিয়ে নিয়ে শুতে যাচ্ছি, এমন সময় রূপ সিং এসে বলে, "বাবা, কাল তোমার প্রথম শিকার। কেমন লাগছে? রক্ত ঠাণ্ডা আছে তো? বুক শক্ত আছে তো?"

আমি বললাম, "বুক আমার শক্তই আছে। আর, হাত ধরে দেখো , রক্তও ঠাণ্ডা আছে।"

আমার হাত ধরে দেখে নিয়ে সে বললো, "হুঁ। হাত তো ঠাণ্ডাই আছে দেখছি। জীবনে তো অনেক দেখলাম! কিন্তু তোমার মত , প্রথম শিকারের আগে এত ধীরস্থির থাকতে আমি কাউকে দেখিনি। এমনকি আমি হেন রাজপুতও নিজেও প্রথম শিকারের আগে আঘাবরে গেছিলাম সে বলার নয়! দেখো বাবা, এ সবই তোমার হল গিয়ে পুজোয়ার্চা মন্ত্রতন্ত্রের শক্তি।"

আমি বললাম, "দূর! ওসব কিছু না করলেও আমি ঠিকই থাকতাম।"

সে বললো, "ও কথা বলে না।মা ভবানী অসন্তুষ্ট হবেন। এখন যাও ,তোমার বাবা, হুসেন, বদ্রিনাথ সবাইকে ডেকে আনো গিয়ে। কাজ আছে।"

খানিক বাদে আমরা সবাই কাছাকাছি একটা মাঠে গিয়ে জড়ো হলাম। পুরুত বদ্রিনাথ রাস্তার দিকে মুখ করে হাত জোড় করে বলল, "হে মা মহাকালী, যদি তোমার নতুন ভক্তের হাতে এই শিকারের বলি সফল হবার হয় তবে তার সংকেত হিসেবে থিবাহু দেখাও মা।"

অমনি ডানদিক থেকে সেই অত রাতেও একটা গাধার ডাক ভেসে এল। এত ভালো থিবাহু আর হয় না। সবাই জয়ধ্বনি করে উঠলো। বাবা আমার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "ভবানী মা তোমার সহায়। এবারে শুধু গলায় রুমালটা বাঁধবার অপেক্ষা।"

রূপ সিং তখন একটা নতুন রুমালের মধ্যে একটা রুপোর টাকা রেখে আমার হাতে দিয়ে বলল, "তোমার অস্ত্র হাতে নাও।এর ওপর বিশ্বাস রেখো। মা মহাকালীর নামে প্রার্থনা করি তুমি সফল হও।" রুমালটা ডানহাত বাড়িয়ে নিয়ে আমি কোমরে গুঁজলাম।

বিশ্রাম সে রাতে আমাদের বিশেষ হল না। খনিক বাদেই সাহুকারের লোক এসে খবর দিল সে আসছে। আমরা তৈরি হতে হতেই সাহুকার এসে পড়ল তার দলবল নিয়ে। প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই আমরা রওনা হয়ে গেলাম।

রাতটা ছিল চাঁদের আলোয় ছাওয়া। রাস্তাও ভালো। অতএব বেশ তাড়াতাড়িই এগোচ্ছিলাম আমরা। ক্রোশ দুই যাবার পর আগে পাঠিয়ে দেয়া দলটার একজনের দেখা মিলল। বাবা তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভিলা মাঞ্জে? (কবর তৈরি?)"

"মাঞ্জে(তৈরি)," বলে লোকটা বলল, খানক দূরে নিচু টিলাগুলো দেখছেন? ওখান দিয়ে একটা ছোট নালা বইছে। ওখানে কবর খুঁড়িয়েছি। দেখে নেবেন জেমাদার সাহেব, এত ভালো কাজ এর আগে বিশেষ হয় নি।"

"জায়গাটা কত দূর?"

"মাইলটাক হবে।তৈরি হোন," এই বলে সে দলের সঙ্গে মিশে গেল।

গোটা দলটার মধ্যে নীরবে সংকেত হয়ে গেল। সকলের অলক্ষ্যে দলের এক একজন করে লোক নিজের নিজের শিকার বেছে নিয়ে তার কাছাকাছি হয়ে চলতে লাগলো। চলতে চলতেই নানা কায়দায় ধাক্কাধাক্কি করতে করতে সাহুকার আর তার গোটা দলটাকেই একেবারে একসঙ্গে করে ফেলা হল। আমি নিঃশব্দে আমার রুমালটা চেপে ধরলাম শক্ত করে। যেকোন সময়ে সংকেত আসবে এবারে।

টিলাগুলোর কাছাকাছি আসতে চারপাশের জঙ্গল ঘন হয়ে এলো। একটা উঁচু হয়ে যাওয়া এলাকায় বেয়ে উঠছি যখন , তখন একজন লোক এসে ফিসফিস করে বাবাকে কী যেন বলল। উঁচু জায়গাটায় উঠে দেখি পায়ের নিচে সেই নালাটা। তার দুপার খাড়া উঁচু হয়ে গেছে। তার গায়ে লতাপাতা আর ঝোপঝাড়ে ঢাকা। বড় বড় গাছগুলো নালার বুকের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। তার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলোয় নালার জল চিকচিক করছিলো।

হঠাৎ বাবা চিৎকার করে উঠলেন, "হুঁশিয়ার!"

এটা ছিল আমাদের তৈরি হবার সংকেত। আওয়াজটা দিয়ে বাবা সাহুকারের টাট্টুঘোড়ার গাড়ির কাছে গিয়ে বললেন, "আমরা নদীর কাছে পৌঁছেছি। খাড়াই পাড়। এখানে আপনাকে গাড়ি থেকে নামতে হবে একবার। নদীটা হেঁটে পার হয়ে গিয়ে আবার নয় গাড়িতে উঠবেন।"

শুনে সাহুকার গাড়ি থেকে নেমে এল। নদীর বুক ধরে হাঁটতে হাঁটতে দেখছিলাম, বেশ হৈ চৈ চলছে। বলদের দল , সাহুকারের লোকজন আর আমাদের লোকজন সব মিলেমিশে একসঙ্গে চলেছে ওপারের দিকে, তবে ওরই মধ্যে আমাদের লোকেরা কিন্তু যার যার শিকারের সঙ্গেসঙ্গে চলেছে ঠিক সংকেতের অপেক্ষা করতে করতে। আমি, বাবা, হুসেন আর সাহুকার চলছিলাম একসঙ্গে। আমি সাহুকারের ঠিক পেছন পেছন ফুটখানেক দূরত্বে, রুমালে হাত রেখে হাঁটছিলাম।

হঠাৎ বাবা ফের হাঁক দিলেন, "জয় কালী।"

এটাই ছিল সে রাত্রের ঝিরণি বা আক্রমনের সংকেত। সঙ্গে সঙ্গে আমার রুমালটা

সাহুকারের গলায় গিয়ে পড়ল। সাহুকার উপুড় হয়ে পড়তে আমি তার পিঠে উঠে রুমালটা মুচড়ে ধরতেই কাজ হয়ে গেল। তার দলের বাকিদেরও ততক্ষণে আমাদের দলের অন্য লোকেদের হাতে একই দশা হয়েছে।

যন্ত্রের মত কাজ করছিল গোটা দলটা। শিকারদের শরীর বয়ে নিয়ে নদীর বুক ধরে খানিক এগিয়ে গিয়ে গভীর এক কাঁটাঝোপের বনের মধ্যে ডালপালা কেটে একটা সুড়ঙ্গমতো তৈরি করা হয়েছে। হামাগুড়ি দিয়ে বেশ খানিকটা ঢুকে এসে দেখা গেল সেখানে নদীর বুকে একসার কবর তৈরি করে রেখে লুগাইরা অপেক্ষা করছে। তাদের নেতার দিকে তাকিয়ে বাবা বললেন, “ভালো কাজ করেছো পীর খান। লুটের মাল ভাগ হবার সময় এবার তোমাদের হিস্যা বেশি হবে।”

কবর দেয়া শেষ হলে তার ওপরে পাথর, বালি আর কাঁটাঝোপ বিছিয়ে দিতে কবরের আর কোন চিহ্নও রইলো না।

ফিরে আসবার সময় দেখি একটা পাতাওয়ালা গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে দলের শেষ লোকটা আমাদের রাস্তাটা ঝাঁট দিতে দিতে আসছে, যাতে বালির ওপর আমাদের পায়ের ছাপ মুছে যায়।

ঝোপের বাইরে এসে সেই সুরঙ্গের মুখটা আবার ভালো করে কাঁটাঝোপ দিয়ে ঢেকে দেয়া হল।

ফিরে এসে দেখি দলের বাকিরা ততক্ষণে লুটের মালপত্র নিয়ে বেশ খানিক পথ এগিয়ে গেছে। তাদের নাগাল ধরবার পর আরো কিছুটা পথ এগিয়ে গিয়ে আমরা শলাপরামর্শ আর বিশ্রামের জন্য থামলাম। সামনেই পড়বে বেসিম নামের একটা জায়গা। সেখানে সাহুকারের চেনাপরিচিত লোক থাকতে পারে। তারা যদি তার মার্কা দেয়া বলদগুলোকে চিনে ফেলে তাহলেই মুশকিল। বাবা বললেন, রাত থাকতে থাকতেই যতটা এগিয়ে যাওয়া যায় ততই ভালো। সেইমতো ফের চলা শুরু হল আমাদের। ভোর ভোর একটা গ্রামের কাছে পৌঁছে তার বাইরে একটা কুয়োর কাছে আওরা থামলাম। গ্রাম থেকে খানিক গুড় জুটিয়ে এনে শিকারশেষের টুপুনি ব্রত পালন করে নেয়া হল। তারপর আমি আমার রুমালটা খুলে তার ভেতরের রুপোর টাকাটার সঙ্গে আরো কিছু টাকা মিলিয়ে রূপ সিং-এর পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করলাম। এইবারে আমি পুরোপুরি একজন ভুক্তোট (হত্যাকারী) হয়েছি। তারপর লুটের মাল ভাগাভাগি হল। সাহুকারের থেকে পাওয়া সাড়ে তিন হাজার টাকা আর অন্যান্য জিনিস সমান ভাগ হবার পর সাহুকারের দামি বেনারসী আর পাথরগুলোর দায়িত্ব নিলেন বাবা। সেগুলো হায়দরাবাদে ভালো দামে বিক্রি করে তার টাকা তিনি পরে সকলের মধ্যে ভাগ করে দেবেন।

ছবিঃ মৌসুমী

ছড়াছড়ি

মহাশ্বেতা

বইটা হাতে পেতেই মন ভালো হয়ে গেল। টকটকে লাল মলাট, তাতে রঙ-বেরঙের অক্ষরে লেখা বইয়ের নাম, ‘‘ছড়াছড়ি’’ আর চারপাশে রঙিন সব ছবি। হাতে পাওয়া মাত্রই পড়ে ফেললাম লোভ সামলাতে না পেরে। আর পড়ে যা মনে হল সেটাই বলি তোমাদের।

ছড়াছড়ি ছড়ার বই। আর মজার ব্যাপার হল এই যে ছড়াছড়ি তাদের প্রতিটি উৎসর্গ করা হয়েছে যারা ছড়া ও ছবি ভালবাসে না তাদের (সত্যি?)। কিন্তু আমার মতন যারা ছড়া ও ছবি

ভীষণ ভালবাসে তাদেরও ছড়াছড়িকে অতি উপাদেয় ঠেকবে। বেড়াল, ইঁদুর, ভূত-প্রেত, ঠাকুমা, কাকতাড়ুয়া, মাকড়শা, বেলুন, টিফিন ইত্যাদি ছাড়াও ব্যালেন্স ও হাত বনবনিয়ে ঘোরানোর মতন বিচিত্র সব বিষয় নিয়েও ছড়া রয়েছে বইটাতে। আর প্রত্যেকটা ছড়ার সাথে রয়েছে একটা-দুটো করে ছবি, কিছু রঙিন, কিছু সাদা কালো কিন্তু প্রত্যেকটাই বেশ আনন্দদায়ক। আমার নিজের প্রিয় ছড়া অবশ্য ‘‘আছাড়ের ছড়া’’ । কোথায়, কিভাবে, কখন, কটা আছাড় খাওয়া যায় তাই নিয়ে একটা বড়সড়ো ছড়া এটা। ছবির মধ্যে আমার ‘‘ব্যালেন্সের ছড়া’’, ‘‘টয়ট্রেন’’ আর’’রাতদুপুর’’-এর ছবি বেশ ভালো লেগেছে।

ছড়াছড়ির মূল লেখক ও আঁকিয়ে রঙ্গিত ও রুচিরা (আর তাদের বাবা মা) । সবমিলিয়ে ছড়াছড়ি বেশ জমজমাট একটা ছড়ার বই। যারা ছড়াটড়া বিশেষ পড়ে না, তাদেরও এটা ভাল লাগবে। পুজোর মরশুমে ঢাকঢোলের শব্দের মধ্যে এইরকম একটা ফুরফুরে বই পড়ার মজাই আলাদা। বইটা জোগাড় করে নিও আর পড়ে জয়ঢাককে জানিও কেমন লাগল। এবার পুজোয় অনেক আনন্দ কোর!

বইয়ের নামঃ ছড়াছড়ি , দামঃ ১৫০ টাকা, , প্রকাশনঃ রুচিরঙ্গ, পাওয়া যাবেঃ দে’জ, পাতিরাম ও দে বুক স্টোর্স

আম্ব্রা মিনিগা ও এমু পাখির গল্প

মহাশ্বেতা

কোপি গ্রামের থেকে অনেক দূরে, ঘন জঙ্গলে ঢাকা একটা জায়গায় ছিল আম্ব্রা নামের একটা উঁচু পাহাড়। সে একা একাই জঙ্গলের মধ্যে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। খুব ভোরে মেঘেরা তার চুড়াটাকে আংটির মত ঘিরে থাকত। তারপর বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেত। এই আম্ব্রা পাহাড় আর তার চারপাশের জঙ্গল ছিল দেশের সবচেয়ে শান্ত এলাকা। এখানে মানুষ ঢুকত না, সেরকম জন্তুজানোয়ারও ছিল না বিশেষ। ছিল শুধু হাজার হাজার পাখি। তারা আম্ব্রা পাহাড়ের নিস্তব্ধতায় শান্তিতে নিজেদের মত দিন কাটাত।

আম্ব্রা পাহাড়ের একদম মাথায় থাকত আম্ব্রা মিনিগা বলে একটা পাখি। বেশ গোলগাল, লালটু চেহারা ছিল তার। তার গায়ের রং ছিল টকটকে লাল, ঠিক যেন একটা মাকাল ফল। তার স্বভাবও ছিল খুব ভাল। সারাক্ষণ হৈ হুল্লোড় আর আনন্দ করে বেড়াত সে। তাই বনের সব পাখির প্রিয় বন্ধুও ছিল এই আম্ব্রা মিনিগা। তাদের সবার বাসায় ছিল তার অবাধ আনাগোনা। কিন্তু সারাদিন এর ওর বাসায় কাটিয়ে মিনিগা নিজের বাসাটার একটুও যত্ন করবার, সময়মত মেরামত করবার সময়ই পেত না। তাই তার বাসাটা ছিল ভীষণ অগোছালো আর এলোমেলো।

কদিন ধরে মিনিগা যেন তার ভাঙাচোরা বাসাতে আর তিষ্ঠোতে পারছিল না। অবশেষে একদিন সে ঠিক করল যে সে এই বাসাটাকে ছেড়ে সে একটা নতুন বাসায় উঠবে। অন্য সব পাখিরা তার বাসা বানাতে সাহায্য করবে বলে এক পায়ে খাড়া হয়ে গেল। কিন্তু বাসা বানাবার সরঞ্জাম মিনিগা নিজেই খুঁজতে বেড়োল।

সেটা ছিল একটা গ্রীষ্মের প্যাচপেঁচে দিন। মিনিগা ঠিক করল যে সে প্রথমে বাসা বাঁধবার জন্য ভাল লতাপাতা খুঁজে বার করবে, তারপরে অন্য জিনিস। লতার খোঁজে এ গাছ ও গাছ করতে লাগল সে, কিন্তু পছন্দসই লতা আর পায় না। তারপর খুঁজতে খুঁজতে কখন যে একেবারে ঘন জঙ্গলে পৌঁছে গেল তা বুঝতেই পারল না। তারপর চারপাশে অন্ধকার দেখে যেই মুখ তুলেছে, সেই দেখে যে সে আর তার পরিচিত জঙ্গলে নেই। সে পৌঁছে গেছে একেবারে ঘন জঙ্গলে যেখানে পাখিরা বিশেষ ঢোকে না। কিন্তু চারিদিকে তাকিয়ে দেখে মিনিগার চোখ ট্যারা হয়ে গেল। সে জীবনে কখনও এত লতা একসাথে দেখেনি। এরকম মজবুত পাতা, কাঠিও

কখনো দেখেনি সে। সে চোখ বড় বড় করে অবাক হয়ে চারপাশে দেখতে লাগল আর আস্তে আস্তে চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল।

দূর থেকে একটা খট খট আওয়াজ আসছিল। কিন্তু মিনিগার তখন আর কিছুতে হুঁশ নেই, তাই সে কিছুই শুনতে পেল না। আওয়াজটা করছিল এমু পাখি। সে উড়তে পারে না, তাই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চটাশ চটাশ করে পা ফেলে ফেলে আসছিল, আর আসতে আসতে ঝোপের থেকে লাল লাল টোপা টোপা জঙ্গুলে ফল তুলে তুলে গপাৎ গপাৎ করে গিলছিল সে। একটা ঝোপের ফল খাওয়া শেষ হলে ঠোঁট চাটতে চাটতে পরের ঝোপটার দিকে গলা বাড়িয়ে দিচ্ছিল সে। পাখি বেশি আসে না বলে এই জঙ্গলে ঝোপে ঝোপে ফল ফলে থাকে। সেদিন লোভি এমু তার খোঁজ পেয়ে পেট পুজো করতে চলে এসেছিল এই জঙ্গলে।

এইরকমই একটা ঝোপের মধ্যে বসে একমনে চিন্তা করছিল আম্ব্রা মিনিগা। তার মাথায় তখন বাসার চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নেই। এমু যে আসছে, তা সে না দেখতে পেয়েছে, না শুনতে পেয়েছে তার পায়ের চটাশ চটাশ আওয়াজ। এমু কিন্তু মিনিগাকে বেশ দেখতে পেয়েছে। ঝোপের মধ্যে লাল, গোল বড় জিনিসটাকে দেখেই সে নিজের ভাগ্যকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়েছে। কে জানত যে একদিন এধরণের একটা জঙ্গুলে জায়গায় এসে এত বড় একটা ফলের হদিশ পাওয়া যাবে! এত বড় লাল ফল সে জীবনে দেখেনি। তাই আস্তে আস্তে সে মিনিগার ঝোপের কাছে এসে তার লম্বা গলাটা বাড়িয়ে গপাৎ করে ছোট্ট আম্ব্রা মিনিগাকে ফেলেছে গিলে। খেতে অবশ্য কেমন যেন পালক পালক। “পাকেনি মনে হয় ভাল করে,” এই মনে করে এমু বাকি ঝোপগুলোর দিকে তার গলা বাড়াল।

তারপর কয়েক ঘন্টা সে সারা জঙ্গল খাবারের সন্ধানে টই টই করে ঘুরে বেড়াল। আর যেখানে যা পেল তাই গপাত গপাত করে গিলল। তারপর শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে গিয়ে একটা গাছতলায় ঠেস দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগল। ঘুমোতে ঘুমোতে তার লম্বা ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গেল একটু একটু করে। আর তার মুখের গহ্বরের মধ্যে থেকে দু’খানা খুব রাগী চোখ দেখা দিল। তার কিছুক্ষণ পরেই এমুর মুখ থেকে বেড়িয়ে এল ফল মাখা, ভেজা, ক্লান্ত আম্ব্রা মিনিগা। এমুর পেটের মধ্যে একগাদা আবর্জনার সঙ্গে ঝাঁকুনি খেতে খেতে জঙ্গলময় ঘুরে বেড়ানোটা তার পোষায়নি একদমই। তাই রাগে ফুঁসছিল সে। এমুর মুখ থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ মাটিতে বসে হাঁপিয়ে নিয়ে পাশের একটা ছোট্ট নদীতে গা হাত পা ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে নিল।

“বুদ্ধির বলিহারি যাই। আমাকে ফল ভেবে খেয়ে নেওয়া! মামাবাড়ি নাকি? দেখে নেব। আ-হা-হা রে গায়ে কি বেদনা!” এই বলে গায়ে একটু হাত বুলিয়ে নিয়ে সে রেগেমেগে ভাবল,

“একে আর আমার গৃহপ্রবেশে ডাকছি না। আমাকে খেয়ে নেওয়া! পাখি আর ফলের তফাৎও বোঝে না।” তারপর কোনরকমে আম্ব্রা পাহাড়ের মাথায় তার বাসায় ফিরে গেল।

এদিকে বনের সব পাখিই তো মিনিগার বাসা বাঁধবার জন্য পাহাড়ের মাথায় জড়ো হয়ে ছিল। সে এসে পৌঁছোতেই তার অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা শুনতে সবাই তাকে ঘিরে ধরল। গল্প শেষ হলে লোভি এমুকে নিয়ে একচোট হাসাহাসি হয়ে গেল। তারপর পাখিরা সবাই বাসা বাঁধবার কাজে লেগে গেল। পুরোনো পচে ওঠা লতা-পাতা-কাঠি খুলে নিয়ে পাখিরা সেগুলোকে ফেলে দিয়ে তার জায়গায় নতুন লতা-পাতা-কাঠি লাগিয়ে নিল। তারপর বাবুই পাখি সেগুলোকে বেশ শক্ত করে বেঁধে দিল। আর কিছু ছোটখাটো ঘষা-মাজার পর আম্ব্রা মিনিগার নতুন বাসা তৈরি হয়ে গেল। আর সে বাসা এত সুন্দর হল যে দেখে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল। আম্ব্রা মিনিগা বাসার গর্বে বুক ফুলিয়ে বাসার চারধারে উড়তে লাগল। এমুর ওপরে রেগে থাকতেও ভুলে গেল কিছুক্ষণের জন্য। কয়েকদিনের মধ্যে এলাকার সব পাখিকে সে তার গৃহপ্রবেশে নেমন্তন্ন করে ফেলল। সব পাখি মানে অবশ্য এমুকে বাদ দিয়ে সব পাখি।

গৃহপ্রবেশের খবরটা দাবানলের মতন জঙ্গল জুড়ে ছড়িয়ে গেল। নির্দিষ্ট দিনে সকাল সকালই সব অতিথিরা চলে আসতে লাগল আম্ব্রা মিনিগার নতুন বাসায়। প্রথমে এল টিয়া পাখির একটা বড় দল। তারা ছিল যেরকম আড্ডাবাজ, তেমনি ঝগড়ুটে। তারা আসা মাত্রই ক্যাঁচর ম্যাঁচর করতে করতে কোণে রাখা ফল-বাদামের স্তুপের ওপর হামলে পড়ল। তার ঠিক পরেই এল একজোড়া সাদা কাকাতুয়া পাখি। তারা গাছের ডালে বসে টিয়াদের সাথে গল্পগুজব করতে লাগল। তারপর হঠাৎ করেই আকাশ থেকে নেমে এল শিস দিতে থাকা হলুদ পাখি। লাফাতে লাফাতে মিনিগার কাছে এসে তার নতুন বাসার প্রশংসা করতে লাগল, “উ-ই-ই-ই কি সুন্দর বাড়ি-ই-ই-ই!” তারপর মনের সুখে ঝোপঝাড় থেকে খুঁটে খুঁটে পোকা খেতে লাগল। তারপর এল মধুখেকো লাল কালো জামা পরা মধু-পাখি। আম্ব্রা মিনিগা তার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে নিয়ে তাকে কিছু দূরে রাখা একটা ফুলে ঢাকা পচা গাছের গুঁড়ি দেখিয়ে দিয়ে বলল, “যাও ভাই। ওই ফুলগুলোর মধু চেখে দেখো। সারা জঙ্গলে এর থেকে সুস্বাদু মধু তুমি আর কোথাও পাবে না। মনের সুখে মধু খাও।” সে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে চলে গিয়ে মধু খেতে লাগল।

আস্তে আস্তে বেলা বাড়তে লাগল, আর মিনিগার গৃহপ্রবেশে বাড়তে লাগল অতিথির সংখ্যা। ক্রমে আম্ব্রা পাহাড় ভরে উঠল পাখিদের চিৎকার চ্যাঁচামেচি – হাসি ঠাট্টা – গল্পগুজবের আওয়াজে। দূর দূরান্ত থেকে অনেক পাখি উড়ে এল পুরোন বন্ধুদের সাথে দেখা করতে আর সেই উপলক্ষে অনেক নতুন বন্ধুও বানিয়ে নিল মিনিগার গৃহপ্রবেশে। মাছি-ধরা পাখির আকাশে একটার পর একটা ডিগবাজি দেখে পাখিরা যেমনি খুশি হল, গাইয়ে পাখির গান শুনে ঠিক

তেমনি মুগ্ধ হল। বাগান-পাখি মিনিগার জন্য একটা সুন্দর উপহারও আনল, মিনিগার বাসা সাজাতে তারই গায়ের মত লাল কিছু ঝিনুক আর নুড়ির একটা ছোটখাট সংগ্রহ।

হঠাৎ পাহাড়-চুড়ার উপরে একটা ছায়া পড়ল। সব পাখিরা ঘাবড়ে গিয়ে আকাশের দিকে তাকাতেই দেখে পাখিদের রাজা ঈগল তাদের মাথার ওপরে উড়ছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি আস্তে আস্তে রাজকীয় ভাবে নীচের দিকে নামতে লাগলেন। পাখিরা সরে গিয়ে তাঁর দাঁড়াবার জায়গা করে দিল। রাজাকে দেখে ছোট পাখিরা ভয় পেয়ে এদিক ওদিক লুকিয়ে পড়ল। ঈগল নেমে এসে ডানা ভাঁজ করে নিয়ে কিছুক্ষণ চারপাশে সব পাখিদের দেখে নিল। তার বড় বড় কমলা চোখ দেখে পাখিদের বুক কেঁপে উঠল। কিন্তু আম্ব্রা মিনিগা রাজাকে অভ্যর্থনা করতে একাই এগিয়ে গেল। তারপর একটা লম্বা নমস্কার করে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল তাঁর জন্য রাখা বিশেষ ভোজের কাছে। মিনিগা রাজার এই বদস্বভাবের কথা জানত। রাজা যে এরকম হঠাৎ করে যেখানে সেখানে হাজির হন, তারপর গৃহস্বামীদের তাঁকে ঠিক ভাবে আপ্যায়ণ করতে খাবি খেতে হয় এই কথা জেনেই সে আগের দিন পাহাড়ের গা বেয়ে টেনে টেনে একটা মড়া ইঁদুর এনে রেখেছিল। তার আশঙ্কাই সত্যি হল কিন্তু তার মনে একটা সংশয় রয়ে গেল, রাজার কি এত ছোটখাটো উপহার পছন্দ হবে? কিন্তু তার সব ভয় মিথ্যে করে দিয়ে রাজা যখন খুব তৃপ্তির সঙ্গে মড়া ইঁদুরটা খেয়ে নিয়ে ঝটপট সেখান থেকে চলে গেলেন, তখন তার আনন্দের সীমা থাকল না। অন্য পাখিরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

রাজা চলে যাওয়ামাত্রই পাতার আড়াল থেকে বেড়িয়ে এল গৃহপ্রবেশের শেষ অতিথি, স্বর্গের পাখি। তার মত সুন্দর পাখি অনুষ্ঠানে আর একটাও ছিল না। তার সারা গায়ে বিচিত্র রঙের অপূর্ব সব পালক। তার উড়ে উড়ে নাচ দেখে পাখিরা সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল। আম্ব্রা মিনিগা তাকে ডেকে বলল, "এসো স্বর্গের পাখি, এসো। তোমার জন্যই তো অপেক্ষা করছিলাম আমরা। এস, খেতে বস।"

তারপর বেশ কিছুক্ষণ ধরে মিনিগার ভোজসভা চলল। স্তুপাকার ফল-মূল-বাদাম সবাই খেতে লাগল, আড্ডাও চলতে লাগল তার সঙ্গে সঙ্গে। সবশেষে পাখিরা সবাই মিলে একযোগে মিনিগাকে তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে বলল। মিনিগা প্রথমে লজ্জা পেল, বলল, "আমার দ্বারা এসব বক্তৃতা-টক্তৃতা হবে না ভাই।" কিন্তু পাখিরা তো তা শোনবার পাত্র নয়! অতএব মিনিগা উড়ে গিয়ে একটা উঁচু ডালে বসে উঁচু গলায় বলতে লাগল, "বন্ধুগণ, তোমাদের এতজনকে আজ আমার এই গৃহপ্রবেশে একসাথে দেখে আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে, তা আমি বলে বোঝাতে

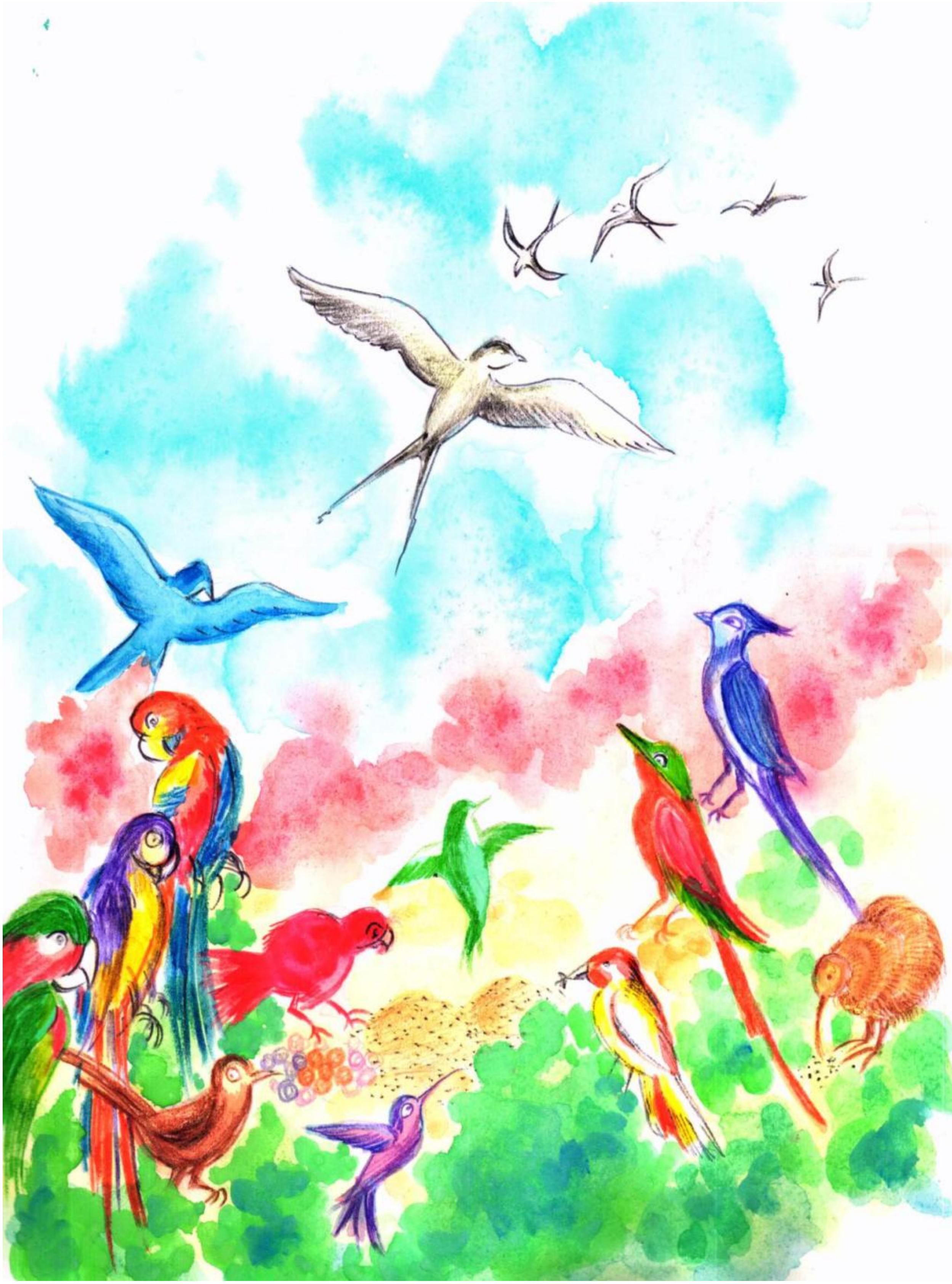

পারব না। অনেক কাল আমাদের এত বড় কোন জমায়েৎ হয়নি। জিমি নদীতে যেবার বন্যা হল সেইবার পাখিদের মন ভাল করতে টিয়াদের সেই অনুষ্ঠানই ছিল আমাদের শেষ বড় অনুষ্ঠান। তারপরে আর সেরকম কিছু হয়নি--"

টিয়ারা নিজেদের প্রশংসা শুনে খুশি হয়ে আরও চ্যাঁচামেচি করতে লাগল। অন্য পাখিরাও তাদের দেখাদেখি চিৎকার আরম্ভ করল। কেউ খেয়াল করল না যে ভিড়ের আড়ালে পাতার মধ্যে একটা ফলের থোকার দিকে তাকিয়ে থাকা দু'খানা লোভি চোখ, একটা লম্বা গলা আর একটা ভারী শরীর নিয়ে কখন একজন এসে হাজির হয়েছে। এমু পাখি এত নিঃশব্দে সেখানে এসেছিল যে দেখা তো দূরস্থান, আরেকটা পাখি যে হাজির হয়েছে সেটা জানতে পর্যন্ত পারেনি কেউ। মিনিগা তখনও বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছিল, "আমার বাসা বানাতে সাহায্য করার জন্য আমি সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। বাবুই এত ভাল ভাবে আমার বাসাটা বেঁধে দিয়েছে যে আমি তার কাছে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। এখন এই বাসাতে আমি যে খুব আরামে থাকব তার ব্যবস্থা তোমরা সবাই দয়া করে করে দিয়েছো এটা যে কত ভাগ্যের ব্যাপা র তা শুধু আমিই জানি। বাগান পাখিকে তার ছোট্ট উপহারের জন্যও আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই..."

এমু এদিকে ফলগুলো খাওয়া শুরু করে দিয়েছিল। তার কচর কচর আওয়াজে মিনিগা তার উঁচু ডাল থেকে এমুকে দেখে ফেলল। দেখে মনে মনে ভীষণ রেগে উঠলেও মুখে কিছু বলল না, খালি গাছের একটা শক্তপোক্ত কাঠি ভেঙে নিয়ে সেটার সাথে খেলতে খেলতে সে বলে চলল, "কিন্তু আমরা একজনকে ভুলে যাচ্ছি। সে এমন একজন, যাকে আমার এই গৃহপ্রবেশে নেমন্তন্ন করা হয়নি। তিনি একজন খুব বিশিষ্ট পাখি, তার সুশ্রী চলন-বলন আর কম খাওয়ার অভ্যাস বিশ্ববিখ্যাত।" বলা মাত্রই সবাই বুঝে গেল মিনিগা কার কথা বলছে আর হাসিতে ফেটে পড়ল। হাসতে হাসতে কে একটা যেন বলে উঠল, "সে কোথায়? লম্বা গলা এমু? এখনও কি খেয়েই বেড়াচ্ছে?" তাই শুনে আবার একচোট হাসি হয়ে গেল। কিন্তু তার ঠিক পরেই মিনিগা হঠাৎ সরু গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "...কিন্তু সেই বিশিষ্ট পাখি আজ এখানে নিমন্ত্রিত না হওয়া সত্ত্বেও উপস্থিত।"

বলা মাত্রই সে হাতের সেই কাঠিটা মারল ছুঁড়ে কচর কচর করে ফল খেতে থাকা লোভি এমুর দিকে। এমু পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে খাচ্ছিল আর কাঠিটা গিয়ে দমাস করে পড়ল তার পিঠে, সে কোঁক করে একটা চিৎকার করে পিছন ফিরে তাকাল যখন তখন তাকে দেখে সবাই অট্টহাস্য শুরু করে দিল। সারা মুখে তার ফলের ছোপ, ঠোঁটটাও অতিরিক্ত ফল খাওয়ার ফলে হয়ে গেছিল চটচটে আর তখনও সেখান থেকে ঝুলছিল এক থোকা ফল। এত পাখিকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সে রূদ্ধশ্বাসে পাহাড়ের গা বেয়ে পালিয়ে গেল। পাখিদের হাসাহাসি

ছাপিয়ে মিনিগার চিৎকার শোনা গেল, “বিদায়, চ্যাঁটচ্যাঁটে ঠোঁট এমু মহাশয়! ভাল করে খেয়ে বেড়ান আর মোটা হন!”

তারপর বেশ কয়েকদিন লম্বা-গলা এমু পাখি তার বাসা ছেড়ে বিশেষ বেরোল-টেরোল না। তাকে দেখলেই পাখিরা সবাই চিৎকার করতে থাকত “চ্যাটচেঁটে ঠোঁট! চ্যাটচেঁটে ঠোঁট”। এতকাল পরেও তাদের সে অভ্যেস যায়নি। তারা এখনো এমুকে দেখলে ঠাট্টা করে তাকে “চ্যাঁটচ্যাঁটে ঠোঁট” বলে ডাকে।

পাপুয়া নিউ গিনির লোককথা।

উৎসঃ *ক্রিস্টোফার সমারভিল-এর ‘সাউথ সি স্টোরিজ’*

ছবিঃ মৌসুমী

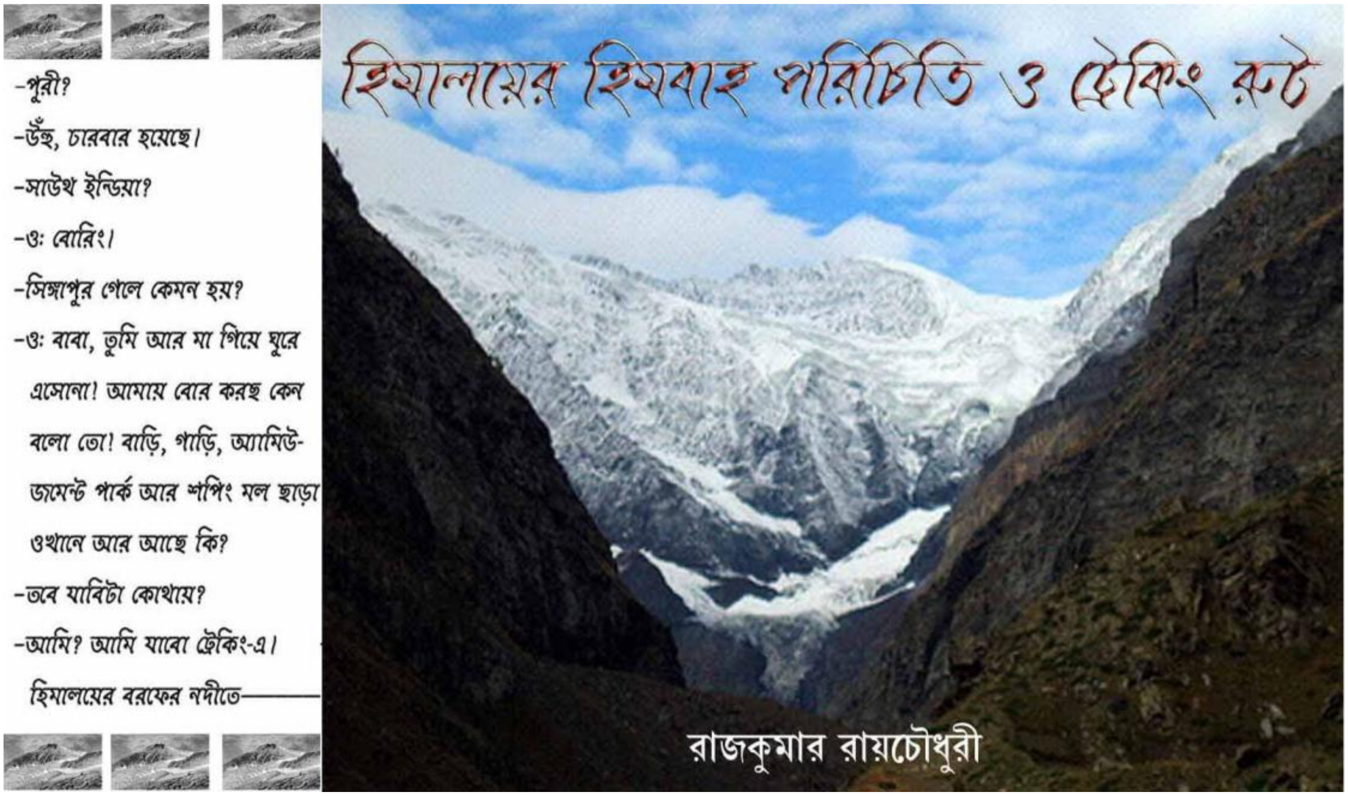

হিমাচল ও পীরপঞ্জালের হিমবাহ

হিমাচলের হিমবাহগুলি গাড়োয়ালের হিমবাহগুলির মত অত বিস্তৃত নয়। এদের অবস্থান সাধারণত: ৪২০০ মি থেকে ৩৬০০ মি অবধি। সব চেয়ে বড় হিমবাহ হল বড়া শিগরি। অবশ্য কোন কোন মতে সোনাপানি এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় হিমবাহ। তবে হিমাচলের একটি বৈশিষ্ট্য হল এর অসাধারণ ট্রেকিং রুট। এই সব রাস্তায় সাধারনত: তীর্থযাত্রী রা যান না বলে সর্বত্র দোকান বা হোটেল পাবেন না কিন্তু যদি তাঁবু আর স্লিপিং ব্যাগ থাকে তবে হিমাচলে ট্রেকিং জীবনের একটি উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে থাকবে।

বড়া শিগরী (Bara Shigri) হিমবাহ:-

হিমাচলী ভাষায় শিগরী অর্থ হিমবাহ। বড়া শিগরী লাহুল উপত্যকার সব চেয়ে বড় হিমবাহ। এটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ২৮ কিমি আর প্রস্থে ৩ কিমি। (এর আয়তন নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কোন কোন মতে এর দৈর্ঘ্য ৫৫ কিমি। এখানে যা আয়তন দেওয়া হল তা আক্ষরিক অর্থেই আনুমানিক)। ১৮৬০ - ৬৩ সালে এটি একটি হ্রদ সৃষ্টি করেছিল

চন্দ্র নদীর উপর। এটি নেমে এসেছে চন্দ্র উপত্যকায়। এটির স্নাউট ৪,০৮০ মি উচ্চে। তবে এর নীচের দিকে এত বোল্ডার এবং নুড়ি পাথর (debris) যে অনেক দূর অবধি বরফ দেখা যায় না।

ট্রেকিং রুট - বেস ক্যাম্প : মানালী

	উচ্চতা (মি)	দূরত্ব (কিমি)	রাস্তা
মানালী (১৮২৯ মি) - চিকা	(২৯৬০ মি)	১৩ কিমি	হাঁটা
চিকা - ছত্রু	৩৩৬০ মি	১৬ কিমি	হাঁটা
ছত্রু - ছোটধারা	৩৭৪০ মি	১৬ কিমি	হাঁটা
ছোটধারা - বাতাল (Batal)	৩৯৬০ মি	১৬ কিমি	হাঁটা
বাতাল - চন্দ্রতাল	৪২৭০ মি	১৬ কিমি	হাঁটা

দিল্লী থেকে সিমলা হয়ে মানালী আসুন। প্রথম দিন ক্যাম্প করুন চিকাতে, হামতা নালার ধারে। চিকা থেকে ছত্রু যেতে গেলে হামতা গিরিপথ (৪৪২০ মি) অতিক্রম করতে হবে।

দেওটিব্বা ও ইন্দ্রসেনের অপূর্ব দৃশ্য মনে গেঁথে থাকবে। ছত্রুতে রাত কাটান। পরদিন ছত্রু থেকে বাতাল পৌঁছন। ছ ঘন্টার হাঁটার পথে বাতাল। কুন জুম গিরিপথের পাদদেশে বাতালের অবস্থান। বাতাল থেকে কুনজুম গিরিপথ (৪৫৯০ মি) অতিক্রম করার সময় দেখুন বড়া শিগরি হিমবাহের অবিস্মরণীয় দৃশ্য। কুনজুম গিরিপথ অতিক্রম করে পৌঁছল চন্দ্রতালে (৪২৭০ মি)। এই হ্রদ থেকে একটি ধারা চন্দ্রনদীতে পড়েছে। এখান থেকে আরো দুটি সুন্দর হিমবাহ দেখতে পাবেন। সমুদ্র তাপু ও মুলকিল্লা। (Samudra Tapu and Mullcilla) ফেরার পথে ছত্রু অবধি একই রুটে আসুন। এবার রোটাংপাস অতিক্রম করে লাহুলে চলে যেতে পারেন। ছত্রু থেকে গ্রামফু (Gramphoo) (৩২০০ মি) আসুন। ১৬ কিমি পথ, গ্রামফু রোটাং এর পাদদেশে অবস্থিত। এখান থেকে রোটাং পাস হয়ে মানালীর গাড়ী পেতে পারেন। অথবা হাঁটা পথে আসুন মাড়ী (Marrhi) (৩৩২০ মি) ১০ কিমি এর পথ। পরদিন মাড়ী থেকে মানালী পৌঁছন।

সোনাপানি হিমবাহঃ-

কোন কোন মতে এটিই লাহুল স্পিতি অঞ্চলের বৃহত্তম হিমবাহ। এটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫ কিমি এবং স্নাউটের উচ্চতা ৩৮৫৬ মি (১৯৫৭ সালের জরীপ অনুযায়ী)। রোটাং গিরিখাতের খুব কাছেই এটির অবস্থান।

ট্রেকিং রুট - বেস ক্যাম্প : মানালী

পূর্ব বর্ণিত পথে (বড়া শিগরি ট্রেকিং রুট দেখুন) ছত্রু পর্য্যন্ত আসুন। ছত্রু থেকে ১৬ কিমি হাঁটা পথে গ্রামফু আসুন। গ্রামফু থেকে মাড়ীর (Marrhi) পথে দেখুন সোনাপানি হিমবাহ। মাড়ী থেকে পরদিন হেঁটে মানালী পৌঁছন।

লাহুল স্পিতি অঞ্চলে হিমবাহের মধ্যে অন্যতম প্রধান হল চন্দ্র হিমবাহ ও ভাগা হিমবাহ। দুটিই প্রায় দৈর্ঘ্যে ২৫ কিমি। চন্দ্র হিমবাহ থেকে ভাগা নদীর উৎপত্তি।

মান্তালাই হিমবাহ (Mantalai Glacier)

মানতালাই হিমবাহ হিমাচল প্রদেশের পার্বতী উপত্যকায় অবস্থিত। ট্রেকিং রুটের শুরু মনিকরণ থেকে । যাঁরা কুলু মানালী গেছেন তাঁদের কাছে মনিকরণ একটি অতি পরিচিত নাম।

ট্রেকিং রুট - বেস ক্যাম্পঃ কাসোল

	উচ্চতা (মি)	দূরত্ব (কিমি)	রাস্তা
কাসোল (১৫৮৫ মি) - পুলগা	২৭৯১ মি	-	হাঁটা
পুলগা - ক্ষীরগঙ্গা	৩২৬০ মি	৮ কিমি	হাঁটা
ক্ষীরগঙ্গা - তুন্ডাভুজ	৩২৬০ মি	১২ কিমি	হাঁটা
তুন্ডাভুজ - বাকর বিহার যাচ্	৩৮১৫ মি	১২ কিমি	হাঁটা
বাকর বিহার - মানতালাই	৪০৭৪ মি	৫ কিমি	হাঁটা

মনিকরণ থেকে পুলগা ২০ কিমি পথ।

কুলু থেকে জিপে কাসোল পর্যন্ত আসুন। পুলগা থেকে চড়াই এর পথ। পুলগায় রেস্ট হাউস আছে। ক্ষীরগঙ্গায় উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। জল ঔষধি সম্পন্ন। প্রস্রবণের কাছেই তাঁবু খাটান যেতে পারে। তৃতীয় দিন তাঁবু পাতুন তুন্ডা ভুজে। তারপরের দিন বিশ্রাম নিন বাকর বিহার যাচে। কুলু আইগারের নীচে তাঁবু পাতুন। বাকর বিহার থেকে উঠে আসুন গ্লেসিয়াল হ্রদের

ধারে।

যাঁরা পিনপার্বতী গিরিপথ যেতে চান তাঁরা হিমবাহ অতিক্রম করে পিন্‌পার্বতী গিরিপথ (৪৮০০ মি) যেতে পারেন। গিরিপথ অতিক্রম করে ঘুর গুরুতে (৪১০০ মি) পৌঁছন। পরের দিন মুধ (৩৯০০ মি), তার পরের দিন গুলিং পৌঁছন। ব্যস, আপনি এখন সড়ক পথে পৌঁছে গেছেন। এখান থেকে সময় ও সামর্থ থাকলে জীপে করে লাদাকের প্রধান শহর লে (Leh) চলে যেতে পারেন।

বাপসা হিমবাহঃ-

বাপসা হিমবাহ বাপসা সাংলা উপত্যকায় অবস্থিত। সম্প্রতি এই উপত্যকাটি ট্রেকার্স এবং ট্যুরিস্ট উভয়েই কাছেই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বাপসা নদীর অববাহিকা অঞ্চলে ছোটবড় অনেক হিমবাহ আছে। আছে একাধিক গিরিপথ যা অতিক্রম করে গাড়োয়াল থেকে হিমাচলে যাওয়া যায়। হিমাচল থেকে বাপসা যেতে গেলে কল্পা হয়ে আসতে হবে। সিমলা থেকে ছিট্‌কুল (৩৪৫০ মি) ২৯০ কিমি দূর জিপে করে আসা যায়। ছিট্‌কুল থেকে রানিকান্ডা, দুনথি ও নিথাল হয়ে চার পাঁচ দিনে বাপ্‌সা পৌঁছন যায়।
আবার গাড়োয়ালের গঙ্গোত্রীর পথের অন্যতম পাহাড়ী শহর হরশিল থেকে গাংগলী, কেয়ারকুটি হয়ে ও বাপসা হিমবাহে পৌঁছন যায়। তিব্বত ও ভারত সীমান্তে এই হিমবাহের অবস্থান পথ বেশ দূর্গম। সঙ্গে পর্বতাভিযানের সমস্ত সরঞ্জাম [illegible] পথের বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন **'জিলেন্দ্রী উৎস পথে বাসপা হিমবাহ '** তপন পন্ডিত **(যারা যাযাবর**) বইমেলা সংখ্যা ডিসেম্বর ২০০১ (2nd issue)

ছবিঃ সংগৃহীত

ত্রিস্তান ডি কুনহা দ্বীপমালা

উমা ভট্টাচার্য

ত্রিস্তান ডি কুনহা দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের দূরতম অঞ্চলের এক আগ্নেয় দ্বীপমালা। প্রধান দ্বীপ ত্রিস্তান ডি কুনহা প্রায় দু লক্ষ বছরের পুরনো, ইনেক্সেসেবল দ্বীপটিও ২ থেকে ৩ লক্ষ বছরের পুরনো,নাইটিঙ্গল দ্বীপটি প্রায় ১৮ লক্ষ বছরের পুরনো, আর আছে গফ দ্বীপ । এই চারটি দ্বীপ নিয়েই ত্রিস্তান ডি কুনহা দ্বীপপুঞ্জের আয়তন প্রায় ৮০ বর্গমাইল।

দেশের নাম এর আবিষ্কারকের নামে রাখা। ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দে এক বিরাট নৌবহর নিয়ে পর্তুগীজ আডমিরাল আলফান্সো ডি আলবুকার্ক "সেক্রোটা" দ্বীপ অভিযানে চলেছিলেন। মোজাম্বিক পার হবার পরই তাঁরা এক প্রবল সামুদ্রিক ঝড়ে পড়েন। সেই নৌবহরের একজন কমান্ডার ছিলেন আলবুকার্কেরই এক জ্ঞাতি ভাই ত্রিস্তাও ডি কুনহা। তাঁর জাহাজটি ঝড়ে মূল নৌবহর থেকে ছিটকে দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে বহুদূর চলে যায়। কূল দেখা যায়না এমন এক অথই সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে পড়েন তিনি । কিছুকাল পরে বহুদূরে খুব ছোট্ট বিন্দুর মত

ডাঙার দেখা পেয়ে সেইদিক লক্ষ্য করে জাহাজ চালাতে শুরু করেন তাঁরা। দক্ষিণদিকে বহুদূর চলার পর সেখানে পোঁছে তিনি দেখেন সেটা একটা নয় চার চারটে ছোট ছোট দ্বীপের একটা দ্বীপপুঞ্জ। একটা আয়তনে বড় আর বাকিগুলো ছোট ছোট, একটু দূরে দূরে অবস্থিত। তবে কোনটিতেই মানুষজন আছে বলে মনে হয়না তাঁর।

তিনি জাহাজ নিয়ে বড় দ্বীপটার চারদিকে কয়েকবার ঘুরলেন কিন্তু নোঙর করার মত জায়গা পেলেননা ,কারণ এর চারধার এবড়োখেবড়ো ও খাড়া, তাছাড়া দ্বীপের একেবারে কাছের চারপাশের সমুদ্রের জল বিক্ষুব্ধ; উথালপাথাল ঢেউ জাহাজ ভেড়াতে দিচ্ছেনা। ফিরে আসার আগে ত্রিস্তাও, নিজের নামেই বড় দ্বীপটির নাম রাখলেন ইলহা দে ত্রিস্তাও ডি কুনহা, বা ত্রিস্তাও ডি কুনহার দ্বীপ। তারপর থেকে দ্বীপটি সভ্য জগতের নজরে এল। ১৫০৯ সালে দ্বীপটির কথা নটিকাল ম্যাপে স্থান পেল, আর পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান পেল মারক্যাটরের আঁকা ম্যাপে ১৫৪১ সালে। ১৬৪৩ সালে ডাচ জাহাজ হিমস্তেড নিয়ে দ্বীপের মাটিতে প্রথম পা রাখলেন ক্লাএস জেরিজ বিরেনব্রুডস্পট।

নির্জন সমুদ্রে ত্রিস্তান-মহাকাশ থেকে

ত্রিস্তান ডি কুনহা আবিষ্কারের পর থেকে বহু দেশের বহু নাবিক এখানে এসেছে, কিন্তু এখানে থাকার কথা ভাবতে পারেনি এর প্রতিকুল পরিবেশের জন্য । তবে বিচিত্র ভাবনাচিন্তার মানুষের তো অভাব নেই পৃথিবীতে। আমেরিকান তিমি শিকারীরা দ্বীপের কাছাকাছি সমুদ্রে অহরহ যাতায়াত করত। এক ইংরেজ বণিক এবং তার নাবিকেরা ১৭৯০ থেকে১৭৯১সালের মধ্যে ৯মাস এখানে থেকে প্রায় ৩৬০০ সিল ধরে ফিরে যায়। এরপর ১৮১০ খ্রিষ্টাব্দে এলেন জোনাথন ল্যামবার্ট নামে এক তিমি শিকারী আমেরিকান জাহাজি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন উইলিমস আর টমাস কুরি। তাঁরা এখানে বাস করতে লাগলেন। ল্যামবার্ট নিজেকে এখানকার মালিক ঘোষণা করলেন ও দ্বীপের নাম পালটে রাখলেন “আইল্যান্ডস অফ রিফ্রেশমেন্ট”। ১৮১২ সালে মাছ ধরার সময় তিনি ডুবে মারা যান। বাকিরা কিছুদিন সেখানে ছিলেন। তাঁরা সব্জি, গম, ওটস এসব চাষ করতেন আর মাংসের প্রয়োজনে শুয়োরের চাষ করতেন। ১৮১৬ সালে ইংরেজরা

এসে দ্বীপমালার দখল নেয় ও একটি ছোট সেনাঘাঁটি বানায়। উদ্দেশ্য ছিল, কাছাকাছি সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত নেপোলিয়নকে উদ্ধার করবার কোন চক্রান্ত যাতে না হতে পারে সেদিকে নজর রাখা।এরপর ধীরে ধীরে এখানে বসতি গড়ে ওঠে। প্রথম যে সাহসী মানুষটি এখানে সপরিবারে বাস করবেন ঠিক করলেন তিনি হলেন স্কটিস উইলিয়াম গ্লাস । এখানে যে সেনা মোতায়ন করেছিল, উইলিয়াম ছিলেন সেই সেনাবাহিনীর একজন কর্পোরাল। তিনি তাঁর স্ত্রী,দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে সেখানে রয়ে গেলেন হাজারো প্রতিকূলতাকে সঙ্গী করে। ঘরবাড়ি গড়বার জন্য সঙ্গে রইল কেবল দুজন পাথর মিস্তিরি। তাদের দিয়ে আস্তে আস্তে তৈরি হল থাকবার বাড়ি, উপাসনার চার্চ। এই খবরে উৎসাহিত এইবারে আরো মানুষ সেখানে আসতে লাগলো। তাদের বেশির ভাগ হলেন গভীর সমুদ্রে জাহাজডুবি বা জাহাজ দুর্ঘটনায় বেঁচে যাওয়া নিরূপায় যাত্রীরা আর নাবিকেরা। সাদরে গ্লাস তাদের থাকতে দিলেন। স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা বাড়াতে আরো ঘরবাড়ি তৈরি হতে লাগলো। তবে স্থায়ী বসতির এলাকাটার নাম তাঁরা দিলেন “সেটেলমেন্ট”,ও সেটির সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য “দি ফার্ম” নামে একটি প্রোজেক্ট তৈরি করা হল,আর এক চুক্তিতে ঠিক হল কিছু নিয়মকানুন ,যা বাসিন্দাদের সকলেই মেনে চলবেন।

একটি “কমিউনিটি” তৈরি হল,যেখানে বাসিন্দাদের সকলের সমান স্থান, সমান অধিকার। এক “কম্যুনাল লিভিং” চালু হল ,যাতে নির্বান্ধব দ্বীপে, প্রয়োজন হলেই যেখানে কোন জিনিস সহজে পাওয়া যায়না, সেখানে উৎপাদিত সামগ্রীতে ও পালিত পশুতে সবার সমান অধিকার বজায় থাকে। দ্বীপে মদের ব্যবহার চালু ছিলনা, আবাসিকরা সবাই ছিলেন নীতিপরায়ণ, পরিশ্রমী, সদ্ব্যবহারী, ধার্মিক ও অতিথিপরায়ণ। আলু, ওট এইসব চাষ করতো, গরু, ছাগল, ভেড়া

পুষতো,সমুদ্র থেকে সীলমাছ ধরে তার তেল ও চামড়া বিক্রি করতো বিদেশি বণিকদের কাছে। ১৯০৩ সাল পর্যন্ত সেখানে বিশেষ কোন অপরাধের খবর পাওয়া যায়নি।

১৮৫৩ সালে উইলিয়াম গ্লাস মারা গেলে ত্রিস্তানের জনসংখ্যা কমে যেতে শুরু করে।

১৮৬৯ সালে সুয়েজ খাল চালু হয়ে গেলে প্রাচ্যে আসাযাওয়ার সমুদ্র পথের দৈর্ঘ আরও কমে গেল। ফলে সুদূর আটলান্টিকের পেরিয়ে এইপথে যাতায়াত প্রায় বন্ধ হয়ে গেলে ত্রিস্তান বহির্জগতের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকি হয়ে পড়লো। অবশ্য প্রিন্স আলফ্রেডের দ্বীপদর্শনে আসার সময় থেকে আবার কিছু নতুন মানুষজন বাস করার জন্য আসতে থাকে। ১৮৮১সালে জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১১০ জনে। ২০০৯ সালের হিসাব অনুযায়ী জনসংখ্যা ছিল ২৭৫, আর ২০১০ এর হিসেব অনুযায়ী বর্তমান জনসংখ্যা ২৬৪ জন। মধ্যে, ১৯৬১ সালে একবার দ্বীপের প্রধান আগ্নেয়গিরিতে অগ্ন্যুৎপাত হয়ায় গোটা দেশের সমস্ত লোক পালিয়ে গিয়ে ইংল্যাণ্ডে ওঠেন। সাদাম্পটনের ট্রিস্টান ক্লোজ নামের এক রাস্তায় তাঁদের ঠাই মেলে। পরের বছর বিশেষজ্ঞরা গিয়ে সব দেখেশুনে সবুজ সংকেত দেবার পর আবার গোটা দেশের লোক নিজেদের দেশে ফিরে আসে।

ত্রিস্তান ডি কুনহা দ্বীপের রাষ্ট্রপ্রধান হলেন, ব্রিটেনের রানি এলিজাবেথ। দ্বীপে রানির হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন কাছাকাছি সেন্ট হেলেনা দ্বীপের গভর্নর। তাঁর একজন প্রতিনিধি দ্বীপের প্রশাসক হিসেবে কাজ চালান। দরকারে ১১ জন সদস্যের এক কাউন্সিলের সাথে আলোচনা করে বিভিন্ন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সাধারণ ভাবে সেন্ট হেলেনা দ্বীপের আইনই এখানে

প্রয়োগ হয়। দ্বীপের আইনকানুনের রক্ষক হিসেবে আছেন একজন পুলিস অফিসার ও ৩ জন কনস্টেবল। দ্বীপের নিজস্ব সংসদ আছে।

কিছু তথ্য

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ২৮২৬ কিমি পশ্চিমে। সবচেয়ে নিকটবর্তী লোকালয় হল ২৪৩০ কিমি দূরের সেন্ট হেলেনা দ্বীপ। ভেজা সামুদ্রিক জলবায়ু। বৃষ্টিপাত মাঝারি। সারা বছর সীমিত সূর্যকিরণ পাওয়া যায়। শীত ও গ্রীষ্মকালের তাপমাত্রার পার্থক্য ও দিন-রাতের তাপমাত্রার পার্থক্য খুবই সাধারণ। বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ৫৯ ডিগ্রি ফারেনহিট। দেশে একজন ডাক্তার ও পাঁচজন নার্স। আগে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মুদ্রার বদলে আলু ব্যবহার হত। এখন পাউণ্ড স্টার্লিং-এর চল হয়েছে। বর্তমানে দ্বীপবাসীর আয়ের প্রধান উৎস এখানকার গলদা চিংড়ি কারখানার উৎপাদন। সমুদ্রে মাছ ধরা, সীল মাছের তেল ও চামড়া বিক্রি থেকেও আয় হয়।

প্রাণীদের মধ্যে আছে সাবআন্টার্কটিক অঞ্চলের সামুদ্রিক ফার সীল, এলিফ্যান্ট সীল। সামুদ্রিক পাখিরাও এখানে ডিম পাড়তে আসে, যার মধ্যে কিছু পাখি আছে যারা শুধু মাত্র গফ আইল্যান্ডেই আসে ডিম পাড়তে। আছে নর্দান রকহপার পেঙ্গুইন, ম্যাকারনি পেঙ্গুইন,গফ আইল্যান্ড মুর হেন, ত্রিস্তান আলব্যাট্রস, ত্রিস্তান থ্রাশ, ত্রিস্তান বান্টিং, গফ বান্টিং, প্রভৃতি পাখি। এখানে কোনও নিজস্ব স্থানীয় সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী মিষ্টি জলের মাছ বা উভচর প্রাণীর অস্তিত্ব নেই। যেসব স্থলচর স্তন্যপায়ী প্রানী আছে,যেমন গরু, ছাগল, ভেড়া এসব গৃহপালিত পশু সেগুলি দ্বীপবাসীরা নিজেরা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল।

উইলিয়াম গ্লাসের তৈরি সাম্যের নীতি আজও সম্মানের সঙ্গে পালিত হয় এই দ্বীপদেশে। আজও এ দ্বীপের সমস্ত চাষযোগ্য জমি দ্বীপবাসীদের যৌথ সম্পত্তি। আজও, দ্বীপের চারণভূমিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যাতে ধনীরা আরো ধনী ও গরিব মানুষ আরো গরিব না হয়ে যেতে পারে।

শোরঘাঘাতিনি বেকি

উমা ভট্টাচার্য

ইনি শোরঘাঘাতিনি বেকি-। বিচিত্র নাম, তাই না? ইনি কে জান ? ইনি হলেন চীনে দীর্ঘস্থায়ী ইউনান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কুবলাই বা কুবিলাই খানের মা, দুর্ধর্ষ মোংগল নেতা চেঙ্গিস খানের ছোট ছেলে টোলুই-এর বউ। মোংগল বংশের এবং সেই ত্রয়োদশ শতাব্দীর একজন প্রভাবশালী,পরধর্মমতের প্রতি উদার ,সহিষ্ণু,দুরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ। তাঁর নাম আমরা স্কুলের ইতিহাসের বইএর পাতায় পাইনি ঠিকই , কিন্তু ইউরোপ ও আরব দুনিয়ার প্রায় সকল ইতিহাসবিদরাই তাকে সিল্ক রুট বাণিজ্যপথের সর্বকালের একজন শক্তিশালী , প্রভাবশালী মহিলা এবং মোংগল সাম্রাজ্যের এক শক্তিশালী স্তম্ভ বলে বর্ননা করেছেন।

সেইসময় মোংগলিয়ার মানুষদের কোন একজাতি পরিচয় ছিলোনা,তাদের মধ্যে অনেক ভাগাভাগি ছিল,যাদের মধ্যে কোন মিলমিশ ছিলনা। তাদের মধ্যে মাঝেমাঝেই জায়গা দখল,গবাদি পশু, কিংবা যাযাবর জীবনের সবচেয়ে দরকারী সম্পদ ঘোড়ার দখল নিয়ে অহরহ সংঘর্ষ লেগেই থাকত। চিঙ্গিস খান নেতা হয়ে ওঠার আগে ছিলেন মোঙ্গোলিয়ার যাযাবর উপজাতির বোরজিগিন গোষ্ঠীর এক নেতার ছেলে। নাম ছিল 'তেমুজিন'। তাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল কেরেইড-রা। বাবা মারা যাওয়ার পর তেমুজিন খুবই বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েন। তবে নিজের চেষ্টায় কেইরিড নেতা ওয়াং খান বা তোঘরুল খানের সঙ্গে ধর্মপিতা-পুত্রের সম্পর্ক পাতিয়ে তাঁর সহায়তা নিয়ে তিনি অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করেন ও ধীরে ধীরে ছোট

ছোট উপজতিগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে তাদের একটি জাতিতে পরিণত করেন। তারপর পুর্বে চীন থেকে পশ্চিমে আরব দুনিয়া পর্যন্ত অভিযান করেন,ও বিশাল মোংগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন ও নিজেকে গ্রেট খান বা সম্রাট বলে ঘোষণা করেন।

চিঙ্গিস খানের প্রধান রানির ছিল চার ছেলে। যোচি,চাগাডাই,ওগোডেই,আর সবচেয়ে ছোট ছেলে আদরের তো লুই। চেঙ্গিস খান মায়ের কাছ থেকেই শিখেছিলেন, সাম্রাজ্য শুধু বাড়ালেই হবেনা, তাকে টিঁকিয়ে রাখতে হবে,তার জন্য ধৈর্য ও সংঘবদ্ধতা দরকার, দল ও পরিবারের সকলের মধ্যে সহযোগিতা ও পারস্পরিক মান্যতাবোধ ও সম্মান বজায় রাখাই এর একমাত্র উপায়। তাঁকে ও পরিবারের অন্যদেরও এ কথা তাঁর মা হোগেলুন খান বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। আর শিখিয়েছিলেন পরিবারের মেয়েদের যথাযোগ্য মর্যাদা ও স্বাধীনতা দিতে। ছেলের বউ শোরঘাঘাতিনি বেকি খুব ছোটবেলায় বিয়ে হয়ে আসেন চিঙ্গিস খানের পরিবারে। তিনিও যথেষ্ট স্বাধীনতা পেয়েছিলেন, পরিবারের মধ্যে থেকে হাতেকলমে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে যে জ্ঞান পেয়েছিলেন তার পূর্ণ প্রয়োগ তিনি করেছিলেন নিজের ছেলেদের প্রত্যেককে এক একজন গ্রেট খান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে।

রাজকুমারী শোরঘাঘাতিনি ছিলেন কেরাইট বা কেরেইড উপজাতির নেতা ওয়াং খানের ভাই জাকা গাম্বু-র ছোট মেয়ে। তাঁরা ছিলেন নেস্টোরিয়ান খ্রীস্টান। তবু তাঁরা অন্য ধর্মের প্রতি উদার ছিলেন। আর মোংগলরা ছিল মন্ত্রতন্ত্রের ধর্মে বিশ্বাসী। তারা অনেক দেবতায় বিশ্বাস করত। আর বিশ্বাস করত পর্বত 'বুরখান খালাদুন'কে, তাদের পরিবার ও বীরদের রক্ষক হিসাবে। পর্বতের আত্মাই ছিল তাদের দেবতা। তাই ধর্মের ব্যাপারে তাদের মনও ছিল পর্বতের মতই উদার। ফলে সেই পরিবারে এসে শোরঘাঘাতিনির নিজের বিশ্বাসকে পালন ও জীবনে বিভিন্ন সময়ে বাস্তবে কাজে লাগাতে কোনো বাধা পেতে হয়নি।। সেই শিক্ষা তিনি তাঁর ছেলেদের নিজেদের জীবনে পালন করতে শিখিয়েছিলেন, যার ফলে তারাও পর ধর্মসহিষ্ণু হয়েছিল ও সকল প্রজাদের সমর্থনে বিস্তৃত ও দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল ও রাজত্ব করেছিল।

চেঙ্গিস খান তাঁর মায়ের দেওয়া শিক্ষা অনুসারে পরিবারের মেয়েদের প্রভূত স্বাধীনতা ও বিশেষ স্থান দিয়েছিলেন। তাছাড়া মোংগল উপজাতির মধ্যে পরিবারের মেয়েরা ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলের মেয়েদের থেকে বেশি স্বাধীনতা ভোগ করত,কেন না বিভিন্ন দলের মধ্যে অহরহ যুদ্ধ লেগে থাকায় ছেলেরা বাইরেই ব্যস্ত থাকতো। ফলে পরিবারে মেয়েরাই সব সামলাত,তারা ছেলেমেয়ে মানুষ করার সঙ্গে তীর-ধনুকের ব্যবহার, ঘোড়ায় চড়া,ছোটখাট বিবাদ মেটানো এসব করতো। তাই কোনো গুরত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামত দেবার অধিকার তাদের ছিল। এইসব অধিকার ভোগ করার সঙ্গেসঙ্গে রাজপরিবারের মেয়েরা শিক্ষা লাভ করতে

পারতেন,সম্পত্তির অধিকার ও রাজনীতি ও সামরিক বিষয়ের আলোচনায় অংশ নিতে ও মতামত দিতে পারতেন। তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতাতেই মোংগল সাম্রাজ্য এত বড় হয়েছিল ও শক্তিশালী ও সুদুরপ্রসারী হয়েছিল। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন শোরঘাঘাতিনি বেকি। শেষ পর্যন্ত উচ্চাশাময়ী শোরঘাঘাতিনিই সাম্রাজ্যকে বিরাট উচ্চতায় তুলেছিলেন ও তাঁর চার ছেলেকেই খান পদে বসিয়েছিলেন। তাঁরা চীনদেশ থেকে শুরু করে সারা ইউরোপ ও রাশিয়া পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন।

টোলুই ও শোরঘাঘাতিনি - ১২০৩ সালে বিয়ের সময় দুজনেই ছিলেন খুবই ছোট। ছোট হলেও রাজপরিবারের ছেলেদের খুব ছোট থেকেই শিকার ও যুদ্ধযাত্রা করতে হত। ছোট্ট শোরঘাঘাতিনি লেখাপড়া না জানলেও খুবই বুদ্ধিমতি ,মেধাসম্পন্ন , উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। খুব কাছে থেকে তিনি চেঙ্গিস খানের দুরদর্শিতা, রাজনীতির ধরণ, পরধর্মসহিষ্ণুতা , দৃঢ়তা , সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা , উচ্চাশা ও তাকে বাস্তবায়িত করে তোলা সবই লক্ষ্য করেছেন, আর মনে মনে নিজেকে তৈরি করেছেন। তিনি চেঙ্গিস খানের মা হলেগুণ খাতুনের সাহসিকতার কথা জেনেছেন ,কীভাবে তিনি স্বামীর মৃত্যুর পর নিজের ও সৎ ছেলেদের একসাথে মানুষ করে তুলেছেন , তাঁর স্বামীর তৈরি করা দল যা ভেঙে গিয়েছিলো তাদের সর্দারদের আবার একত্র করেছেন, তেমুজিনকে চেঙ্গিস খান হয়ে উঠতে পরামর্শ ও সাহায্য দিয়েছেন, রাজনীতির ব্যাপারে বহুবার সঠিক মতামত দিয়েছেন ও ঠিক পথে চালিত করেছেন।

পরিবারের ছোট ছেলে বলে পরিবারের রীতি অনুসারে তাঁর স্বামী টোলুই মোঙ্গোলিয়ায় রাজধানীতে ও আর অল্প কিছু জায়গার অধিকার পেয়েছিলেন, কিন্তু সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, কিন্তু "গ্রেট খান" হতে পারেননি। যদিও চেঙ্গিস খান ১২২৭ সালে মারা যাওয়ার পর দুই বছর তিনি সাম্রাজ্যের সব কিছু দেখভাল করেছেন, মধ্য মোঙ্গোলিয়াতে

টোলুইয়েরই সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী ছিল। তিনি খোরেজেম সাম্রাজ্যকে উত্তর পশ্চিম দিক থেকে সফল অভিযান করেছেন, বাবার সঙ্গে ১২২৭ সালে , চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর কিছুদিন আগে চীনে অভিযান চালিয়েছেন ও জয়ও করেছিলেন। শোরঘাঘাতিনি এসবই দেখেছেন আর মনে মনে সঙ্কল্প করেছেন কিভাবে নিজের চার ছেলেকেই সম্রাট করবেন।

মংকে খান

দুরদর্শী শোরঘাঘাতিনি ঠিক করে নিয়েছিলেন তাঁর কোন ছেলেকে সাম্রাজ্যের কোন অংশের অধিপতি করবেন এবং এ ব্যপারে চেঙ্গিস খানের অনুমতি নিয়েই তাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছেন। যেমন পারস্যের এক পণ্ডিতকে দিয়ে বড় ছেলে মংকে খানের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন ও সেখানকার মানুষদের রীতিরেওয়াজ , ধর্ম সম্বন্ধে আগ্রহী ও অবহিত করার ব্যবস্থা করে সেই ধর্মের ব্যাপারে সহিষ্ণু এবং শ্রদ্ধাশীল করে তোলেন। কারন তিনি ঠিক করেই রেখেছিলেন মংকে খান পারস্য, সিরিয়া অঞ্চলেই সম্রাট হবেন। আবার কুবিলাই খান যেখানে কিছুদিন শাসক হিসাবে কাজ করেছিলেন সেই চিন দেশের ভাষা শিক্ষা , তাদের রীতিনিতি, ধর্ম,ইত্যাদি বিষয়ে বাধ্যতামূলক ভাবে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন। চিনে প্রচলিত কনফুসিয়াসের ধর্মমত সম্বন্ধে অবহিত করেছিলেন ,সহিষ্ণু হতে শিখিয়েছিলেন যাতে প্রজাদের প্রতি সহানুভুতিশীল হন, ও তাদের ভালোবাসায় দীর্ঘদিন সেখানে রাজত্ব করতে পারেন এবং বাস্তবে তাই হয়েছিল, চীন দখল করে কুবিলাই সেখানে দীর্ঘস্থায়ী ইউনান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন ও ১২৬০-১২৯৪ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন ও রাজত্ব আরও বিস্তৃত করেন। এই কুবিলাই এর আয়া বা নার্স হিসাবে রেখেছিলেন একজন বৌদ্ধ মহিলাকে, যার সাহচর্যের প্রভাব তাঁর উপর সারাজীবন ছিল, শেষ জীবনে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হয়েছিলেন বংশের ৫ম "গ্রেট খান"। চিনে অনেক সংস্কার কাজ করেছিলেন। আবার শোরঘাঘাতিনির সেজ ছেলে

হুলেগু খান প্রথমে ছিলেন তাঁর বাবা টোলুই- এর জয় করা ইউরোপের কিছু অংশের শাসক তাই তাকেও সে ই অঞ্চলের প্রচলিত ভাষা ও ধর্ম বিষয়ে শিক্ষিত ও শ্রদ্ধাশীল করে

সস্ত্রীক হুলেগু

তুলেছিলেন তাঁর মা। তাঁর এই ছেলের সঙ্গে কেরেইড উপজাতির নেস্টো ক রাজকন্যার বিয়ে দিয়েছিলেন। যার ফলে হুলেগু অনেক ব্যাপারে স্ত্রীর সমর্থন ও সহায়তা পেয়ে সহজেই অনেক কল্যাণমূলক কাজ করেছিলেন তাঁর সাম্রাজ্যের মধ্যে। তিনি বাগদাদের ৫ শতাব্দীর প্রাচীন আবাসিড রাজবংশের অবসান ঘটিয়ে ই-খানাতে রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। বাগদাদ দখলের যুদ্ধে অনেক লোক মারা গেলেও তাঁর স্ত্রীর জন্য সব খ্রীস্টান মানুষ ও অনেক নিরীহ মুসলমান নাগরিকও বেঁচে যায়। হুলেগু খানের সবচেয়ে ভালো কাজ হল বাগদাদের "মারাঘার" উত্তরে এক পাহাড়ের উপর তৈরি করা একটি বিরাট "অবজারভেটরি"। দেশের সব লোকই এই কাজ সমর্থন করেছিলো, দেশ বিদেশের ও দূর প্রাচ্যের যে কোন ধর্মের বৈজ্ঞানিকেরাই এখানে এসে গবেষণা করতে পারতেন। এসবই ছিল তাঁদের মায়ের দেওয়া শিক্ষার সুফল। যার ফলে চেঙ্গিস খানের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যকে প্রায় সারা ইউরোপ এশিয়ার কিছু অংশ ,ও দুর প্রাচ্য পর্যন্ত বিস্তার করেছিলেন তাঁরা।

শোরঘাঘাতিনি বেকির শিক্ষার মূল নীতি গুলি ছিল (১)কোন দেশের রাজা হতে গেলে প্রথমে তাঁকে শিক্ষিত হতে হবে ,সঙ্গে সেই অঞ্চলের প্রচলিত ভাষাকে ভালোভাবে শিখতে হবে,তাতে প্রজাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সহজ হবে,তাদের মনের কথা ক্ষোভদুঃখের কথা সরাসরি জানা যাবে ও প্রতিকার করে বিদ্রোহের সম্ভাবনা দূর করা যাবে সহজেই। (২)সেই দেশের ধর্ম বিষয়ে জানতে ,শ্রদ্ধাশীল ও সহিষ্ণু হতে হবে। দেশের মানুষের রীতিনিতির প্রতি ,বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রতি ভালবাসা দেখাতে হবে তবেই তাঁদের ভালবাসা পাওয়া যাবে, রাজ্যে শান্তি বজায় থাকবে ,উন্নতি হবে।(৩) দেশের কৃষকদের প্রতি দরদী হতে হবে, অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের জন্য অত্যাচার না করে ,তাঁদের অসুবিধা ,অভাবগুলি দুর করতে সাহায্য করলে উৎপাদন বাড়বে, ফলে অত্যাচার করে জে খাজনা আদায় হত তার থেকে বেশী লাভ হবে। চেঙ্গিস খানের এই নীতিটিও তিনি শক্ত হাতে চালু রেখেছিলেন,। তাই একবার যখন

চিনে কিছু দুর্নীতিপরায়ণ অফিসারদের অত্যাচার ও জোর করে বেশি খাজনা আদায় করার ফলে উৎপাদন কমে গেল, চাষিরা দেশ ছেড়ে পালাতে লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে তিনি কুবিলাই কে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন ,সেই অফিসারদের সরিয়ে দিলেন ও শোরঘাঘাতিনি নিজে কিছু সৎ আফিসারকে চিনে পাঠালেন, সমস্যার সমাধান হলে চাষিরা আবার ফিরে এলো, উৎপাদন বাড়ল।

তিনি ছেলেদের আরও শিখিয়েছিলেন জাতি ধর্ম না বিচার করে গুণী ও শিক্ষিত মানুষের কদর করতে, বিশ্বাস করে তাঁদের সাম্রাজ্যের উচ্চপদেও বসাতে ,এতে রাজ্য অনেক ভাল মানুষের সহায়তা ও পরিষেবা পাবে ,দেশের পরিবেশ ও সংস্কৃতিরও উন্নতি হবে, দেশ সমৃদ্ধ হবে। (চেঙ্গিস খানও অন্য ধর্মের মানুষ হলেও শিক্ষিত, দক্ষ ও সমরকুশলীদের বিভিন্ন উচ্চপদে বসাতেন) সাম্রাজ্যের উন্নতির জন্য বিদেশের সঙ্গে বানিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন ও প্রসার ঘটানোতেও তাঁর বিশেষ ভুমিকা ছিল। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের প্রধান স্থল বানিজ্য পথ "সিল্ক রুট বা সিল্ক রোডের" মাধ্যমে বানিজ্য বৃদ্ধির জন্য সেই পথের উন্নতির জন্যও তিনি যে গুরুত্বপুর্ন ভুমিকা নিয়েছিলেন একথা আরব,ইউরোপীয় ও অন্যান্য দেশের ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেছেন ও তাঁকে এই বানিজ্য পথের ও মোঙ্গল সাম্রাজ্যের একজন সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ,ও বিশ্বের সব প্রভাবশালী মহিলাদের মধ্যে একজন বলে বারবার উল্লেখ করেছেন। শোনা যায় টোলুই –এর বড় ভাই ওগেডেই খান ও তাঁর সঙ্গে অনেক ব্যাপারে আলোচনা করতেন ও তাঁর পরামর্শও নিতেন। রাজনীতিতে এমনই দক্ষ ছিলেন তিনি।

তিনি নিজে শিক্ষার বিস্তারের জন্য মুসলমান প্রধান অঞ্চলে ,ও সুদুর বুখারাতেও অনেক মাদ্রাসা স্থাপন করে দিয়েছেন ,মুসলিম, বৌদ্ধ,খ্রীস্টান নির্বিশেষে সকল সাহায্য প্রার্থীকেই অর্থ সাহায্য করতেন। তিনি যখন যা সিদ্ধান্ত নিতেন তা হত স্থির,যা করবেন ঠিক করতেন সেটা বাস্তবায়িত করার উপযোগী অবস্থা ও পরিবেশ তৈরি করে নেবার মত কৌশলী বুদ্ধি তাঁর অতিমাত্রায় ছিল। সে বুদ্ধি তাঁর একাধিকবার কাজে এসেছে। চেঙ্গিস খানের ছেলে ওগেডেই খানের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে গুয়ুক খান সম্রাট হয়েই নিজের মা , কাকিমা জেঠিমা, পিসিমা ,যাঁদের সবাই খুবই রাজনীতিকুশল ও প্রভাবশালী মহিলা ছিলেন, তাঁদের হেয় করতে শুরু করেন। দূরদর্শী শোরঘাঘাতিনি বিপদের গন্ধ পেলেন, নীরবে পরবর্তী পদক্ষেপের পরিকল্পনা শুরু করে দিলেন। তিনি এমনিতেই পরিবারের সকল লোকজনদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, ও প্রয়োজনে তাঁদের সামরিক সাহায্যও করতেন।
একে অন্যকে সাহায্য করলেই যে নিজের প্রয়োজনে ও তাঁদের কাজে লাগান যাবে এই দূরদর্শিতা তাঁর ছিল। তাই তিনি তাঁদের জ্ঞাতি বাঁটু খানকে এক যুদ্ধের সময় সাহায্য করেছিলেন নিজের ছেলে মঙকে –কে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে পাঠিয়ে। বাঁটু খান ছিলেন "গোল্ডেন হোরডের" শাসক, ক্যাস্পিয়ান সাগর থেকে বুলগেরিয়া পর্যন্ত ছিল তাঁর সাম্রাজ্য। তিনি ছিলেন

চেঙ্গিস খানের বড় ছেলের ছেলে জোচির ছেলে। শোরঘাঘাতিনি গোপনে পরিবারের পরিস্থিতি জানিয়ে বাঁটু খানের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। কিছুদিন বাদে বাঁটু খানের বিরুদ্ধে এক অভিযানে যাওয়ার পথে রহস্যজনক ভাবে গুয়ুক খানের মৃত্যু হল পথে, সাম্রাজ্যের বাইরে। শোনা যায় এই মৃত্যু তে শোরঘাঘাতিনির হাত ছিল, কিন্তু তিনি নীরবে গোপনে একার সিদ্ধান্তে কাজ করতেন যে কেউ তার আঁচও পেতনা। মহিলা হলেও কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে তিনি এতটুকুও বিচলিত হতেন না।

গুয়ুকের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী ওঘুল খোয়ামিজ নিজের তিন নাবালক ছেলের অভিভাবক হিসাবে মোঙ্গল রাজপরিবারের সিংহাসনে বসাতে চাইলেন নিজের এক ভাইপোকে। পারিবারিক উত্তরাধিকারের নিয়ম ভঙ্গ হচ্ছে দেখে শোরঘাঘাতিনি প্রতিবাদ করলেন। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ একমাত্র জীবিত পুরুষ সদস্য বাঁটু খানের সঙ্গে আগেই যোগাযোগ করে পরিস্থিতি জানিয়ে রেখেছিলেন তিনি। সকল আমাত্যরা জানতেন শোরঘাঘাতিনির মত দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে অনেক পুরুষ নেতাও পারেনা। তারাও সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার বেহাত হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচাতে তাঁকেই সমর্থন করলেন। ছেলেবেলা থেকে অর্জন করা রাজনীতির জ্ঞানের মোক্ষম সঠিক প্রয়োগ করলেন তিনি ,সঠিক বিষয়ের দিকে নজর ঘুরিয়ে দিলেন সকলের। বললেন চেঙ্গিস খানের সিংহাসনের উত্তরাধিকার একমাত্র তাঁর বংশধরদের, এটাই নিয়ম,এবং সেই পদে বসার যোগ্য লোক যখন এই পরিবারেই আছে তখন অন্য বংশের কেউ এই সিংহাসনে বসতে পারবেনা। তাঁর এই বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তই মোংগল সাম্রাজ্যের ভাগ্য ঘুরিয়ে দিল। সকলেই মংকে খানকে "গ্রেট খান" পদে বসানোর প্রস্তাব করল, ও রাজধানীতে এক "খুরুলতাই"—মোংগলদের কংগ্রেস বা বিশেষ সিদ্ধান্ত নেবার মিটিং হল, সেখনেই মঙকে খান "৪র্থ গ্রেট খান" নির্বাচিত হলেন। যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চেঙ্গিস খানের হাতে তাঁর উন্নতি ও জয়যাত্রা শুরু হল শোরঘাঘাতিনির সফল প্রথম স্বপ্নটি পূরণের মধ্য দিয়ে।

মংকে খানের বিরুদ্ধে একবার যখন সিংহাসনচ্যূত করার ষড়যন্ত্র হয় ও তাঁর নেত্রী ছিলেন গুয়ুকের বিধবা স্ত্রী ওঘুল খোয়ামিজ। তিনি মংকে কে কালো যাদু করে মারার চক্রান্ত করেছেন একথা জানতে পেরে শোরঘাঘাতিনি এই কুকর্মের শাস্তি দিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করে সব জেনে নিয়ে তাঁকে হাতপা বেঁধে বস্তায় ভরে নদীর জলে ফেলে দেন (মোঙ্গল সমাজে কালো জাদু করার এই শাস্তিরই বিধান ছিল)। এই ঘটনাই বলে দেয় তিনি কতটা কঠোর ও প্রভাবশালী ছিলেন।

১২৫৯ সালে মংকে খানের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসলেন শোরঘাঘাতিনীর চতুর্থ ছেলে আরিক বোকে। খবর পেয়ে সিংহাসনের দখল নিতে ছুটে এলেন কুবলাই আর হুলাগু খানও। শেষ পর্যন্ত বহু যুদ্ধবিগ্রহের পর ১২৬৪ সালে জানাডুতে কুবলাইয়ের কাছে আত্মসমর্পণ

করলেন আরিক বোকে।

এরপর গ্রেট খান হলেন কুবিলাই। চিনে নতুন রাজবংশও প্রতিষ্ঠা করলেন। চিঙ্গিস খান যে সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন চিন ও মধ্য এশিয়ায় তাঁর বিস্তার হয় শোরঘাঘাতিনির ছেলেদের আমলে। সমগ্র ইউরেশিয়া,বর্তমান চিনের কিছু সামন্ত রাজ্য, কোরিয়া, ককেশাস, প্রায় পুরো মধ্য এশিয়া,বর্তমান ইউরোপ,রাশিয়া ,মধ্য প্রাচ্যের অনেকটাই তাঁদের অধীনে আসে। শোরঘাঘাতিনির চেষ্টায় ও দিকে দিকে তার ছেলেদের দিয়ে রাজ্যের সমৃদ্ধির শুরু হয় , নূতন নূতন দেশের সঙ্গে বানিজ্যিক যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষিত ও মেধাবী মানুষদের আসা যাওয়া বাড়ে, তাঁরা সেসব যায়গায় অনেকে বসবাসও শুরু করে ।তারাও সাম্রাজ্যের উন্নতিতে কাজে লাগে। সবই হয়েছে এই মহান মা শোরঘাঘাতিনি বেকির জন্য। একজন ভাল শাসক হবার সব যোগ্যতাই কীভাবে অর্জন করেছিলেন এই নিরক্ষর মহিলা তা ভাবলেই আবাক হতে হয়। ছেলেদের তিনি ধর্মীয় সহিষ্ণুতার উদাহরন হিসাবে যেমন দাদু চেঙ্গিস খানকে দেখিয়েছেন তেমনি তিনি নিজেও বারবার অনেক কাজের মধ্য দিয়ে নজীর স্থাপন করেছেন যে ধর্মের উপরেও হচ্ছে রাজ্যের স্থান,রাজ্যবাসীর মঙ্গল। তাই প্রজার ভালোর জন্য যে তাঁদের ধর্ম বিশ্বাসকে মর্যাদা দেওয়া উচিত একথাই তিনি সব ছেলেকে শিখিয়েছেন। ১২৫২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়, তারপর এক ভাতৃবিরোধের সুত্রপাত হয় ,মোঙ্গল সাম্রাজ্যের ঐক্যে ফাটল ধরে।

১৩১০ সালে নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টানদের এক বিরাট অংশ তাঁকে মরণোত্তর "সম্রাজ্ঞী" উপাধি দিয়েছে। ১৩৩৫ সালে গানঝাউ বা গানসু প্রদেশে একটি চার্চে তাঁর মুর্তি স্থাপন করেছে। তাঁকে একপ্রকার দেবীর আসনেই বসিয়েছে তাঁরা, তাঁর মুর্তির সামনে বিভিন্ন সামগ্রী উৎসর্গও করা হয়। ছবিঃ সংগৃহীত

অভ্রর সাথে জুলিয়া রবার্টস্ ও ব্রুস উইলিসের দেখা

The Painted Turtle
a Hole in the Wall Camp

ইংরিজিতে লিখে পাঠিয়েছেন   শ্রীমতী শুভ্রা

বাংলায় অনুবাদ ও পুণর্লিখন করে দিয়েছেন তোমাদের সংহিতাদিদি

হরেক মজা দেদার রঙের থিম পার্কগুলো ছোটোদের সবারই খুব পছন্দ। তার কারণ হলো নানারকম রাইড। কিন্তু সেখানে গেলে অনেক রাইডেই অভ্রের চড়া হয় না যখন তার বয়সী বাকি যে কোনো বাচ্চাই সেই সব রাইডের আনন্দ নিতে পারে। কারণ সে যথেষ্ট লম্বা নয় কিংবা অন্য কোনো শারীরিক অসুবিধে। তার একটা অসুখ আছে নিস্ট সিন্ড্রোম নামে। এই অসুখ অভ্রের শরীরকে বয়সের সাথে সাথে বাড়তে দেয় নি। মানে এগার বছর বয়সে যতোটা লম্বা হওয়া যায় সে ততোটা লম্বা হতে পারে নি। কিন্তু তার মন বেড়েছে আর পাঁচটা বাচ্চার মতোই।

কিন্তু অভ্রেরও আছে এক সব পেয়েছির দেশ। প্রত্যেক গ্রীষ্মে অভ্র যায় সেখানে, একটা সপ্তাহ কাটিয়ে আসে। অভ্রের মতো আরও অনেকেই যায় সেখানে। সেটা আসলে পেন্টেড টার্টল নামে একটা ক্যাম্প। বানিয়েছেন পল নিউম্যান নামে এক ভদ্রলোক। এখানে অভ্রের সব ইচ্ছে পূর্ণ হয়। তার এগার বছরের জীবনের সব "না"-গুলো "হ্যাঁ" হয়ে যায় পেন্টেড টার্টলে গেলে। এখানে তাকে শুধু ইচ্ছে করতে হয়।

একটা বুধবার সন্ধেবেলা, পেন্টেড টার্টলের ডিরেক্টর এপ্রিল উয়েহারা অভ্রের বাড়িতে ফোন করে বলেছিলেন, "পেন্টেড টার্টল ক্যাম্পের "হোল ইন দ্য ওয়াল" পার্কের নাম বদলে "সিরিয়াস ফান" হবে। সেই কথাটা একটা ঘোষণা করে সাধারণ মানুষকে জানানো হবে। এই ঘোষণার কাজটা করবেন হলিউডের দুই তারকা - জুলিয়া রবার্টস ও ব্রুস উইলিস।" তিনি তাই জানতে চেয়েছিলেন, "অভ্র কি এই ঘোষণায় হলিউড তারকাদের সঙ্গে অংশ নিতে চায়?" তিনি আরও বলেছিলেন যে অভ্র ছাড়াও আরও দুটি বাচ্চা আসবে সেই অনুষ্ঠানে। তাদের তিনজনকে হয়তো কোনো লেখা থেকে পড়তে হবে আর জুলিয়া রবার্টস ও ব্রুস উইলিসের সাথে কথাবার্তা বলতে হবে। মার্চ মাসের পাঁচ তারিখ, সোমবারে এই অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। সব শুনে অভ্রের মা-বাবা খুব খুশি হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন যে স্টারেরা আসুন আর না আসুন, এই ঘোষণায় অংশ নিলে অভ্রের একটা ভালো অভিজ্ঞতা তো হবেই। যথা সময়ে অভ্রের বাবা লস এঞ্জেলস যাতায়াতের টিকিট কেটে দিয়েছিলেন অভ্র আর তার মায়ের জন্য ।

প্লেনে করে লস এঞ্জেলস পৌঁছতে দুপুর একটা হয়ে গিয়েছিল অভ্রদের। এপ্রিল এয়ারপোর্টে এসেছিলেন অভ্র আর ওর মাকে নিতে। সেখান থেকে ওঁদের দুজনকে তিনি লেমোনেড নামে একটা রেস্টুরেন্টে লাঞ্চে নিয়ে গিয়েছিলেন। খাওয়া-দাওয়া দারুণ ছিল। তারপর এপ্রিল ওঁদের নিয়ে গিয়েছিলেন কাসা দেল মার হোটেলে। নাম শুনেই বোঝা যায় যে হোটেলটা সমুদ্রের পাশে। এই পুরো সময়টায় এপ্রিল অভ্রের সাথে চুটিয়ে গল্প করেছিলেন, যেন অভ্রের নতুন বন্ধু তিনি, অভ্রকে আরও ভালো করে জানতে চান।

কাসা দেল মার হোটেলেই শ্যুটিং হওয়ার কথা ছিল। বাকি সকলের সেখানে এসে পৌঁছানোর অপেক্ষা করতে করতে অভ্র বলেছিল, "আমার গলাটা ব্যথা ব্যথা করছে।" তাই ওর মা চ্যামোমাইল চা আনিয়েছিলেন। সে চা খেতে খেতেই এসে গিয়েছিলেন পেন্টেড টার্টল ক্যাম্পের এক্সেকিউটিভ ডিরেক্টর ব্লেক মাহের। তিনিও বেশ গল্পসল্প করেছিলেন অভ্র আর ওর মায়ের সাথে।

একে একে বাকি সবাই এসে ভরে গিয়েছিল আশেপাশের টেবিলগুলোও। কিছুক্ষণ পরে লুউ অ্যাডলার নামে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন, "অভ্র, তোমার কি আইককে মনে পড়ে?" ওঁর ছেলে আইক পেন্টেড টার্টল ক্যাম্পে একবার অভ্রের কাউন্সেলর ছিলেন। লুউ অভ্রের ছবি দেখে চিনতে পেরেছিলেন তাকে। পেন্টেড টার্টল ক্যাম্পের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে লুউ আর তাঁর স্ত্রী দুজনেই আছেন।

প্রায় ৪টের সময় পাওডার রুমে গিয়েছিল অভ্র। সেখানে ছিল তার মতোই ক্যারেন আর নাই। দুজনেরই বয়স অভ্রের মতো এগার। ক্যারেনের মাস্কুলার ডিসট্রফির জন্য সে না পারে নিজে খেতে, না পারে নিজের মাথা উঁচু করে ধরে রাখতে। কিন্তু সে ফিফ্‌থ গ্রেডে পরে। আর তার মাথার চুলে সুন্দর গোলাপি হাইলাইট করা ছিল। সে মহানন্দে তার হুইল চেয়ারে চড়ে ঘরময় চরকিপাক কেটে চলেছিল। ক্যাম্পে বাঁধা একটা গানও শুনিয়েছিল সে সকলকে। ওর সঙ্গে এসেছিলেন ওঁর মা-বাবা।

ঠাম্মা আর মাসিঠাম্মার সঙ্গে এসেছিল নাই। নাইয়ের লিভার ট্রান্সপ্লান্ট হয়েছিল আগেই। সে কিন্তু নিজেই নিজের ওষুধপত্র খেতে পারে। তার ঠাম্মারা দুজনেই নার্স। তাই তাঁরা নাইকে যতোটা সম্ভব স্বনির্ভর করে তুলেছিলেন। নাইকে প্রথমে একটু লাজুক লাগছিল। পরে সে কথা বলতে মনে হচ্ছিল না যে সে খুব ছোট্ট একটা মেয়ে।

একে একে সবার অভিজ্ঞতার কথা রেকর্ড করা হয়েছিল। স্বনামধন্য ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় হাস্কেল ওয়্যাক্সলার ছিলেন সিনেমাটোগ্রাফার। এতো বয়সেও তিনি কী ভীষণ কর্মঠ! অসীম ধৈর্য নিয়ে তিনি রেকর্ডিং করলেন অভ্রদের তিনজনের সাক্ষাৎকার। এপ্রিল আর ব্লেক বাচ্চাদের সাথেই ছিলেন এই সময়। যাবতীয় প্রশ্নের উত্তরে তিন শিশুর গলায় যেন মিশেছিল ক্যাম্পের উত্তেজনা। সেখানে তারা যা খুশি তাই করতে পারে এবং নিজেরাই করতে পারে। সেখানে বাড়ির কেউ তাদের সাথে সারাক্ষণ থাকে না তাদের কাজ করে দেওয়ার জন্য বা সারাক্ষণ

"সাবধানে", "সাবধানে" বলার জন্য। ক্যাম্পের এই একটা সপ্তাহের কথা সারা বছর তাদের মনে এমন তাজা থাকে যে তারা মনে করে যেন, "গতকালই ক্যাম্প থেকে ফিরলাম!" অভ্রের ভাষায়, "আমি যা করতে চাই, ক্যাম্প আমাকে সেটা করার সমস্ত উপায় করে দেয়। আমি চাইলেই হবে। কী করে করব সেটা আমাকে ভাবতেই হয় না। সেটা হয়তো বাকি সবাই করে কিন্তু আমার করার উপায় নেই। ক্যাম্প ঠিক একটা ব্যবস্থা করে দেয় আমার ইচ্ছেটা যাতে মেটে।" তিনজনেই একমত হয়েছিল যখন জানতে চাওয়া হয়েছিল, "ক্যাম্পের কোন ব্যাপারটা তুমি বদলে দিতে চাও?" তিনজনেই চেয়েছে যেন ক্যাম্প কখনও না শেষ হয়।

পেন্টেড টার্টল ক্যাম্প সবার জন্যই খোলা এবং ক্যাম্পে অংশ নিতে কোনো খরচ লাগে না। অভ্রের মতো অবস্থাপন্ন ঘরের বাচ্চাদেরও কোনো খরচ লাগে না সেখানে। বাচ্চারা সেখানে শুধু না পাওয়া আনন্দই পায় না, ফিরে পায় নিজেদের প্রতি বিশ্বাসও। যাই থাক শারীরিক সমস্যা, তারা কেউই আর পাঁচটা সুস্থ মানুষের থেকে কম নয় কোনো অংশে – সেই বিশ্বাসটাই তাদেরকে একটু বেশি অভিজ্ঞ আর স্বনির্ভর করে দেয়।

সাক্ষাৎকারের পর সবাই আবার গল্প করছিল নিজেদের মধ্যে। সে সময়ে তারকারা এসে গিয়েছিলেন। তারপর সবাই মিলে গিয়েছিলেন ওপরে, সাততলায়। সাততলার নির্দিষ্ট ঘরে ঢোকার মুখে সক্কলকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন সস্ত্রীক ব্রুস উইলিস নিজে। সবার সাথে শেকহ্যান্ড করে আলাপ করছিলেন এই বলে, "আমি ব্রুস উইলিস আর এই আমার স্ত্রী এমা"।

সেখানে দুটো ঘর ছিল। ভেতরের ঘরে শ্যুটিং হওয়ার কথা। পেন্টেড টার্টলের কর্মীরা আর বাচ্চাদের বাড়ির লোকেরা বসেছিলেন বাইরের ঘরে। দুই ঘরের মধ্যে রাখা ছিল ক্যামেরা। অভ্রদের তিনজনকে ভিতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

জুলিয়া রবার্টস এসে সোজা ভিতরের ঘরে চলে গিয়েছিলেন। এরকম ঠিক ছিল যে তারকারাই কথা

বলবেন আর ছোটোরা তিনজন চুপ করে বসে থাকবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ক্যারেন জিজ্ঞেস করেছিল, "আমার লাইনগুলো কই?" শুনে জুলিয়া বললেন, "সত্যিই তো, ওর লাইনগুলো কই?" শ্যুটিং চলতে চলতে জুলিয়া অনেক গল্প করেছিলেন বাচ্চাদের সাথে। তিনি তো ক্যারেনের চুলের গোলাপি হাইলাইটস্ দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। অভ্রের দশটা ব্রেসলেট দেখেও তিনি অভ্রকে অনেক প্রশ্ন করেছিলেন। একবার তো তাঁর জিভ কেবলই জড়িয়ে যাচ্ছিল "আপনাদের ধন্যবাদ জানাই 'ওয়ার্ল্ড অফ পিৎজা অ্যান্ড প্রেতজেল'-কে পছন্দ করার জন্য" এই লাইনটা বলতে গিয়ে।

ব্রুস উইলিসকে বলতে হতো, "হাই, আমি ব্রুস উইলিস।" এটা বলতে গিয়ে বেশ কয়েকবার তিনি কিছুই বলতে পারছিলেন না। যতোবারই বলতে যাচ্ছিলেন ততোবারই কিছু না কিছু ভুল হয়ে যাচ্ছিল। আর অভ্ররা তিনজন তো হেসেই কুটোপাটি। শ্যুটিং শেষ হওয়ার পর সবার মনে হয়েছিল, "এর মধ্যেই হয়ে গেল!"। শ্যুটিং সেরে জুলিয়া তিন শিশুর থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন নিজের তিন শিশুর কাছে।

অভ্রের কাছে কিন্তু তারকাদের কোনো ছবি বা সই নেই। হয়তো অভ্র ভুলে যাবে। হয়তো তাঁর মা তাকে রোজ গল্প বলে বলে মনে করিয়ে দেবেন যশ, অর্থ সব পেয়েও সেই তারকারা কতো সংবেদনশীল সেকথা।

এপ্রিল অভ্রদের ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন লস এঞ্জেলস এয়ারপোর্টে। শুধু তারকারাই নন, এপ্রিলের মতো পেন্টেড টার্টলের যতো কর্মী, তাঁরা সবাই কাজ করে চলেছেন যাতে অভ্রের মতো শিশুরা আরেকটু ভালোভাবে বাঁচতে পারে — অভ্রের মতো শিশু যাদের সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে বাঁচার চেষ্টা করাটাই একটা রোজকার যুদ্ধ। এঁরা কেন করে চলেছেন এসব কাজ? কারণ এঁরা নিজেদের ছাড়াও বাকি পৃথিবীর মানুষের ভালো থাকার কথা ভাবেন। এঁদের কথা ভাবলে মনের গভীরে কৃতজ্ঞতা গড়ে ওঠে।

এই সংস্থাটির ব্যাপারে আরো জানতে হলে এই ঠিকানায় দেখোঃ *http://www.thepaintedturtle.org*

স্বরলিপির কচকচি আপাততঃ বন্ধ থাকবে এমনই কথা ছিল - কিন্তু স্টাফ নোটেশনে তালের চিহ্ন নিয়ে কিছু ধোঁয়াশা রয়ে গেছে জেনে এবার তাই নিয়েই কচকচি একটু করতে হবে।

আচ্ছা তার আগে একটা মজার কথা বলে নিই। G বা ট্রেবল্ ক্লেফ-এ যেমন পাঁচটা দাগের ওপর থাকে E, G, B, D, F স্বরগুলো আর চারটে ফাঁকের ভেতর থাকে F, A, C, E স্বরগুলো, F বা বাস ক্লেফ্-এ আবার তেমনি থাকে G, B, D, F, A আর A, C, E, A স্বরগুলো - তাই ক্লেফ্-এর ভেতর স্বরের অবস্হানগুলো স্বভাবতই গুলিয়ে যায় প্রথম প্রথম। মনে রাখার সহজ উপায় হল - ট্রেবল ক্লেফ - Every Good Boy Does Fine আর FACE; বাস ক্লেফ্ - Good Boys Do Fine Always আর All Cows Eat Grass। দুটো ক্লেফ্-এ স্বরের অবস্হান আর একবার দেখে ঝালিয়ে নিতে পারো -

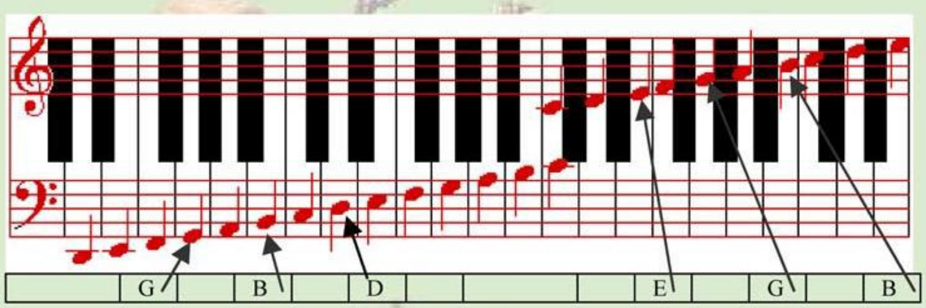

স্টাফ-এ 4/4 বা 3/4 এরকম সব লেখা থাকে শুরুতেই। এগুলোই তালের সঙ্কেত-চিহ্ন। তবে অঙ্কের ভগ্নাংশের সাথে এই সঙ্কেত-চিহ্নগুলোর যোগাযোগ নেই কিন্তু। যাদের স্কুলে পড়ার সময় প্রার্থনার লাইনে সব ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হত, বা এখনও হয় তারা লক্ষ্য করে থাকবে বিশেষ করে শেষ লাইনটা - জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে - কেউ কেউ মন্ত্র পড়ার মত তাড়াতাড়ি শেষ করে প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছে - কিন্তু কোন কোন ক্লাসের লাইনে তখনও তৃতীয় জয় হে - টাই শেষ হয় নি। সবার গানে এই অংশটার স্বরগুলোর স্বর-মান সম্পর্কে ধারণা না থাকার জন্যই এরকমটা ঘটে। স্বর-মান বা নোট-ভ্যালু ব্যাপারটা সহজে বুঝতে হলে একটা ঘড়ি নিয়ে বসাই ভাল। ধরো, এই অংশটা গাইতে ১৪ সেকেন্ড সময় লাগে। নীচে যেমন লেখা হল তেমন করে সেকেন্ডের কাঁটা ধরে গাইলে স্বরগুলোর স্বর-মান সম্পর্কে একটা ধারণা হবে। কথার নীচে ১,২,৩ করে সেকেন্ড বলা আছে।

জয়	হে			জয়	হে				জয়	জয়	জয়	জয়	হে
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪

এক্ষেত্রে BPM বা বিটস পার মিনিট হল ৬০ — কারণ ৯টি স্বর ও ৫টি বিরাম মিলে ১৪ সেকেন্ড-এ অংশটা শেষ হল।

উপরের উদাহরণে যদি প্রতি ৪ সেকেন্ডে একটা করে মেজার (measure) ধরা হয়, তাহলে প্রতি মেজেরে ৪টি করে বিট বা তাল আছে - এক্ষেত্রে স্টাফ্-এর শুরুতে লেখা থাকবে ৪/৪; আবার যে গানে একটি মেজারে ৩টি বিট বা তাল আছে, তখন লেখা থাকবে ৩/৪।

পাশ্চাত্য স্বরলিপিতে স্বরগুলোর স্বর / বিরাম-মান অনুযায়ী স্বরচিহ্ন আর বিরাম চিহ্ন গুলো দেখতে বিভিন্ন রকম হয়।একটা সরণী করে দেখলে পরিষ্কার হবে ব্যাপারটা।

স্বর চিহ্ন	বিরাম চিহ্ন	আমেরিকান নাম	ব্রিটিশ নাম
		longa	longa
		double whole note	breve
		whole note	semibreve
		half note	minim
	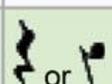	quarter note	crotchet
		eighth note	quaver
		sixteenth note	semiquaver
		thirty-second note	demisemiquaver
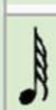		sixty-fourth note	hemidemisemiquaver